শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ বৈশাখ ১৩৮১ ॥ প্রথম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :
গণেশ লালওয়ানী

খরতর ভট্টারকদের উপাশ্রয়

[পৃঃ ১৮ দ্রষ্টব্য]
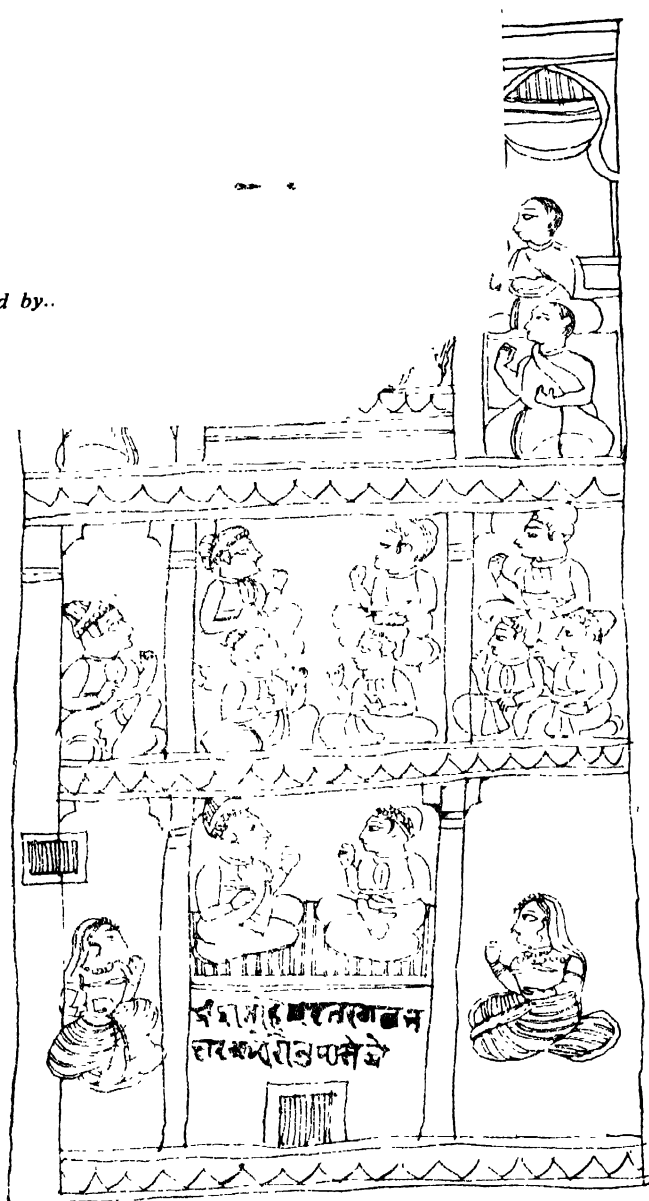
বৰ্দ্ধমান-মহাবীর

[জীবন-চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

উত্তর বাচালা হতে বর্দ্ধমান এলেন সেয়বিয়া অর্থাৎ শ্বেতাম্বী। কেকয়ের রাজধানী।

শ্বেতাম্বীতে তখন রাজত্ব করেন রাজা প্রদেশী।

প্রদেশী প্রথম জীবনে নাস্তিক ছিলেন। পরে ভগবান পার্শ্বনাথের পরম্পরাগত শিষ্য কেশীকুমারের সম্পর্কে এসে আস্তিক বা আত্মায়বিশ্বাসী হন।

তাই প্রদেশী যখন বর্দ্ধমানের আসার খবর পেলেন তখন সপরিবারে এলেন তাঁর বন্দনা করতে।

ফলে প্রদেশীর অধীনস্থ রাজ-পুরুষেরাও তাঁর ওখানে যাতায়াত করতে সুরু করলেন। বর্দ্ধমান তাই সেখানে অবস্থান করতে ইচ্ছে করলেন না। সেখান হতে চলে গেলেন সুরভিপুর। সুরভিপুর হতে রাজগৃহ।

রাজগৃহের সঙ্গে কারু পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না। মগধের রাজধানী রাজগৃহ। কিন্তু সুরভিপুর হতে রাজগৃহে যেতে হলে গঙ্গা নদী অতিক্রম করতে হয়। বর্দ্ধমান তাই খেয়া ঘাটে এলেন। তারপর সিদ্ধ দত্তের নৌকায় উঠে বসলেন।

নৌকায় আরো অনেক যাত্রী ছিল। তার মধ্যে ছিল নৈমিত্তিক খেমিল।

মাঝিরা যখন নৌকো খুলে দিয়েছে, নৌকো যখন ধীরে ধীরে চলতে সুরু করেছে, তখন ডান দিক হতে সহসা চীৎকার দিয়ে উঠল এক উলুক।

সেই চীৎকার শুনে খেমিল বলে উঠল, এই চীৎকারে নৌকো-ডুবি ও এতগুলি প্রাণীর জীবন-হানির আশঙ্কা সূচিত হচ্ছে। মাঝি, নৌকো শীগ্‌গির কূলে নাও।

কিন্তু মাঝি নৌকো কূলে নিল না। প্রবল স্রোতে নৌকো ততক্ষণে কূল হতে অনেক দূরে এসে পড়েছে।

তবে উপায় ?

উপায় একমাত্র ভগবান।

হঠাৎ খেমিলের চোখ গিয়ে পড়ল বৰ্দ্ধমানের ওপর।

যাত্রীরা উলুকের ডাক কেউ শুনে ছিল, কেউ শোনে নি। কিন্তু খেমিলের কথা সকলেই শুনেছিল। তাই সেই নিয়ে তারা মাঝিদের সঙ্গে বচসা করতে সুরু করল। কিন্তু খেমিল এবার তাদের সবাইকে থামিয়ে দিল। তারপর বৰ্দ্ধমানের দিকে চেয়ে বলল, উনি যখন সঙ্গে রয়েছেন তখন আমাদের কিছুরি আশঙ্কা নেই। ঝড় উঠবে নিশ্চয়ই তবে নৌকো-ডুবি হবে না।

খেমিলের কথাই সত্যি হল। যে একখণ্ড মেঘ আকাশের পশ্চিম প্রান্তে পড়ে ছিল তা দেখতে দেখতে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলল। সোঁ সোঁ করে ঝড় উঠল। নদীর জল কালো হল। তারপর মুহূর্তেই প্রলয় ঘটে গেল। ঝড়ের সে কি বেগ আর জলের গর্জন! মাঝিরা নৌকো সামাল দিতে পারল না। প্রবল হাওয়ায়, জলের বেগে তা কুটোর মতো ভেসে গেল।

নৌকোয় আবার কোলাহল উঠল। কেউ খেমিলের দোষ দিল ত কেউ মাঝিদের। প্রাণের আশঙ্কায় সকলে কেমন যেন অধৈর্য হয়ে পড়ছে।

আর বৰ্দ্ধমান ?

বৰ্দ্ধমান সেই কোলাহল ও চীৎকারের মধ্যে এক কোণে যেমন বসেছিলেন তেমনি বসে রইলেন। যেন কোথাও কিছু হয় নি। ঝড় ওঠে নি। নদী প্রমত্ত হয় নি, জীবনের আশঙ্কা দেখা দেয় নি।

তন্ময় তদ্গত।

সে অনেককাল আগের কথা। বৰ্দ্ধমানের ইহ জীবনের নয় বহু বহু জন্ম পূর্বের কথা। সে জন্মে বৰ্দ্ধমান রাজগৃহের রাজা বিশ্বনন্দীর ভাই বিশাখভূতির পুত্র বিশ্বভূতি রূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

বিশ্বভূতি যখন যৌবন প্রাপ্ত হলেন তখন রাজগৃহের বাইরে পুষ্পকরণ্ডক নামে যে উদ্যান ছিল সেই উদ্যানে অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে প্রায়ই বিহার করতে আসতেন। কিন্তু বিশ্বভূতির সেই ঐশ্বর্য, সেই সুখভোগ রাণী মদনলেখার দাসীদের চক্ষুঃশূল হল। তাই তারা একদিন মহাদেবীর কাছে গিয়ে

নিবেদন করল, দেবী, যদিও রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী কুমার বিশাখনন্দী তবু কুমার বিশ্বভূতি পুষ্পকরণ্ডক বনের যে সুখ ও বৈভব ভোগ করছেন তার তুলনায় আপনার পুত্রের সুখ ও বৈভব কিছুই নয়। আপনার পুত্র নামেই যুবরাজ, বাস্তবে বিশ্বভূতিই যৌবরাজত্ব ভোগ করছেন।

দাসীদের কথা মদনলেখার মনে নিল। তিনি মনে মনে স্থির করলেন বিশ্বভূতিকে যেমন করে হোক পুষ্পকরণ্ডক উদ্যান হতে বার করতে হবে ও সেই উদ্যানে বিশাখনন্দীর প্রবেশের উপায় করে দিতে হবে।

রাণী মদনলেখা সেকথা রাজা বিশ্বনন্দীকে বললেন। কিন্তু রাজা সেকথা স্বীকার করলেন না। বললেন, আমাদের এই কুল নিয়ম। একবার যদি কেউ পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে প্রবেশ করে তবে যতক্ষণ না সে নিজে হতে বার হয়ে আসে ততক্ষণ তাকে বাইরে আসতে বলা যাবে না বা অন্যে সেই বনে প্রবেশ করতে পারবে না। শীতান্তে কুমার বিশ্বভূতি যখন সেই উদ্যানে প্রবেশ করেছে তখন কুমার বিশাখনন্দীকে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না সে নিজে উদ্যান হতে বার হয়ে আসে।

কিন্তু মদনলেখা এতে সন্তুষ্ট হলেন না। বিশ্বনন্দীর ওপর চাপ দেবার জন্য তিনি কোপ গৃহে প্রবেশ করলেন।

বিশ্বনন্দী উভয় সঙ্কটে পড়ে মন্ত্রীদের শরণাপন্ন হলেন।

মন্ত্রীরা সমস্ত দিক বিবেচনা করে বিশ্বনন্দীকে এই উপদেশ দিল। বলল, মহারাজ, সীমান্ত হতে দূত বিদ্রোহের মিথ্যা সংবাদ নিয়ে আসুক। আপনি তখন বিদ্রোহ দমনের জন্য যুদ্ধ যাত্রার উদ্যোগ করুন। কুমার বিশ্বভূতি যুদ্ধোদ্যমের সংবাদ পেয়ে কিছুতেই পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে বসে থাকবে না। সে বিদ্রোহ দমনে প্রস্থান করলে কুমার বিশাখনন্দী উদ্যানে প্রবেশ করবে। এতে উভয় দিক রক্ষা হবে।

রাজার এ পরামর্শ মনঃপূত হল। দূত মন্ত্রীদের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে সীমান্ত হতে বিদ্রোহের সংবাদ নিয়ে এল। রাজা সেই সংবাদের ভিত্তিতে বিদ্রোহ দমনের জন্য যুদ্ধ যাত্রার উদ্যোগ করলেন।

পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানের নিভৃতে যেখানে বাইরের কোনো শব্দই প্রবেশ করে না, যেখানে পুর-সুন্দরীদের কলহাস্যে ও নুপুর নিক্কণের ধারাবর্ষী তরল প্রবাহে

বিশ্বভূতির চিত্ত মগ্ন হয়ে থাকে সেখানে সহসা রণভেরীর বজ্র নির্ঘোষ একটু যেন উচ্চকিত হয়েই ভেঙে পড়ল। কুমার বিশ্বভূতি সুখতন্দ্রা হতে সহসা জাগ্রত হয়ে তার নূপুরঝঙ্কৃতবাহিনীকে পাশে সরিয়ে দিয়ে পুষ্পকরণ্ডক বনের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। পৌরজনদের জিজ্ঞাসা করলেন, ও কিসের শব্দ। উত্তর পেলেন, মহারাজ বিশ্বনন্দী সীমান্তের বিদ্রোহ দমনে যুদ্ধ যাত্রা করছেন।

বিশ্বভূতি ভীরু বা দুর্বল ছিলেন না। তাই তখনি জ্যেষ্ঠতাত বিশ্বনন্দীর কাছে গিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করে নিজে সেই সৈন্য বাহিনীর কর্তৃত্ব নিয়ে বিদ্রোহ দমনে গমন করলেন।

কিন্তু বিশ্বভূতি সীমান্ত অবধি এসেও কোথাও কোনো বিদ্রোহের চিহ্ন দেখতে পেলেন না। তখন প্রতিনিবৃত্ত হয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

বিশ্বভূতি রাজধানীতে ফিরে এসেই আবার পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে প্রবেশ করতে গেলেন। কিন্তু এবারে প্রহরীরা তাঁকে বাধা দিল। বলল, কুমার বিশাখনন্দী অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে এখন উদ্যানের ভেতরে রয়েছেন।

বিশ্বভূতি তখন বুঝতে পারলেন, এই বিদ্রোহ, এই যুদ্ধোদ্যম এ সমস্তই তাঁকে পুষ্পকরণ্ডক উদ্যান হতে বার করবার জন্য যাতে বিশাখনন্দী সেই উদ্যানে প্রবেশ করতে পারে। ক্রোধে তখন তিনি ক্ষীপ্ত হয়ে উঠলেন ও কপিত্থ গাছে মুষ্ট্যাঘাত করে প্রহরীদের বলে উঠলেন, কপিত্থ ফলে যেমন গাছের তলার মাটি আবৃত হয়ে গেছে তেমনি আমি তোমাদের মুণ্ডে এই মাটি আবৃত করে দিতাম। কিন্তু জ্যেষ্ঠতাতের গৌরব করি বলে তোমরা রক্ষা পেয়ে গেলে।

এই ঘটনায় কুমার বিশ্বভূতির সংসারের প্রতি কেমন যেন বিতৃষ্ণা এসে গেল। তিনি তখন সংসার পরিত্যাগ করে স্থবির আর্যসংভূতের কাছে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

রাজা বিশ্বনন্দী কুমারের সংসার পরিত্যাগে অনুতপ্ত হয়ে তাঁর নিকট ক্ষমা যাচনা করলেন ও পরে নিজেও শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

তারপর অনেককাল পরের কথা। কুমার বিশাখনন্দী মথুরায় এসেছেন সেখানকার রাজকন্যাকে বিবাহ করবার জন্য।

সংযোগবশতঃই মুনি বিশ্বভূতিও তখন মথুরাতেই অবস্থান করছিলেন। তিনি সেদিন একমাসের উপবাসের পর ভিক্ষা নিয়ে উপাশ্রয়ে ফিরছিলেন সেই পথ দিয়ে যে পথের ধারে বিশাখনন্দীর স্কন্ধাবার পড়েছিল।

বিশাখনন্দী কিন্তু বিশ্বভূতিকে প্রথমে চিনতে পারেননি কারণ তাঁর শরীর অনেক কৃশ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এক অনুচর তাঁকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল, কুমার, দেখুন, দেখুন, ওই বিশ্বভূতি।

বিশ্বভূতির প্রতি বিশাখনন্দীর মনে একটা জাত ক্রোধ ছিল। তাই বিশ্বভূতির নাম কানে যেতেই সরোষে যেই ওদিকে তাকাতে যাবেন তেমনি দেখতে পেলেন এক নবপ্রসূতা গাভী শৃঙ্গপ্রহারে বিশ্বভূতিকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। সেই দৃশ্য দেখে তিনি উচ্চহাস্য করে সেখান হতেই বলে উঠলেন, বিশ্বভূতি, কপিত্থগাছে মুষ্ট্যাঘাত করে কপিত্থ ফল ঝরাবার মতো শক্তি এখন তোমার কোথায় গেল?

সেই কটূক্তি বিশ্বভূতির কানে গেল। তিনি ফিরে চাইতেই তাঁর দৃষ্টি বিশাখনন্দীর ওপর পতিত হল। তিনি একমাস অনাহারে ছিলেন তাই স্বভাবতঃই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তার ওপর নবপ্রসূতা গাভীকে পাশ কাটাতে গিয়েই তিনি তার শৃঙ্গপ্রহারে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে তিনি নির্বীর্য হয়ে গেছেন। বিশ্বভূতি তখন সেই গাভীকে শৃঙ্গ দিয়ে ধরে মাথার ওপর চক্রের মতো ঘোরাতে ঘোরাতে বিশাখনন্দীকে ডাক দিয়ে বললেন, বিশাখনন্দী, দুর্বল সিংহের বলও কখনো শৃগাল লঙ্ঘন করতে পারে না।

বিশ্বভূতি সেখান হতে নিবৃত্ত হলেন। মনে মনে বললেন, এই দুরাত্মা এখনো আমার প্রতি ক্রোধ-পরায়ণ। সংযম ও ব্রহ্মচর্যে আমি যদি কোনো শ্রেয় লাভ করে থাকি তবে আমি যেন পর জন্মে অমিত বলের অধিকারী হই।

বিশ্বভূতি এই সঙ্কল্পের জন্য কখনো পশ্চাত্তাপ করেন নি। তাই মৃত্যুর পর পোতনপুরে রাজা প্রজাপতির পুত্র ত্রিপৃষ্ঠ বাসুদেব হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন।

বিশাখনন্দীও তাঁর ক্রূর প্রবৃত্তি ও পরিহাসের জন্য পরজন্মে সিংহ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন।

পূর্ব শত্রুতার জন্য ত্রিপৃষ্ঠ এই সিংহকে নিরস্ত্র অবস্থায় একক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নিহত করলেন।

বিশাখনন্দী সিংহদেহ পরিত্যাগ করবার পর সুদংষ্ট্র নামে বায়ু দেবতা হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন।

নৌকো যখন মাঝগংগায় এলো তখন সুদংষ্ট্রের দৃষ্টি বর্দ্ধমানের ওপর পতিত হল।

ত্রিপৃষ্ঠ জন্মে বর্দ্ধমান তাঁকে হত্যা করেছিলেন সে কথা মনে হওয়ায় প্রতিশোধ নেবার বাসনায় তিনি নদীতে ঝড় তুলে দিলেন।

কিন্তু সেই ঝড় বর্দ্ধমানকে একটুও বিচলিত করতে পারল না। বায়ু-দেবতা সুদংষ্ট্রের তাণ্ডব বর্দ্ধমানের মেরুর মতো ধৈর্যের কাছে পরাস্ত হয়ে শান্ত হয়ে গেল।

খেমিলের প্রথম কথার মতো তাই দ্বিতীয় কথাও সত্যি হল। নৌকো কূলে এসে লাগল। নূতন জীবন লাভ করে যাত্রীরাও কূলে নেমে, যে যার মতো ঘরে চলে গেল।

বর্দ্ধমান সকলের শেষে নামলেন। নেমে থাম্নকের পথ নিলেন।

বর্দ্ধমানের চলে যাবার পরেই নদী সৈকতে এল সামুদ্রিক শাস্ত্রী পুষ্য।

পুষ্যের দৃষ্টি বর্দ্ধমানের পায়ের ছাপের ওপর পড়ল। সে দেখল, সেখানে ধ্বজ ও অঙ্কুশের চিহ্ন।

পুষ্য মনে মনে বিচার করল যার পায়ে ধ্বজ ও অঙ্কুশের চিহ্ন সে কখনো রাজচক্রবর্তী না হয়ে যায় না।

কিন্তু আবার তখনি ভাবল, যে রাজচক্রবর্তী সে খালি পায়ে নদী সৈকত দিয়ে যাবে কেন?

তখন তার হঠাৎ মনে হল হয়ত কোনো কারণে তাঁর কোনো বিপদ হয়ে থাকবে।

পুষ্য তখন বিচার করতে লাগল—তার জীবনে এ যেন এক মহৎ সুযোগ এসেছে। যদি তাঁকে তাঁর বিপদে সাহায্য করবার কোনো সময় থেকে থাকে

তবে এই। মহৎ ব্যক্তি অন্যের কৃত উপকার কখনো বিস্মৃত হন না। কে জানে এ হতে তার ভাগ্যের দরজা খুলে যাবে কিনা।

পুষ্য তখন সেই পায়ের ছাপ অনুসরণ করে সেখান হতে থাসুক সন্নিবেশে এসে উপস্থিত হল।

শুধু পায়ের ছাপই নয়, দেখল বর্দ্ধমানের সমস্ত গায়ে রাজচক্রবর্তীত্বের লক্ষণ।

কিন্তু পুষ্য যা দেখবে বলে এসেছিল তা দেখতে পেল না। দেখল এক নগ্নদেহ শ্রমণ কায়োৎসর্গ ধ্যানে এক গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। একে সে কিভাবে সাহায্য করতে পারে।

পুষ্যের নৈরাশ্যের সীমা নেই। নৈরাশ্য ভাগ্যের জন্যই নয়, নৈরাশ্য তার সামুদ্রিক শাস্ত্রই যে মিথ্যা হয়ে গেল তার জন্য। যার রাজচক্রবর্তী রাজা হবার কথা সে কিনা দীন, পথের ভিক্ষুক।

যে শাস্ত্র মিথ্যা সে শাস্ত্র ঘরে রেখে লাভ কি?

পুষ্য তাই ঘরে ফিরে গেল ও তার আজীবন সঞ্চিত গ্রন্থগুলো একে একে টেনে এনে আগুনে ফেলতে লাগল।

পুষ্যের স্ত্রী স্বামীর কাণ্ড দেখে বলল, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

পুষ্য তখন সমস্ত কথা খুলে বলল। বলল, যে শাস্ত্র মিথ্যা তাতে তার প্রয়োজন নেই।

সমস্ত শুনে পুষ্যের স্ত্রী বলল, যে লক্ষণ রাজচক্রবর্তীর সে লক্ষণ ত তীর্থংকরেরও। উনি হয়ত ভাবী তীর্থংকর।

পুষ্য সেকথা শুনে গ্রন্থগুলো আগুনে ফেলা হতে নিরস্ত হল। দগ্ধ গ্রন্থের জন্য তার চিত্ত তখন অনুশোচনায় ভরে উঠল। ভাবল, এ কথা তার প্রথমেই কেন মনে হয়নি!

থাসুক হতে বর্দ্ধমান এলেন রাজগৃহে। কিন্তু রাজধানীতে তিনি অবস্থান করলেন না। চলে এলেন বাহিরিকা নালন্দায়। সেখানে এক তন্তুবায়শালায় আশ্রয় নিলেন।

[ক্রমশঃ

উদয়পুরের বিজ্ঞপ্তিপত্র

শ্রী বি. এল. নাহটা

জৈন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের একটী বিশেষ অবদান সচিত্র ও দীর্ঘ আমন্ত্রণ বা বিবরণ পত্র যাদের 'বিজ্ঞপ্তিপত্র' বলে অভিহিত করা হয়। বিজ্ঞপ্তিপত্রের দিকে ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিদ বা সামাজিক ইতিহাস লেখকদের দৃষ্টি এখনো তেমন আকৃষ্ট হয়নি। অনেকদিন আগে বরোদায় গাইকোয়াড়ের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে প্রকাশিত গ্রন্থমালায় প্রথমপুষ্প রূপে বিজ্ঞপ্তিপত্রের একটী সংগ্রহ *Ancient Vijnaptipatra* নামে প্রকাশিত হয়। তারপরও বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত জৈন গ্রন্থ ভাণ্ডারে আরো অনেক বিজ্ঞপ্তিপত্রের সন্ধান পাওয়া যায় যা আজো কোথাও প্রকাশিত হয়নি। অথচ শিল্পকীর্তি বা সামাজিক ইতিহাসের উপাদানরূপে অন্য যে কোন উপাদানের চাইতে এদের মূল্য কিছু কম নয়।

এ কথা সকলেরই জানা আছে যে জৈন সাধু সাধ্বী শ্রাবক ও শ্রাবিকারূপ চতুর্বিধ সংঘে আচার্যের স্থান সকলের ওপরে। তাই পর্যুষণ পর্বে প্রদত্ত ব্যাখ্যান, উপবাসাদিরূপ তপস্যা ও 'প্রভাবনা'য় প্রদত্ত দ্রব্যাদির বিস্তারিত বিবরণ তাঁকে জানানো অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া সেই পত্রে সেইখানে এসে কিছুকাল অবস্থানের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণও জানানো হয়। সাধু ও সাধ্বীরা আচার্যের নিকট যে আমন্ত্রণপত্র পাঠান তা সাধারণতঃ সংস্কৃত ও প্রাকৃত, গদ্যে ও পদ্যে লিখিত হয় কিন্তু শ্রাবকেরা যে পত্র পাঠান তা সংস্কৃত ও স্থানীয় ভাষায় বা শুধুমাত্র স্থানীয় ভাষায় লিখিত হয়। সময় সময় আমন্ত্রণ পত্র চিত্রিতও করা হয়।

এই বিজ্ঞপ্তিপত্র প্রেরণের রীতি শ্বেতাম্বর জৈনদের মধ্যে বহু দিনের এবং এ তাদের ঐতিহ্যের অন্তর্গত সে কথাও বলা যায়। এ পর্যন্ত সব চাইতে প্রাচীন যে বিজ্ঞপ্তিপত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে তা পাটন হতে জিনোদয় সূরী কর্তৃক ১৪৩১ সম্বতে (১৩৭৫ খৃঃ) অযোধ্যায় অবস্থিত লোকহিতাচার্যকে
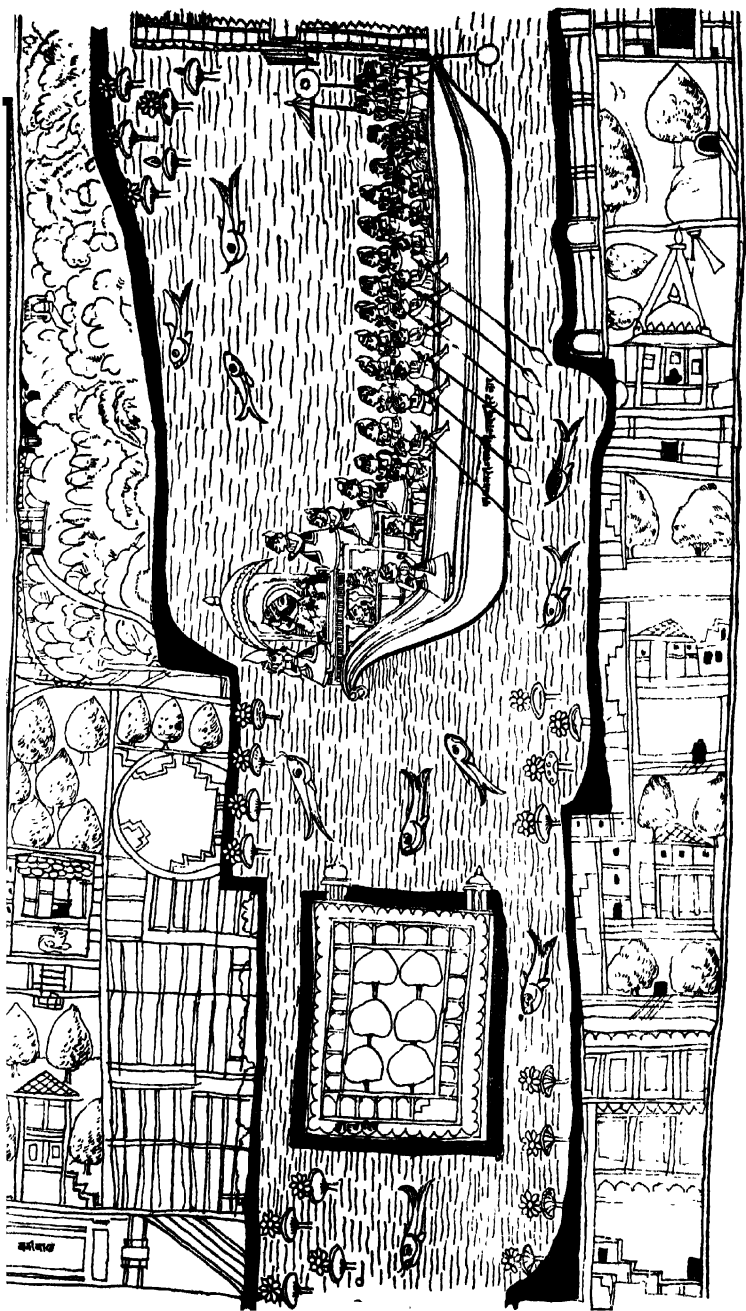
পিচোলা হ্রদে দরবারসহ নৌবিহারে মেওয়াড়ের রাণা

প্রেরিত হয়। এর পরের বিজ্ঞপ্তিপত্রটী খণ্ডিত এবং ১৪৬৬ সম্বতে (১৪১০ খৃঃ) দেবসুন্দর সূরি কর্তৃক প্রেরিত হয়। তৃতীয় বিজ্ঞপ্তিপত্র ১৪৮৪ সম্বতে (১৪২৮ খৃঃ) খরতরগচ্ছীয় উপাধ্যায় জয়সাগর গণি কর্তৃক জিনভদ্র সূরীকে প্রেরিত হয়। এই পত্রটী একটী কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ এটিতে সিন্ধুর মালিকবাহনপুর হতে নগরকোট কাঙড়ায় তীর্থযাত্রার বিশদ ও বাস্তব বর্ণন দেওয়া আছে (মুনি জিনবিজয় সম্পাদিত 'বিজ্ঞপ্তি ত্রিবেণী')। পঞ্চদশ শতকের মাত্র এই তিনটী বিজ্ঞপ্তিপত্রই পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের কোন বিজ্ঞপ্তিপত্র এখনো পাওয়া যায়নি।

সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকের (১৬০৪-১২) একটি খণ্ডিত বিজ্ঞপ্তিপত্র বিকানীরের নাহটা সংগ্রহে সংরক্ষিত রয়েছে। এই সচিত্র বিজ্ঞপ্তিপত্রটি গদ্য ও পদ্যে লিখিত ও বিকানীর হতে জৈসলমীরে জিনমাণিক্য সূরীর নিকট প্রেরিত। এরপর বিজ্ঞপ্তিপত্র প্রেরণের রীতিতে জোয়ার আসে ও 'দূত কাব্য', 'খণ্ড কাব্য', 'পাদপূর্তি কাব্য' রূপে এগুলি লিখিত হতে থাকে এবং এই ধারা অষ্টাদশ শতক অবধি অব্যাহত থাকে যখন সংস্কৃতের স্থান স্থানীয় ভাষা অধিকার করে। তবে গদ্যে ও পদ্যে লেখার রীতির পরিবর্তন হয় না। সপ্তদশ শতক হতে ১৯ শতক অবধি 'গজল' ধরণের কবিতার বিশেষ করে নগর বর্ণনায় বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

বিজ্ঞপ্তিপত্র চিত্রিত করার রীতি সপ্তদশ শতক হতে প্রচলিত হয় এবং চিত্রিত বিজ্ঞপ্তিপত্রের মধ্যে তপগচ্ছের আচায বিজয়সেন সূরীর নিকট আগ্রার সংঘ কর্তৃক প্রেরিত বিজ্ঞপ্তিপত্রের স্থান সবোচ্চে। এই বিজ্ঞপ্তি-পত্রকে একটী মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিলও বলা যায়, কারণ, এই বিজ্ঞপ্তিপত্রে মোগল দরবারের প্রখ্যাত শিল্পী শালিবাহন কর্তৃক সম্রাট জাহাঙ্গীর বারটী সুবায় জীব হত্যা বন্ধ করে যে 'ফার্মাণ' জারী করেন ও রাজা রামদাস যার অনুলিপি করেন তা চিত্রিত। প্রত্যেকটী ছবির তলায় যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা হতে তৎকালীন ভূগোল, রাজনীতি ও সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। আগ্রার মোগল দরবার, জৈন সাধুদের আগমন, আগ্রাদুর্গের দরজার নিকট জয়মল ও পুত্তের প্রস্তরমূর্তি প্রভৃতিও এখানে চিত্রিত হয়েছে। তাছাড়া সেখানকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির বিবরণ, উপবাসাদির তালিকা ও

পরিশেষে জনৈক চণ্ডু কর্তৃক তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠায় উৎসবে আচার্যের উপস্থিতি প্রার্থনা করে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

এই শতকে এই ধরণের আরো বহু বিজ্ঞপ্তিপত্র লেখা হয়ে থাকবে কিন্তু তাদের সন্ধান আমরা পাইনি। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে অন্ততঃ ৫০টী বিজ্ঞপ্তি-পত্রের সন্ধান আমরা পাই যার কিছু বিনষ্ট হলেও অধিকাংশই জৈন গ্রন্থভাণ্ডারে আজো সংরক্ষিত রয়েছে। এদের মধ্যের অন্ততঃ বারটীর বিবরণ উপরোক্ত *Ancient Vijnaptipatra* গ্রন্থে পাওয়া যায়। বাকীগুলোর বিবরণ আজো প্রকাশিত হয়নি। ১৮৮৭ সম্বতে (১৮৩১ খৃঃ) উদয়পুর হতে প্রেরিত একটী বিজ্ঞপ্তিপত্রের বিবরণ এখানে আমরা লিপিবদ্ধ করছি। সচিত্র বিজ্ঞপ্তিপত্র প্রেরণের রীতি ১৯১৬ সম্বত (১৮৬০ খৃঃ) পর্যন্ত প্রচলিত থাকে তারপর সহসা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯১৬ সম্বতে খরতর গচ্ছাচার্য মুক্তিসূরীর নিকট প্রেরিত বিজ্ঞপ্তিপত্রই শেষ বিজ্ঞপ্তিপত্র।

উদয়পুরের বিজ্ঞপ্তিপত্রটী দৈর্ঘ ও প্রস্থে ৭০′×১′২″। দুদিকের কিনারায় লতাপাতার অলঙ্করণ। উদয়পুরের বিভিন্ন স্থানের বহু চিত্র এটীতে অঙ্কিত রয়েছে যা তৎকালীন ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার ওপর আলোকপাত করে। প্রত্যেকটী চিত্রের নীচে তার বিবরণ দেওয়া রয়েছে। এই বিবরণ সমস্ত বিজ্ঞপ্তিপত্রে যে থাকে তা নয়। এই বিজ্ঞপ্তিপত্র হতে যে তথ্য আমরা পাই তা এই :

(১) ভাষা মেওয়াড়ীর পরিবর্তে মারওয়াড়ী। সম্ভবতঃ লিপির লেখক পণ্ডিত ঋষভদাস ও পণ্ডিত কুশলদাস মারওয়াড়ের অধিবাসী ছিলেন।

(২) বিজ্ঞপ্তিপত্র পাঠাবার বিলম্বের কারণ রূপে বলা হয়েছে যে শেঠ জোরাওরমল বাফনা সহরে অনুপস্থিত ছিলেন ও মেহতা সের সিং বচ্ছাবত ছুটীতে ছিলেন। অবশেষে শ্রী মেহতা রাণার কৃপায় বৈশাখ শুক্লা দ্বিতীয়ায় কাজে যোগদান করেছেন।

(৩) রাণার ডাক-হরকরাই এই বিজ্ঞপ্তিপত্র বিকানীরে নিয়ে যাচ্ছে।

(৪) এই আমন্ত্রণ লিপিতে নগরের প্রমুখ ও রাজকীয় ব্যক্তিরা স্বাক্ষর করেছেন। যথা, মেহতা সের সিং, নগর শ্রেষ্ঠী বেণীদাস, জোরাওরমল বাফনা, সুলতান চাঁদ, চন্দনমল ও আরো অনেকে।

মাহেশ্বরীদের মন্দির
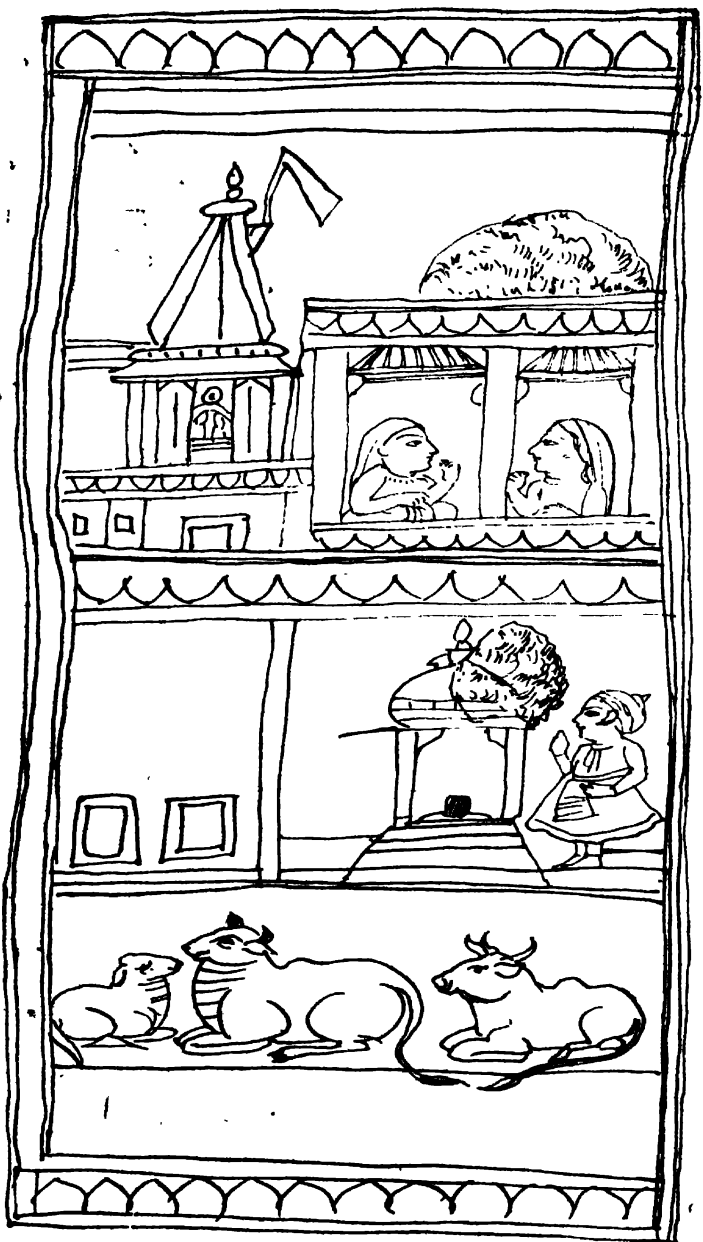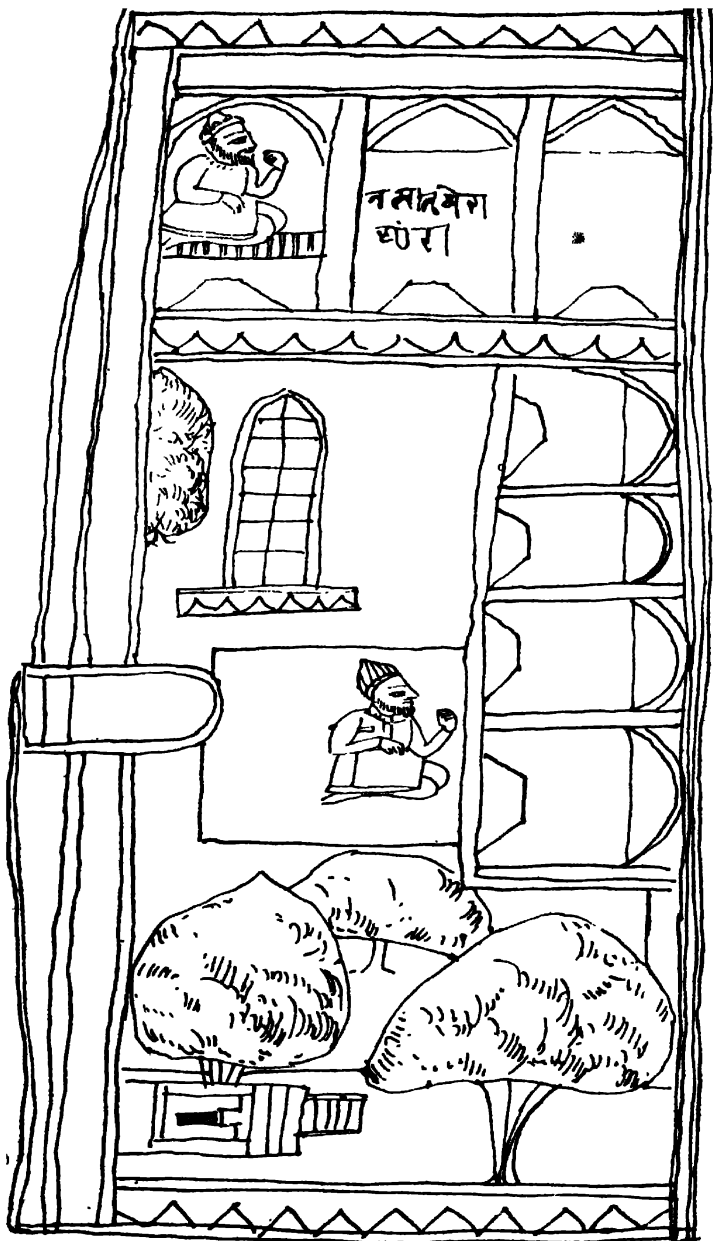
শেরখানের মসজিদ

(৫) বিজ্ঞপ্তিপত্রটী চিত্রের দৃষ্টিতেও মূল্যবান। রাণার ছবি চার বার চিত্রিত হয়েছে : (ক) পিচোলা হ্রদে দরবারসহ নৌবিহারে, (খ) ভোজনালয়ে, (গ) সামন্তসহ দরবার কক্ষে, ও (ঘ) ইংরেজ রেসিডেণ্ট কাফের সঙ্গে হস্তীপৃষ্ঠে।

বিজ্ঞপ্তিপত্রের ওপরে গামলায় ফুল গাছের ছবি। দুদিকে শুক পাখী। তারপর মঙ্গল কলস। দুজন চামরবাহিনী সেবিত তিনটী পর্যঙ্কের চিত্র। তীর্থংকর জননী যে চোদ্দটী স্বপ্ন দেখেন সেই স্বপ্ন। তীর্থংকর জননী চারজন পরিচারিকা পরিবৃত অবস্থায় শয্যায় শয়ান। জৈন মন্দির ও পরিশেষে অষ্ট-মাঙ্গলিক। এই অংশের দৈর্ঘ ১৪'৩"।

এরপর উদয়পুরের ঐতিহাসিক চিত্র। প্রথমেই পিচোলা হ্রদ, নৌকো ও জলচর প্রাণী। হ্রদের দুদিকে পাহাড় ও বন। বাঁ দিকে সীতাদেবী ও বৈজ-নাথের মন্দির। হ্রদের মধ্যে জগ মন্দির। উদ্যান সম্বলিত জগনিবাস, রাণার নৌকো ও মোহন মন্দির। ডান দিকে জঙ্গলের মধ্যে শিবের মন্দির, বড়ীপাল (ঘাট), ভীম নিবাস, নজরবাগ ও রূপ ঘাট। বাঁ-দিকে তিনটী মন্দির রয়েছে যার একটী ভীমপদ্মেশ্বরের। নিকটেই অমরকুণ্ড। এই অংশের দৈর্ঘ ৭'১০"।

এরপর প্রাসাদের দৃশ্য। ভোজনালয়ে রাণা, ডান দিকে দামামা। মন্দিরে উপাসনা দৃশ্য, সুরজ গোখরা, জনানী পোল, তোরণ পোল, মহলে প্রবেশের খিড়কী দরজা, চিনি গোখরা, অমর মহল, দরবার দৃশ্য, রাণা সিংহাসনে সমাসীন। চারজন সভাসদ সম্মুখে, চার জন পেছনে, আট জন তাঁদের আসনে বসে। এ ছাড়া আরো দশ জন লোক দাঁড়িয়ে, চার জন মহিলা মাটীতে বসে। উঠানে ঘোড়সওয়ারেরা ঘোড়াদের ঘোরাচ্ছে। হাতী ও পদাতিক। ত্রিপোলিয়া দরজা ও এগার জন রক্ষী। দরজার বাইরে ডান দিকে ঘড়িঘর, মধ্যের উঠোনে অশ্বারোহী, দূত, পালকী, ভারবাহক, গোয়ালা। তারপর বড়ী পোল। একজন রক্ষী দাঁড়িয়ে, সাত জন বসে। বাঁ দিকে মদোন্মত্ত হাতী শেকল দিয়ে বাঁধা। সামনে ভাণ্ডার, ডান দিকে কল্যাণ কেন্দ্র—এ সমস্তই ডান দিকে।

ডান দিকে কল্যাণ কেন্দ্রের পেছনে কয়েকটী অট্টালিকা। তারপর কৃষ্ণ মন্দির। মন্দিরের নীচে লেখা, বাবাদের মন্দির। আবার কয়েকটী অট্টালিকা,

হস্তীপৃষ্ঠে ইংরেজ রেসিডেন্ট কাফ সাহেব

যাদের জানালায় মেয়ে ও পুরুষ। তারপর বাফনা ও কসৌটাদের জৈন মন্দির, ধনী শ্রেষ্ঠর বাড়ী, বন্ধু বান্ধবসহ শ্রেষ্ঠী, বাজার, দোকানীসহ দোকানের সারি, মারওয়াড়ী চক, কয়েকটী বড় দোকান, কোতবালি চক, মনিহারি দোকান ও মুদিখানা, ছনব্রোর দিগম্বর জৈন মন্দির, খরতর গচ্ছের বাসুপুজ্যের প্রাচীন মন্দির, একলিঙ্গ দাস চবলার মন্দির, বজাজ বাজার, তালারি মাতার মন্দির, দিগম্বর মন্দির, মুচিদের বাজার, চতুর্ভুজ যোগীর বাড়ী, সোনাচাঁদির দোকান, আগরওয়ালা সম্প্রদায়ের জৈন মন্দির, তামার টাকশাল, কয়েকটী দোকান ও শেষে দিল্লী দরওয়াজা।

বাঁ দিকে গুদাম, রাজপুরোহিত জগন্নাথ রায়ের মন্দির, নিরুঘাটের পথ, কয়েকটী বাড়ী, তীর্থংকর চন্দ্রপ্রভের মন্দির, রাজকুমারদের জন্য নির্মিত নূতন প্রাসাদ, রূপোর টাকশাল, তীর্থংকর শীতলনাথের মন্দির, তপগচ্ছীয় উপাশ্রয়, জগরূপ দাস কাঁকারিয়ার দোকান, কয়েকটী বড় দোকান, মুদিখানা, রংরেজী বাজার, খেরখানের মসজিদ, সন্দের গচ্ছের মন্দির, ঘিষা জৈন মন্দির, মুচি-বাজার, যোশীজী মন্দির, ঢুঁঢ়িয়াদের উপাশ্রয়, খণ্ডেলওয়ালাদের মন্দির, মাহেশ্বরীদের সায়র মন্দির, ভেঁরুর স্থান, খরতর ভট্টারকদের উপাশ্রয়, তীর্থংকর ঋষভদেবের খরতর গচ্ছীয় মন্দির, সাহেলা দারোগা পাঞ্চল্যার মন্দির, মাহেশ্বরীদের মন্দির, জ্বালামুখী কামান, রাস্তার ধারে সামনে একটী ছোট কামান, দিল্লী দরওয়াজা।

মধ্য ভাগে হাতী, ঘোড়া, উঁট, অশ্বারোহী, পদাতিক, পালকী, রথ, মেয়ে জলবাহক, কুলী, ফকির ও পথচারী। সবজী বাজার—পথের ধারে বসে মেয়েরা সবজী বিক্রী করছে। দলবলসহ হস্তী পৃষ্ঠে রাণা, সঙ্গে কাফ সাহেব। থানা ও চুঁগীঘর। সুরী মহারাজকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সমবেত স্ত্রী-পুরুষ। ফুটা দরওয়াজা, দিল্লী দরওয়াজা। বড়ী পোল হতে দিল্লী দরওয়াজা পর্যন্ত এর দৈর্ঘ ৩২´৬''।

নগর দরজার বাইরে ভট্টারকদের গৃহ, মুসলমান ফকিরের আবাস, হনুমান মন্দির, ভিখারীনাথ তালাও, ইংরাজ সৈন্যদের ছাউনি, ইংরেজদের বাংলো। বাঁ দিকে উজাগীর মন্দির, চেলাদের মন্দির, দাদু সম্প্রদায়ের আখড়া, পনহারী মন্দির, নূতন দাদাবাড়ী। দাদাবাড়ী সংলগ্ন উদ্যানে সুরী-

মহারাজ অবস্থান করেছেন, তাঁকে ঘিরে রয়েছে ভক্ত শ্রাবক ও শ্রাবিকা। উদ্যানের বাইরে আগতদের যান-বাহন: রথ, পালকী, ইত্যাদি। দিল্লী দরওয়াজার বাইরে যতি, শ্রাবক, বাদ্যবাদক, সুসজ্জিত অশ্ব, হস্তী, রাজকীয় রক্ষী ও অভ্যর্থনার জন্য আগত নাগরিকেরা। এই অংশটী ৭' ফুট দীর্ঘ। চিত্রের এইখানেই পরিসমাপ্তি। এরপর আমন্ত্রণ পত্র যার দৈর্ঘ ৪'৯" ; শেষের ৩' ফুটে আমন্ত্রণ দাতাদের স্বাক্ষর। আমন্ত্রণ পত্রের অংশ বিশেষের অনুবাদ নীচে দেওয়া গেল:

...বিক্রমপুর নগরে ...শ্রীশ্রীজিনহর্ষ সুরীকে উদয়পুরের বিনয়াবনত সংঘ শ্রদ্ধা ও বন্দনা জানাচ্ছে... ভগবান কেশরীয়ানাথের দয়ায় এখানে সর্বাঙ্গীন কুশল...সংঘ আপনার কুশল কামনা করে...আপনি মহান, আপনি উদার... চকোর যেমন চাঁদের কামনা করে সংঘ তেমনি এখানে আপনার উপস্থিতি কামনা করে...উদয়পুরে চাতুর্মাস্য যাপন করবার অনুগ্রহ করুন...সংঘের মহান নেতাদের সঙ্গে সকলে আপনার সম্মতির অপেক্ষা করছে...আপনার স্বীকৃতিপত্র পেলে মহৎ ভাগ্য বলে মনে করবে...আপনার উপস্থিতিতে বহুলোক লাভান্বিত হবে, সংঘের গৌরব বৃদ্ধি পাবে ও সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হবে...ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর আমন্ত্রণ লিপি পাঠাতে বিলম্ব হবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে। তারিখ জৈষ্ঠ্য বদি ১, ১৮৮৭ বিক্রম সম্বৎ। ভুল ত্রুটির জন্য পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনা।

এই প্রবন্ধে প্রকাশিত চিত্রগুলি লেখকের সৌজন্যে প্রাপ্ত। রেখায় রূপান্তর শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত।

অহিংসা ব্রত

ডাঃ হরিসত্য ভট্টাচার্য

॥ ১ ॥

অভীষ্ট লাভের অন্যতম উপায় মাত্র রূপে গণনা না করিয়া অহিংসাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করা ভারতবর্ষের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। বর্তমান যুগে মহামানব মহাত্মা গান্ধী অহিংসাকে মানবের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি জীবনের সকল ব্যাপারেই একমাত্র অবলম্বনীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সকল ধর্মাবলম্বীরই নিকট অহিংসা ধার্মিক আচার বলিয়া আদৃত হইলেও, কথিত হয় যে মহাত্মা গান্ধী শ্রীমদ্‌রাজচন্দ্র নামক সুবিখ্যাত জৈন তত্ত্ববেত্তার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। সুতরাং অহিংসা সম্বন্ধে জৈনগণের ধারণা ও মতামতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা অসমীচীন হইবে না।

জৈনগণের আচরিত অহিংসা সম্বন্ধে বঙ্গদেশবাসীর ধারণা যে জৈনগণ মনুষ্যেতর জীবের রক্ষার জন্য তৎপর থাকাই অহিংসা বলিয়া মনে করেন। জৈন অহিংসার এ বিবরণ নিতান্তই অপর্যাপ্ত।

জৈনগণের মতে, ধার্মিক জীবনের মূলে ব্রত পরিপালন এবং মহাব্রত পঞ্চকের মধ্যে অহিংসা ব্রতই সর্বশ্রেষ্ঠ ও ভিত্তিস্থানীয়। ব্রত আত্মোৎকর্ষ-বিধায়ক এবং বিরতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অপকর্ম হইতে বিরত হওয়ার নামই বিরতি। কিন্তু তজ্জন্য বিরতি মূলক ব্রত জৈন মতে মাত্র নিষেধাত্মক, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। ব্রত পরিপালন বা ধার্মিক জীবন জৈন মতে শুধু নৈষ্কর্ম বা কর্ম পরিহার নহে, ব্রত প্রকৃতপক্ষে সৎকার্যের মধ্য দিয়াই অনুষ্ঠিত হয়। এই বিষয়ে বিশুদ্ধ বৈদান্তিক মতের সহিত জৈন মতের কিছু পার্থক্য দেখা যায়। বেদান্ত সিদ্ধান্তে কর্ম-পরিহারই মুখ্য ধর্ম ও ধার্মিক জীবনের লক্ষ্য। জৈন মতে অপকর্ম পরিহার ধর্ম হইলেও সৎকর্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত ধর্মাচরণ অসম্ভব। মধ্যপন্থী বৌদ্ধগণ নিষেধাত্মক কর্ম পরিহারের সহিত ধার্মিক

জীবনে সদাচার পালনের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেও, জৈনগণ তাঁহাদের অপেক্ষা সৎকর্ম অনুষ্ঠানের উপর অধিকতর আস্থা স্থাপন করিতেন বলিয়াই মনে হয়।

অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, অস্তেয় এবং অপরিগ্রহ জৈনগণের সমাদৃত পঞ্চ ব্রত। এই ব্রত পঞ্চক নির্দোষ ভাবে প্রতিপালিত হইলে 'মহাব্রত' আখ্যা প্রাপ্ত হয়, অন্যথা তাহারা 'অণুব্রত' নামে পরিচিত হইয়া থাকে। মহাব্রত ও অণুব্রতের মধ্যে প্রকৃতিগত কোন বিভিন্নতা নাই। নির্দোষ পরিপালনের তারতম্যবশতঃ তাহারা পৃথকভাবে গৃহীত হয়।

ব্রতপরিপালন ব্যাপারে যাহা যাহা প্রয়োজনীয় এবং যাহা যাহা বর্জনীয়, অহিংসা অনুষ্ঠানে সেই সেইগুলি যথাক্রমে প্রয়োজনীয় ও বর্জনীয়—ইহা বলাই বাহুল্য। ব্রতানুষ্ঠানে তথা অহিংসাচরণে তিনটী মনোভাব সর্বাগ্রে সর্ব প্রযত্নে পরিবর্জনীয়। জৈনগণ ব্রতানুষ্ঠানের এই তিনটি কণ্টককে 'শল্য' নামে অভিহিত করেন। কোনও ব্যক্তিকে অথবা নিজেকে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে কোনও সদাচার তথা অহিংসক কর্ম অনুষ্ঠিত হইলে, ঐ সৎকর্ম 'মায়া-শল্য' নামক প্রথম শল্য দ্বারা প্রতিহত হয়। সেইরূপ কোন সৎকর্ম কুসংস্কার প্রণোদিত হইলে, তাহা 'মিথ্যা-শল্য' নামক দ্বিতীয় প্রকার শল্যে দূষিত, এবং কোন সদনুষ্ঠান ভবিষ্যৎ সুখ-প্রাপ্তির স্বার্থান্ধ আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুষ্ঠিত হইলে তাহা 'নিদান' নামক তৃতীয় শল্যে কলঙ্কিত হয়। প্রত্যেক সদাচার তথা অহিংসানুষ্ঠান জৈন মতে 'নিঃশল্য' হওয়া উচিত। শুধু ধর্মাগ্রন্থানুমোদিত হইলেই কোন অনুষ্ঠান সুকর্ম বা অহিংসক হয় না। অহিংসা অনুষ্ঠাতাকে সদনুষ্ঠানের সময় তন্ন তন্ন করিয়া আত্ম-পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে তাঁহার অনুষ্ঠানের মূলে কোনও প্রতারণা, কোনও অন্ধ-সংস্কার বা কোনও স্বার্থ লিপ্সার লেশ আছে কিনা, যদি থাকে, তাহা হইলে তাঁহার তথাকথিত অহিংসক কর্ম শল্য-দূষিত হওয়ায় অপকর্ম বলিয়া তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। নিঃস্বার্থ, বিশুদ্ধ আত্মোন্নতির জন্য আচরিত অহিংসাই জৈন মতে নিঃশল্য ও নির্দোষ ব্রত।

শল্য নিষেধাত্মক। ব্রতানুষ্ঠানে যে মনোভাব তিনটী সর্বতোভাবে সর্বাগ্রে পরিবর্জন করিতে হয় তাহাই শল্য ত্রয় নামে অভিহিত হয়। জৈনগণ বলেন,

যে মনোক্ষেত্রে প্রকৃত ব্রতানুষ্ঠানে অনুরাগের উৎপাদন করিতে হইবে। তাহা শুধু শল্য বিবর্জিত হইলেই উপযুক্ত হইবে না, পরন্তু তাহা উৎকৃষ্ট ভাবনায় সরস হওয়া উচিত। হিংসাদির অনুষ্ঠান ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ দুঃখের জনক,—ইহাই প্রথম ভাবনা এবং অহিংসাচারীকে এই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। জগতের সমস্ত ব্যাপারই অচিরস্থায়ী এইরূপ ভাবনার নাম 'সংবেগ'। এবং শরীরও ক্ষণস্থায়ী এবং ইহার ব্যাপারাদি দুঃখজনক, এই-রূপ ভাবনার নাম 'বৈরাগ্য'। ব্রত পরিপালনেচ্ছু তথা অহিংসক সাধককে সংবেগ ও বৈরাগ্য ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে নির্দোষ ব্রতানুষ্ঠান ও অহিংসাচরণে জৈনগণ আরও চতুর্বিধ উৎকৃষ্ট ভাবনার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। জগতের সকল প্রাণীর প্রতি 'মৈত্রী' ভাব, মুক্তি পথের পথিক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সংসর্গে 'প্রমোদ', ধর্ম পালনে আপনা হইতে অনগ্রসর হীনতর জনের প্রতি 'কারুণ্য' ভাব এবং দুর্বিনীত ব্যক্তির প্রতি 'মাধ্যস্থ' ভাবের পোষণ এই চারিটী 'ভাবনা' ধর্মাচরণে তথা অহিংসকানুষ্ঠানে বিশেষ ভাবে সহায়ক।

॥ ২ ॥

হিংসা কর্ম হইতে বিরতি অহিংসা। জৈনগণের মতে 'প্রমত্ত-যোগ' বশতঃ যে প্রাণঘাত তাহারই নাম হিংসা। উত্তেজনা মূলক যে আত্মিক চাঞ্চল্য, যাহার ফলে হিংসা কর্ম অনুষ্ঠিত হয় সেই আত্মিক চাঞ্চল্যই প্রমত্ত যোগ। হিংসা কর্ম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে সর্বাগ্রে শরীর, বাক ও অন্তরিন্দ্রিয় বিক্ষুব্ধ হয় এবং তাহার ফলে আত্মার মধ্যে তদনুরূপ একটা অস্থিরতা বা কম্পন সদৃশ প্রবল বহির্মুখতা দেখা দেয়; এই আত্মিক বিক্ষোভের ফলে প্রাণঘাত বা হিংসা কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। হিংসা বা প্রাণঘাতে নিজের ভাবপ্রাণ বা অন্তরাত্মায় আঘাত অথবা উক্ত অন্তরাত্মা সংশ্লিষ্ট দ্রব্যপ্রাণ বা দেহাদি কোন বাহ্য বস্তুতে আঘাত অথবা অন্য কোনও প্রাণীর ভাবপ্রাণে আঘাত বা উক্ত প্রাণীর ভাবপ্রাণের সহিত সম্মিলিত শরীরাদি দ্রব্যপ্রাণে আঘাত। এইগুলি হিংসার পরিণাম। অপরপক্ষে দৈববশতঃ কোনও সত্ত্ব আহত হইতে পারে; কোনও ব্যক্তির অত্যুত্তম সদিচ্ছা সত্বেও কোন

প্রাণীর অনিষ্ট হইতে পারে (যথা, অস্ত্র চিকিৎসকের প্রযত্ন ও সাবধানতা সত্ত্বেও অনেক সময় রোগীর মৃত্যু হয়), কিন্তু এই সব ব্যাপারে অনিষ্ট করণের ইচ্ছার অভাব বশতঃ হিংসা অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলা যায় না। অস্ত্রোপচার বেদনাদায়ক হইবে জানিয়াও চিকিৎসক শরীরে ব্যাধিগ্রস্ত অংশে অস্ত্রপ্রয়োগ করেন; শিক্ষক ছাত্রকে তিরস্কার করেন, এমন কি সময়ে সময়ে তাহাকে প্রহার করেন; ঐহিক ব্যাপারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধর্মগুরু সংসারমুগ্ধ শিষ্যের মনে নিদারুণ আঘাত করেন; এই সমস্ত ব্যাপারে আঘাত অনুষ্ঠিত হয় এবং ইচ্ছা পূর্বকই ঐ আঘাত অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি কোনও রূপ হিংসাচরণ হয় না। কারণ ঐ সকলের মূলে উপকারের ইচ্ছাই কার্যকরী, কোনও প্রকৃত অনিষ্ট সাধন করিবার সঙ্কল্প থাকে না। সুতরাং কেবল মাত্র অনিষ্ট করিলেই হিংসা করা হয় না, এমন কি সময়ে সময়ে ইচ্ছা পূর্বক অনিষ্ট সাধন করিলেও হিংসা করা হয় না। অনিষ্ট সাধনের যে ইচ্ছার মধ্যে 'কষায়' বা মানসিক বিক্ষোভ থাকে অর্থাৎ যে স্থলে অনিষ্ট করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য লইয়া কাহারও অনিষ্ট করা হয়, সেই স্থলেই হিংসা অনুষ্ঠিত হয়। কথিত হয় যে স্থলে মনের মধ্যে এই হিংসা করণের বাসনা উদিত হয়, সে স্থলে কোন বাহ্য প্রাণী আঘাত প্রাপ্ত না হইলেও, হিংসা কর্ম সাধিত হয়, কারণ অপর কোন প্রাণী আহত না হইলেও, কষায় যোগ বশতঃ সংকল্প করিবার জন্য নিজের অন্তরাত্মা হিংসিত হইয়া থাকে।

জৈনগণ হিংসার যে চতুর্বিধ প্রকার ভেদ স্বীকার করেন তাহা এই প্রসঙ্গে বিবেচিত হইতে পারে। সংকল্প বা অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা লইয়া যে হিংসা অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম 'সংকল্পিনী' হিংসা। এই সংকল্পিনী হিংসা, হিংসার জঘন্যতম প্রকার ভেদ। আত্মরক্ষার জন্য যে হিংসা কার্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা 'বিরোধিনী' নামক দ্বিতীয় প্রকারের হিংসা। অপরে যখন কোনও ব্যক্তির হিংসা করিবার জন্য সম্যকরূপে প্রস্তুত, তখন হিংসিত ব্যক্তি সাধারণতঃ নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য হিংসার বিরুদ্ধে হিংসার প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয়। প্রত্যেক সুসভ্য দেশের রাজকীয় বিধানে আত্মরক্ষা মূলক হিংসার সমর্থন দেখা যায়। বিরোধিনী হিংসা আদৌ হিংসা নহে, জৈনগণ একথা বলেন না। তবে তাঁহাদের মতে বিরোধিনী হিংসা সংকল্পিনী হিংসা অপেক্ষা অনেকটা কম

নিন্দনীয়। সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে বিরোধিনী হিংসা অনেক সময়েই অপরিহার্য, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য যেটুকু হিংসার প্রয়োজন, তাহার অতিরিক্ত হিংসা প্রয়োগ কোনও মতেই সমর্থন যোগ্য নহে। ইহা প্রত্যেক দেশের দণ্ডবিধি আইনে বিহিত হইয়াছে এবং জৈনগণও স্পষ্ট ভাবে সেই কথাই বলেন। যে স্থলে হিংসা প্রয়োগ আত্মরক্ষার মাত্রা অতিক্রম করিয়া উৎকট প্রতিশোধ গ্রহণে পর্যবসিত হয় জৈনগণের মতে সেস্থলে বিরোধিনী হিংসা সংকল্পিনী হিংসার মতই গর্হনীয়। গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনে যে সমস্ত হিংসা কার্য অপরিহার্য তাহা 'আরম্ভিনী' নামক তৃতীয় প্রকার হিংসা। গার্হস্থ্য জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তি গৃহ সম্মার্জন, বস্ত্রাদি ধৌত, অগ্ন্যাধানে অগ্নি প্রজ্বালন প্রভৃতি কার্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র প্রাণীর হিংসা করিতে বাধ্য হয়। এই সমস্ত অপরিহার্য হিংসাকর্ম আরম্ভিনী হিংসার অন্তর্ভুক্ত। চতুর্থ প্রকার হিংসার নাম 'উদ্যোগিনী'। ক্ষেত্রকর্ষণ, কূপ খনন, গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যাপার সুচিন্তিত-পূর্ব উদ্দেশ্য লইয়া অনুষ্ঠিত হয় এবং যে সকল কার্য প্রাণী হিংসা ব্যতীত সম্ভবপর হয় না, সেই সকল কার্য উদ্যোগিনী হিংসার অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় প্রকার হিংসা সম্বন্ধে জৈনগণের যে অভিমত, তাহা তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার হিংসা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সমাজ মধ্যে বাস করিতে হইলে অথবা গৃহস্থ জীবনে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার হিংসার পরিহার অসম্ভব বলিয়াই অনেক সময় মনে হইতে পারে, কিন্তু এই তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের হিংসা যে মূলতঃ হিংসা ইহা ভুলিলে চলিবে না। সংকল্পিনী হিংসার ন্যায়, উদ্যোগিনী, আরম্ভিনী ও বিরোধিনী হিংসা অতিগর্হিত নহে, মাত্র এইটুকু বলা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে জৈনগণের উপদেশ এই যে: দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের হিংসাও যতদূর সম্ভব পরিহর্তব্য এবং জীবন যাত্রার জন্য যেটুকুর প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত হিংসার প্রয়োগ কোনও মতে কর্তব্য নহে। তাঁহারা বলেন, সম্পূর্ণ ভাবে সর্ববিধ হিংসার—তথা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ হিংসারও অপ্রয়োগ একমাত্র গৃহত্যাগী যতিগণের পক্ষেই সম্ভব।

প্রমত্তযোগ বা কষায় সর্ববিধ হিংসার ভিত্তি স্থানীয় হওয়ায়, হিংসার ফল কোনও বাহ্য ব্যাপারে পরিণত বা প্রকাশিত হইল কিনা, তাহার বিচার অপ্রাসঙ্গিক। নীতির দিক দিয়া এই কথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে

এবং এই নীতির আলোকে নিম্নলিখিত কথাগুলি স্পষ্টই প্রতিভাত হয় :

(১) অনেক সময়ে কোনও ব্যক্তি কোনও প্রকাশ্য আঘাতের কার্য না করিলেও তাহাকে হিংসাকারী বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে ; পক্ষান্তরে কোনও ব্যক্তি প্রকাশ্য আঘাত করিয়াও অহিংসক থাকিয়া যায়।

(২) কোনও ব্যক্তি অল্পসংখ্যক আঘাত কার্য করিয়া বহু সংখ্যক অপ্রিয় ফলের সম্মুখীন হয়, পক্ষান্তরে সময়ে সময়ে বহু সংখ্যক আঘাত কার্য করিয়াও কোনও ব্যক্তি অতি অল্প সংখ্যক অপ্রীতিকর ফলের ভোক্তা হয়।

(৩) একই প্রকার আঘাত কার্য করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ফল ভোগের তীব্রতার তারতম্য হইতে পারে।

(৪) কোনও কোনও সময়ে ঘাত কার্য সম্পাদনের পুর্বেই হিংসা-কর্মের ফলভোগ করিতে হইতে পারে। কোনও সময়ে বা হিংসাকর্ম সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। কখনও বা বাহ্য আঘাত কর্ম সম্পাদিত না হইলেও হিংসার ফল ভোগ করিতে হইতে পারে।

(৫) সময়ে সময়ে কোনও একক ব্যক্তি হিংসা করিলেও একাধিক ব্যক্তিকে তাহার কুফল ভুগিতে হয়। আবার পক্ষান্তরে কখনও বা বহুব্যক্তি মিলিতভাবে কোন হিংসাকার্য করিলে তাহার ফল একক ব্যক্তিকে ভোগ করিতে হয়।

(৬) কখনও কখনও কোন ব্যক্তিকে হিংসা কার্যের ফলের সম্মুখীন হইতে হয় আবার কোথাও বা ঐ কার্য অপর ব্যক্তির নিকট সম্পূর্ণ অহিংসার সুফল আনিয়া দেয়।

(৭) আবার কোথাও অহিংস কর্ম কোনও ব্যক্তিকে হিংসার ফল প্রদান করে কোথাও বা অহিংস কর্ম কোনও ব্যক্তিকে অহিংসার ফলই প্রদান করে।

বলা বাহুল্য, কষায় বা চিত্তোদ্বেগ, হিংসা প্রবৃত্তি বা প্রমত্ত যোগই এই সমস্ত কর্মফল বিভিন্নতার সৃজন করে।

[ক্রমশঃ

ভগবান ঋষভদেব ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম

শ্রীফণীন্দ্র কুমার সান্যাল

ভারতীয় সভ্যতার ভাবগঙ্গার দুটী মূলধারা—বৈদিক ও অবৈদিক। এই অবৈদিক ধারার একটী প্রধান শাখা জৈন ধর্ম ও ভাবধারা। প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে এই জৈন ধর্ম ও ভাবধারা ভারতীয় জনমানসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং ভারতীয় সভ্যতার একটা প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। জৈন ধর্মের প্রবর্তক ঋষভদেবের ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশেষ স্বীকৃতিই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে জৈনধর্মের ব্যাপক প্রভাব।

আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে দেখতে পাই যে ভগবান লোক সৃষ্টির মানসে প্রথমতঃ বিরাট পুরুষ মূর্তি ধারণ করেছিলেন। ঐ বিরাট মূর্তি অন্যান্য যাবতীয় অবতারের অক্ষয় বীজ স্বরূপ ও সকল জীবের নিদান। এঁরই অংশ দ্বারা দেবতা, পশু, পক্ষী ও মনুষ্যাদি রূপ নানাবিধ জীবের সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষ শক্তি প্রকট করে যে যে রূপে সেই বিরাট পুরুষ পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন সেই সেই রূপই ভগবানের অবতার বলে মান্য হয়ে থাকে।

জৈন ধর্মের আদি প্রবর্তক ঋষভদেব শ্রীভগবানের অষ্টম অবতার বলে শ্রীমদ্‌ভাগবতে কীর্তিত হয়েছেন। বলা হয়েছে :

অষ্টমে মেরুদেব্যাং তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ।
দর্শয়ন্ বর্ত্ম ধীরাণাং সর্বাশ্রমনমস্কৃতম্ ॥১৩

অর্থাৎ, অষ্টম অবতারে নাভিপত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ভগবান বিষ্ণু পণ্ডিতগণকে সমস্ত আশ্রমের শ্রেষ্ঠ পরমহংস সেবিত পথ দেখাবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

এখানে স্পষ্টতঃ ঋষভদেবের নাম উল্লিখিত না থাকলেও তাঁর পিতামাতার যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাতে বুঝতে পারি যে তিনি ঋষভদেব। বৈষ্ণবকুল

চূড়ামণি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই শ্লোকের টীকায় বলেছেন, "নাভেরাগ্নীধ্রপুত্রা-দৃষভো", অর্থাৎ, আগ্নীধ্রের পুত্র নাভির ঋষভ নামে পুত্রের জন্ম হয়। এই ঋষভদেবের বিস্তারিত পরিচয় ও কীর্তি শ্রীমদ্‌ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে বিবৃত করা হয়েছে। এখানে ভগবান বিষ্ণু কেন ঋষভরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তা পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে; তা হচ্ছে সর্বধর্মের শ্রেষ্ঠ শ্রমণ ধর্ম পণ্ডিতগণকে উপদেশ দেওয়া। শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামী তাঁর টীকায় বলেছেন: "সর্বাশ্রমনমস্কৃতং অন্ত্যাশ্রমংপারমহংস্যং বর্ত্ম ধীরাণাম্ দর্শয়ন নাভেঃ আগ্নীধ্রপুত্রাৎ ঋষভোজাতঃ।"

অতএব আমরা দেখতে পাই শ্রমণ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ব্রাহ্মণ্যধর্ম কেবল স্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়নি। তার প্রবর্তককে ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতার বলে মান্য করেছেন।

অতঃপর আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে পাই যে নারদের অনুমতিক্রমে মনু তাঁর পুত্র প্রিয়ব্রতকে নিখিল ভুবনের স্থিতি ও পালনের জন্য রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই পরম ভাগবত প্রিয়ব্রতের পুত্র হলেন আগ্নীধ্র এবং তিনি পিতা কর্তৃক জম্বুদ্বীপের অধিপতি নিযুক্ত হন। আগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপকে নয়টি বর্ষে বিভাজিত করে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নাভিকে একটি বর্ষের রাজত্ব প্রদান করলেন। পিতার মৃত্যুর পর রাজা নাভি মরুর জ্যেষ্ঠা কন্যা মেরুদেবীকে বিবাহ করেন।

রাজা নাভি পত্নী মেরুদেবীর সঙ্গে একত্রে পুত্র কামনায় ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করেন। সেই আরাধনায় তুষ্ট হয়ে ভগবান স্বয়ং মহারাজ নাভির মধ্যে অবতীর্ণ হবেন প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন এবং তপস্বী, জ্ঞানী, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যব্রত দিগ্‌বসন সাধুগণের ধর্ম শিক্ষা দানের জন্য মেরুদেবীর গর্ভে শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা মূর্তি গ্রহণ করে অবতীর্ণ হলেন। বলা হয়েছে: তস্মিন্নেকং বিষ্ণুদত্ত ভগবান পরমর্ষিভিঃ প্রসাদিতো নাভেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া তদবরোধায়নে মেরুদেব্যাং ধর্মান্ দর্শয়িতুকামো বাতবসনানাম্ শ্রমণানামৃষিমূর্দ্ধমন্থিনাং শুক্লয়া তনুবাবতার।"

পরম ভাগবত শুকদেবের উল্লিখিত উক্তির দুটি শব্দ "বাতবসনানাম্" ও "শ্রমণানাম্" বিশেষ লক্ষণীয়। অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণু দিগবসনধারী শ্রমণদের ধর্ম

শিক্ষাদানের জন্যই ঋষভদেবরূপে অবতীর্ণ হলেন। এ থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে ঋষভদেব ও তাঁর ধর্মকে বিশেষ স্বীকৃতি ও সম্মানদানের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবত অনুসারে এঁরই জ্যেষ্ঠপুত্র মহাযোগী রাজা ভরত যাঁর নামানুসারে আমাদের এই বর্ষ ভারতবর্ষ নামে অভিহিত হয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয়, যদিও শ্রীমদ্‌ভাগবতে ঋষভদেব ও তাঁর আচরণ সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়েছে তবুও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংরক্ষকগণের মধ্যে তাঁর ধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে একটা বিরাট বিভ্রান্তি ও তাঁদের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড বিরোধের পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে বলা হয়েছে: "ভগবানৃষভসংজ্ঞ আত্মতন্ত্রঃ স্বয়ং নিত্যনিবৃত্তানর্থ পরম্পরঃ কেবল আনন্দানুভব ঈশ্বর এব" (ভগবান ঋষভদেব আপনি আপনার প্রভু। তিনি অনর্থরাশি থেকে নিবৃত্ত ও বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ ঈশ্বর); তাঁর অপূর্ব উপদেশাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে—"নানাযোগচর্যাচরণো ভাগবান কৈবল্যপতি ঋষভোঽবিরত পরমমহানন্দানুভব আত্মনি সর্বেষাং ভূতানামাত্মভূতে ভগবতি বাসুদেব আত্মনোঽব্যবধানানন্তোরোদরভাবেন সিদ্ধ সমস্তার্থ-পরিপূর্ণ যোগৈ-শ্বর্যানি বৈহায় সমনোজবাউর্দ্ধান পরকায়প্রবেশ দূর শ্রবণাদীনি যদৃচ্ছয়োপ-গতানি নাঞ্জাসোনৃপ হৃদয়েনাভ্যনন্দৎ" (তিনি নানা যোগচর্যাচরণ করলেন। তিনি স্বয়ং ভগবান কৈবল্যপতি এবং পরমহৎ; মহানন্দানুভব স্বরূপ ভূতাত্মা ভগবান বাসুদেবের সহিত অভেদপ্রযুক্ত নিত্যনিবৃত্তোপাধি ও স্বতঃসিদ্ধ সমস্ত ফলে পরিপূর্ণ ছিলেন। যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত মনোজবত্ব, অন্তর্দ্ধান, পরকায় প্রবেশ এবং দূরদর্শন প্রভৃতি স্বয়ং আগত যোগৈশ্বর্য সকল কিছুই তাঁর আন্তরিক আনন্দ-দায়ক ছিল না); অপরদিকে তাঁর প্রচারিত ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ঘোরতর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়েছে। সর্বরকমে তাঁদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করবার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে কলি যুগে অধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পেলে ঋষভদেবের বর্ণাশ্রমাতীত আচরণের কথা শুনতে পেয়ে কোঙ্ক, বেঙ্কট, কুটক দেশের অর্হৎ নামধেয় রাজা অধর্মে বিমোহিত হয়ে স্বয়ং ঐ ধর্ম শিক্ষা করবেন এবং নির্ভয়ে আপন ধর্ম পরিত্যাগ করে লোক সমাজে নিজ বিচারানুসারে একটা বেদবিরোধী পাষণ্ডরূপ কুপথ সংপ্রবর্তিত করবেন। এই কুপথ প্রবর্তনের ফলে কলিযুগে কুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা দেবমায়ায়

বিমোহিত হয়ে নিজের শৌচাচার পরিত্যাগ করে দেবতাদের অবজ্ঞা করবে ও অস্নান, অনাচমন, অশৌচ এবং কেশোৎপাটন প্রভৃতি অপব্রত স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করবে ; আর বেদ, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞপুরুষ ও ঐ সব বিশ্বাসী লোকেদের নিন্দা করবে। সেই কুপথগামী লোকেরা অন্ধ পরম্পরাক্রমে সেই অবেদমূলক স্বেচ্ছাচাররূপ মতবাদের ওপর বিশ্বাস করে আপনা থেকেই ঘোর নরকে নিপতিত হবে। স্পষ্টই দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংরক্ষকগণ জৈনধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাঁদের ঘোরতর বিরুদ্ধতা তীব্র ভাষায় প্রকাশ ও প্রচারিত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ব্রহ্মণ্যধর্মে জৈনধর্মের প্রবর্তকের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন কিন্তু তৎসহ তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম যা তাঁর উদার নীতি ও হৃদয়ের জন্য জন মানসকে বিমোহিত করেছিল তাকে বিশেষ ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করবার অপচেষ্টা ধর্মভাবনার জগতে এক বিস্ময়কর ঘটনা।

শ্রমণ সম্পর্কে কয়েকটী অভিমত

...have interested and moved me very much.

—Prof. Ajit Krishna Basu
Dept. of English, Ashutosh College, Calcutta

বাঙলা ভাষায় জৈনধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক এই প্রথম প্রচেষ্টার জন্যে আপনারা সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতা দাবী করতে পারেন। ··জৈন ধর্মের এই দীর্ঘ দিনের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা সত্যিই অন্ধ হয়ে আছি।

—শ্রীকালিদাস রায়
রসচক্র সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা

সুন্দর ও সুমুদ্রিত পত্রিকা 'শ্রমণ' দেখে মনে হল যে ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস করার ক্ষমতা আপনাদের করায়ত্ত।

—অধ্যাপক সন্তোষকুমার বসু
মিউজিয়লজি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

I much enjoyed reading it.

—Lady Ranu Mookerjee
President, Academy of fine Arts, Calcutta

It is very much educative.

—Secretary, B. C. Roy Reading Room, Calcutta

পত্রিকাটি দেখলাম অতি সমৃদ্ধ, নানা মূল্যবান তথ্যে ও তত্ত্বে পূর্ণ।

—সম্পাদক, রামনগর গ্রন্থাগার, ২৪ পরগনা

পত্রিকাটি সামগ্রিক ভাবে বিশেষ করে এর প্রবন্ধাংশ আমাদের পাঠক-পাঠিকাবর্গের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছে।

—সম্পাদক, বসন্ত স্মৃতি পাঠাগার, চাকদহ, নদীয়া

বাঙলা ভাষায় প্রথম এবং একমাত্র জৈন পত্রিকা 'শ্রমণ' গুণে, অঙ্গসজ্জায় এবং তথ্যে উৎকৃষ্ট হয়ে উঠছে।

—নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়, সাঁইথিয়া

'শ্রমণ' মাসিককে দর্শন দ্বারা হার্দিক আনন্দ হুয়া। মাসিক পত্রকী বেংগলী ভাষাসে বিহার বংগাল মে পুনঃ জৈন সংস্কৃতিকা উত্থান শীঘ্র হোনে কী আশা হৈ।

—মুনি প্রভাকর বিজয়, মধুবন

I have received the 11th Number of your journel *Sramana*. This contains some very important articles especially the one on the antiquity of the Svetambaras and Digambaras.

—P. Banerjee
Assistant Director, National Museum, New Delhi

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :

গণেশ লালওয়ানী
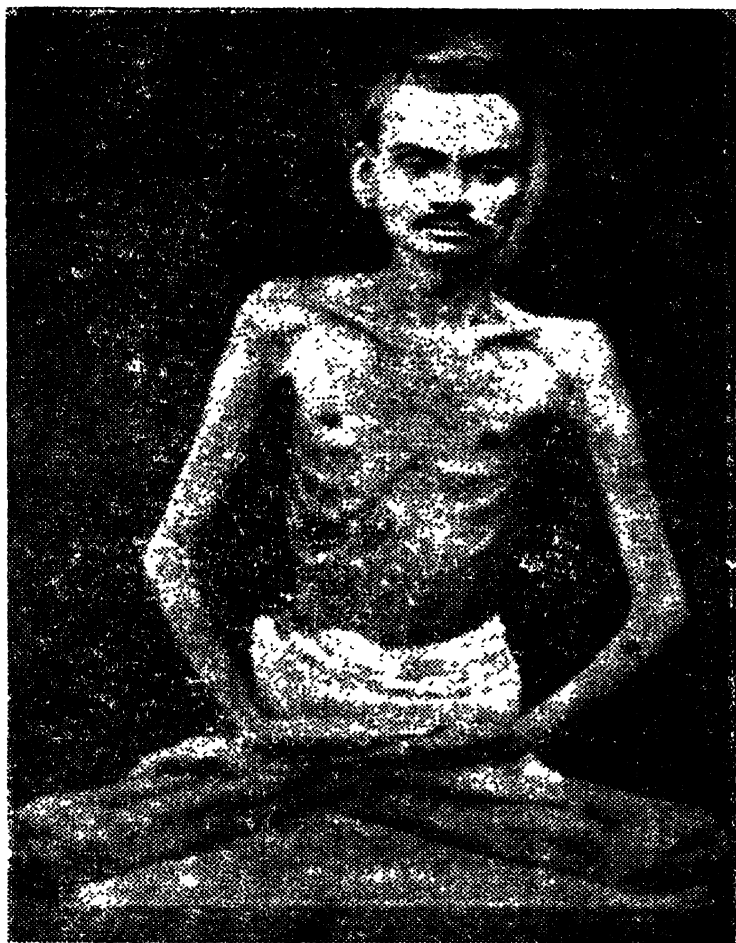
রায়চাঁদ ভাই

রায়চাঁদ ভাই

যাঁরা নিজের জীবন ও চিন্তাধারা দিয়ে সমসাময়িক কাল বা পরবর্তী কালকে প্রভাবিত করে যান তাঁরা নিশ্চয়ই বড় ; কিন্তু তাঁরাও বড় যাঁরা অন্য একটী মহৎ জীবন তৈরী করে দিয়ে যান। রাজচন্দ্র ছিলেন দ্বিতীয় ভাবে বড়। কিন্তু তাই বা কেন ? রাজচন্দ্র দুই ভাবেই বড় ছিলেন। তিনি তাঁর নিজের জীবন ও চিন্তাধারা দিয়ে নিজের সমসাময়িক যুগকে প্রভাবিত করেছেন ও তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি মহৎ জীবন ও তার চিন্তাধারাকেও। আমরা মহাত্মা গান্ধীর কথা বলছি। যে তিন জন লোক তাঁকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে বলে গান্ধীজী বলেছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁর কথা লোকে খুব কম জানে অথচ তাঁর জীবন নির্মাণে যাঁর অবদান সব চাইতে বেশী তিনি হলেন আমাদের রাজচন্দ্র বা রায়চাঁদ ভাই। রায়চাঁদ ভাই ছিলেন গান্ধীজীর আদর্শ পুরুষ। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অহিংসাত্মক যে আধ্যাত্মিক ভূমিকা তা মুখ্যতঃ রায়চাঁদ ভাইর, যা গান্ধী যুগে গান্ধীজীর মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে এবং যা আজো আমাদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

রাজচন্দ্র ১৮৬৮ খৃঃ সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত ভাভানিয়ার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রবিজী ভাই ছিলেন ধর্ম প্রাণ বৈষ্ণব কিন্তু মা দেবাবাঈ ছিলেন জৈন ধর্মের উপাসিকা। রাজচন্দ্র এই অদ্ভুত বৈষ্ণব-জৈন পরিবারে প্রতিপালিত হন।

যাঁরা আজন্ম জ্ঞানী রাজচন্দ্র ছিলেন তাঁদেরই একজন। তাই খুব অল্প বয়সেই তিনি জানতে পেরেছিলেন তিনি কে, কেনই বা এখানে এসেছেন। যদিও পিতার পুত্র রূপে তাঁর জীবনের প্রারম্ভ কিন্তু তার পরিসমাপ্তি ঘটে মায়ের সন্তান রূপে। কারণ শৈশবে তাঁর পিতামহ তাঁকে রামদাস নামক এক বৈষ্ণব সাধুর কাছে নিয়ে যান। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর গলায় কণ্ঠি দিয়ে তাঁকে বৈষ্ণব করে নেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা বোধহয় অন্যরূপ ছিল। কিছুদিন যেতে না যেতে মার ধর্মই তাঁকে আকর্ষণ করে। অল্পদিন মধ্যেই

তাই অসাধারণ মেধা-সম্পন্ন শতাবধানী বলে তিনি পরিচিত হন ও মুক্তিপথের শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছেন সেরূপ উন্নত ধরণের আত্মা বলেও স্বীকৃত হন।

কিন্তু রাজচন্দ্র কোন সময়েই গৃহত্যাগ করেন নি বা কোন ধর্ম সম্প্রদায়েও যোগদান করেন নি। সেদিক হতে ঘোরতর সংসারী ছিলেন তিনি। বিবাহাদিও করেছেন। সন্তানাদিও হয়েছে। জীবিকার জন্ম জুয়েলারী দোকানে অংশীদাররূপে কাজও করতেন। অবশ্য জুয়েলারীর কাজ করলেও কখনো কাউকে তিনি ঠকান নি, কারুর কাছে প্রাপ্যের অতিরিক্ত লাভ করেন নি। তাঁর সাংসারিক জীবন সম্পর্কে এইটুকুই আমরা জানি। আর জানি গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর পরবর্তী যোগাযোগের কথা। গান্ধীজীর মনে কোন প্রশ্ন জাগলে তিনি সরাসরি রায়চাঁদ ভাইকে তাঁর প্রশ্নের কথা জানাতেন। রায়চাঁদ ভাই তার সমাধান দিতেন।

রাজচন্দ্রের বয়স যখন সাত তখন তাঁর জীবনে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে যা তাঁর জীবনকে আমূল পরিবর্তিত করে দেয়। সে ঘটনা সর্প দংশনে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু অমীচাঁদের মৃত্যু। মৃতদেহকে যখন শ্মশান ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন রাজচন্দ্র তার অনুগমন করেন। শ্মশানে চিতা প্রজ্বলিত হয়েছে এবং সেই চিতায় অমীচাঁদের দেহ যখন দগ্ধ হচ্ছে রাজচন্দ্র তখন এক গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সেই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখছেন। সেই দৃশ্য তাঁর বালক মনকে নিশ্চয়ই গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। কারণ তা দেখতে দেখতে সহসা তাঁর বিস্মৃতির আবরণ উঠে যায়। তিনি পূর্ব জন্ম দেখতে পান।

রাজচন্দ্র বিদ্যালয়ে বিশেষ কোনো শিক্ষালাভ করেন নি এবং বোধহয় তার কোনো প্রয়োজনও ছিল না। কারণ জ্ঞান ছিল তাঁর সহজাত। তিনি তাঁর সেই সহজাত জ্ঞানকেই এখন অতি সহজে কাজে লাগাতে সমর্থ হলেন। তিনি যে মাত্র আট বছর বয়সে গুজরাতী ভাষায় ছন্দবদ্ধভাবে রামায়ণ, মহাভারতের রচনা করলেন এছাড়া এর আর কোনো ব্যাখ্যাই হয় না।

অতি অল্প বয়সেই আবার রাজচন্দ্রকে ব্যবসায়ে যোগ দিতে হয়। তাই পড়বার ও লেখবার সময়ও তাঁর খুব কম ছিল। তাই দেখি তিনি যখন

জুয়েলারীর দোকানে বসে কাজ করতেন তখন তাঁর কাছে কিছু কাগজ কেটে রাখতেন। তাঁর মনে কোন ভাব এলে তিনি তখনই তা নোট করে নিতেন। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থই এইভাবে রচিত হয়েছে। যখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল বছর তখন তিনি তাঁর এভাবে লেখার একটী ছোট সংগ্রহ 'পুষ্পমালা' নামে বার করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যে 'বালাববোধ মোক্ষমালা' প্রকাশিত হয় এবং আঠারো বছর বয়সে 'ভাবনাবোধ'। আটাশ বছর বয়সে 'পরমপদপ্রাপ্তির ভাবনা' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটী অনুপম ছন্দময় দীর্ঘ কাব্য। সময়ে সময়ে প্রদত্ত তাঁর প্রবচন 'উপদেশ ছায়া', 'ব্যাখ্যানসার' ও 'প্রশ্ন সমাধান' গ্রন্থে সংগৃহীত। তাঁর 'পঞ্চাস্তিকায় সময়সার' আচার্য কুন্দ কুন্দ রচিত 'পঞ্চাস্তিকায়ে'র মর্মানুবাদ। কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণ বিকাশ ধরা পড়ে তাঁর 'আত্মসিদ্ধি'তে। গ্রন্থটাকে সংক্ষেপে সমস্ত দর্শনের সার বলা চলে। একথা বলা বাহুল্য যে এ সমস্ত গ্রন্থের ভাবধারা সম্পূর্ণতঃ জৈন। বৈষ্ণব ধর্মের আচার অনুষ্ঠান তাঁকে বেশী দিন ধরে রাখতে পারে নি। জৈন ধর্মের অহিংসা বা জীবদয়ার মধ্যে দিয়ে মোক্ষ সাধনার যেপথ, সেই পথই তাঁকে শেষ পর্যন্ত আকৃষ্ট করে। তাই তিনি লিখলেন :

কেউ রইল জড় ক্রিয়াবাদ নিয়ে,
কেউ বা শুষ্ক জ্ঞান,
যে পথে করুণার উদ্গম,
সেই পথই আমার মোক্ষপথ।

* * *

"আত্মা আছে যা নিত্য, নিজকর্মের কর্তা ও ভোক্তা।
মোক্ষও আছে এবং তার উপায় স্বধর্ম বা সত্য ধর্ম॥"

আত্মসিদ্ধির ওই পদটীতে রাজচন্দ্রের দর্শনের সার রয়েছে সেকথা বোধ হয় বলা যায়।

এর বিশ্লেষণ করলে যা দাঁড়ায় তা এই :

(১) আত্মা আছে ;

(২) আত্মা নিত্য ;

(৩) আত্মা নিজ কর্মের কর্তা। শুদ্ধ অবস্থায় আত্মা জ্ঞান, দর্শন ও আনন্দময়। কিন্তু অজ্ঞানদশায় রাগ-দ্বেষের বশীভূত হয়ে আত্মা কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এভাবে আত্মা নিজকর্মের কর্তা ;

(৪) আত্মা ভোক্তাও। আত্মা কর্তা তাই কর্মের ভালোমন্দ ফল তারই ভোগ করবার। বিষয়ের সংস্পর্শে আত্মায় রাগ-দ্বেষের সঞ্চার হয় যার পরিণামরূপ সুখ-দুঃখাদির অনুভব ;

(৫) মোক্ষও আছে। এইটী মুক্ত অবস্থা। কর্মমুক্ত অবস্থাই আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা। কেউ যদি নূতন কর্মের আগমন ও পুরনো কর্মের অবসান ঘটাতে পারেন তবে তিনি সেই অবস্থা লাভ করতে পারেন ;

(৬) মোক্ষের উপায় সুধর্ম বা সত্যধর্ম—যে ধর্ম মোক্ষে নিয়ে যেতে সমর্থ তাই সত্য ধর্ম।

জৈনরা যে সাতটী তত্ত্বের কথা বলেন তা এই। সেই সাতটী তত্ত্ব : জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষ। তীর্থংকর প্রবর্তিত ধর্ম কেন তাঁকে আকর্ষণ করেছিল এ হতেই তা সুস্পষ্ট।

এই তত্ত্বগুলি আছে। এই তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই, তবে কেউ হয়ত তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস নাও করতে পারেন। সেই সন্দেহের অবসান ঘটানো প্রয়োজন। তাই রাজচন্দ্র তাঁর আত্মসিদ্ধিতে সম্ভাব্য সন্দেহ উপস্থিত করেছেন ও তার সহজ সমাধান দিয়েছেন।

কেউ কেউ আত্মার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন যেহেতু আত্মাকে দেখা যায় না তাই আত্মা নেই। বা এই শরীরই আত্মা। আত্মার পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই। কেউ কেউ আবার বলেন ইন্দ্রিয়ই আত্মা। রাজচন্দ্র বলেন, যে দেখে, জানে ও অনুভব করে সেই আত্মা। চোখ তখনো থাকে কিন্তু মৃত ব্যক্তির চোখ কিছু দেখে না। তাই ইন্দ্রিয় আত্মা হতে পারে না। শরীরও না। তরবারি যখন খাপে থাকে তখন তাকে এক মনে হয়। সেইরকম শরীরে যখন আত্মা থাকে তখন তাকে এক মনে হয়। কিন্তু সে

দুটো সম্পূর্ণ পৃথক। আত্মা যখন চেতন সত্তা শরীর তখন ভূতাত্মক। তাই শরীর তাকে জানতে পারে না, না ইন্দ্রিয়। আত্মাকে আত্মা দিয়েই জানতে হয়। রাজচন্দ্র বলেন, সন্দেহের দ্বারাই যে সন্দেহ করছে সে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

দ্বিতীয় সন্দেহ আত্মার নিত্যতা সম্পর্কে। আমরা সব কিছু নাশবান দেখি। তাই আত্মাকেও নাশবান বলে মনে হতে পারে। কিন্তু রাজচন্দ্র বলেন সেই সন্দেহের কোন কারণ নেই, কারণ আত্মা অন্যান্য বস্তুর মতো ভূত সমবায়ে রচিত নয়। যা ভূত সমবায়ে রচিত তা উৎপাদ, পরিবর্তন ও ব্যয়ের অধীন, কিন্তু আত্মা নয়। কেউ কী আত্মাকে উৎপন্ন হতে দেখেছে? ভূত হতেও এর উদ্ভব হয়নি। তাই তা মৌলিক, পরিবর্তন ও নাশহীন; নিত্য।

কেউ কেউ বলেন আত্মা কোনো সময়েই বদ্ধ নয়, সর্বদাই মুক্ত। আত্মা অকর্তা ও সৎ হবার জন্য কর্মের দ্বারা কোনো সময়েই বদ্ধ নয়। আত্মাকে যে বদ্ধ বলে মনে হয় তা মায়ার জন্য। তাই মুক্তির জন্য প্রযত্নের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু রাজচন্দ্র বলেন, তা ঠিক নয়। শুদ্ধ অবস্থায় আত্মা মুক্ত হলেও অজ্ঞানদশায় তা নয়। আমরা জীবকে বদ্ধ দেখি। যদি তা তার কর্ম জন্য না হয় তবে ভগবানকে কারণ স্বরূপ দেখাতে হয়। সেক্ষেত্রে ভগবান হয়ে পড়েন পক্ষপাতদুষ্ট। সত্যকার ভগবান ত কাউকে বদ্ধ করতে পারেন না বা মুক্ত করতে। বাস্তবে শুদ্ধ আত্মাই ত ভগবান। তাই আত্মাকেই বলতে হয় তার কর্মের কর্তা যার জন্য সে বদ্ধ। আত্মাই আবার ভগবান হতে পারে, কারণ তাই তার স্বরূপ। সেজন্য মুক্তির জন্য প্রয়াস অসার্থক নয়।

আত্মা যে নিজকর্মের ফল ভোক্তা সেকথা অনেকে স্বীকার করতে চান না। রাজচন্দ্র তাঁদের প্রশ্ন করছেন তবে ফলভোগ করে কে? যা জড় তার কোনো বন্ধন নেই, তা উপভোগও করে না। তাই আত্মাই যে তার কৃত কর্মের ফলভোগ করে সেইটাই স্বাভাবিক। কেউ ধনী হয়ে জন্ম গ্রহণ করে, কেউ দরিদ্র, কেউ সুন্দর হয়ে জন্ম গ্রহণ করে কেউ বা বিকলাঙ্গ এবং এর জন্য তাদের কর্মকেই দায়ী করতে হয়। যদি কেউ বলেন, যে ভগবান কাউকে বিকলাঙ্গ করে সৃষ্টি করেছেন তবে বলতে হয় যে তিনি স্বেচ্ছাচারী ও উদ্ভট

প্রকৃতির। যে ভগবান নিয়ম শৃঙ্খলাকে ভগ্ন করেন তিনি ভগবানই নন। সে ত অরাজক অবস্থা। তাই আত্মা তার কর্মের ফল অবশ্য ভোগ করে।

কারু কারু মোক্ষ সম্বন্ধেই সন্দেহ। আত্মা যদি অনাদিকাল হতে কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে, কারণ প্রথম সংযোগের কারণ আমাদের জানা নেই, তবে তার কোন কালেই অন্ত হবে না। কিন্তু রাজচন্দ্র তা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, কেউ যদি সৎকর্মের জন্য স্বর্গে যায় ও মন্দ কর্মের জন্য নরকে তবে একথা বলা যায় যে, যে ভালোমন্দ সমস্ত রকম কর্মের অবসান ঘটায় সে সেই সাম্যাবস্থা লাভ করবে যার নামই মোক্ষ।

শেষ, সুধর্ম বা সত্য ধর্ম বিষয়েই সন্দেহ। এমন কোনো পথ নেই যা সন্দেহের অতীত। তাই কোন পথ সে অনুসরণ করবে? রাজচন্দ্র যে প্রত্যুত্তর দিলেন তা তুলনাহীন। তিনি কোনো ধর্মের উল্লেখ করেন নি। শুধু বললেন :

যা যা বন্ধের কারণ, মুক্তিরও সেই সেই উপায়। তাদের ধ্বংস কর। সেইটী মুক্তির পথ, সেই পথেই জাগতিক বন্ধনের অবসান।

রাগ, দ্বেষ ও অবিদ্যা এই তিনটী বন্ধনদশার কারণ। তাদের ছিন্ন কর। সেইটী মুক্তির পথ।

আত্মা নিত্য, শুদ্ধ, চৈতন্যময় ও সর্বভোগ-রহিত। তাকে অনুভব করো। সেইটী মুক্তির পথ।

অন্যত্র তিনি লিখেছেন :

আত্মভ্রান্তির মতো কোন রোগ নেই, সদ্‌গুরুর মতো বৈদ্যরাজ, তাঁর উপদেশের মতো ঔষধ।

পরিশেষে একথা কি আর বলতে হবে যে রাজচন্দ্র সত্যই দেহাতীত বা মুক্ত ছিলেন। তাঁর দেহ ছিল খাঁচা মাত্র। সেই দেহাতীতকে তাঁর কথা দিয়েই আমাদের প্রণতি জানাই :

দেহের মধ্যে বাস করেও যিনি দেহাতীত সেই দেহাতীতকে লক্ষ লক্ষ বার আমি প্রণাম করি।

রায়চাঁদ ভাই সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী

…কিন্তু যাঁহার কথা বলিতে চাহিতেছি, তিনি হইতেছেন কবি রায়চাঁদ বা রাজচন্দ্র। ডাক্তারের বড় ভাইয়ের ইনি জামাতা ছিলেন ও রেবাশঙ্কর জগজীবনের কারবারের অংশীদার ও হর্তাকর্তা ছিলেন। সে সময় তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসরের বেশী নয়। তাহা হইলেও তিনি যে চরিত্রবান ও জ্ঞানী ছিলেন তাহা প্রথম সাক্ষাতেই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহাকে শতাবধানী বলা হইত। শতাবধান শক্তি ডাঃ মেহতা আমাকে যাচাই করিয়া দেখিতে বলিলেন। আমি আমার বিদেশী ভাষাজ্ঞানের ভাণ্ডার খালি করিয়া নানা শব্দ বলিয়া গেলাম। প্রথম হইতে শব্দগুলি যে অনুক্রমে আমি বলিয়া গিয়াছি ঠিক সেই অনুক্রমেই তিনি তাহাদের পুনরাবৃত্তি করিলেন। এই শক্তি দেখিয়া আমার হিংসা হইয়াছিল, কিন্তু উহাতে আমি মুগ্ধ হই নাই। তাঁহার যেগুণ আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল তাহার পরিচয় পরে পাইয়াছিলাম। তাহা হইতেছে তাঁহার বহুবিস্তৃত শাস্ত্রজ্ঞান, তাঁহার শুদ্ধ চরিত্র ও তাঁহার আত্মদর্শন করার তীব্র ইচ্ছা। আমি পরে দেখিয়াছিলাম যে তিনি আত্ম-দর্শনের জন্যই জীবন ধারণ করিতেছেন:

"হাসিতে খেলিতে প্রকট করি দেখিরে
আমার জীবন সফল তবে লেখিরে ;
মুক্তানন্দনাথ বিহারীরে—
রাখে জীবন ডোর আমারি রে।"

মুক্তানন্দের এই বচন তাঁহার মুখে ত ছিলই, তাঁহার হৃদয় মধ্যেও অঙ্কিত ছিল।

নিজে হাজার হাজার টাকার ব্যবসা করিতেন, হীরা মতি পরখ করিতেন, ব্যবসায়ের জটিল প্রশ্নের সমাধান করিতেন। কিন্তু ইহা তাঁহার নিজস্ব বিষয় ছিল না, তাঁহার নিজের বিষয় ছিল তাঁহার পুরুষার্থ, তাঁহার আত্মদর্শন বা হরিদর্শন। তাঁহার টেবিলের উপর আর কোনও দ্রব্য থাকুক আর নাই থাকুক, কোন না কোন ধর্মপুস্তক অথবা তাঁহার ডায়েরী থাকিবেই। যখন ব্যবসার কথা শেষ হয় তখনই ধর্মপুস্তক খোলেন, অথবা সেই লেখার খাতা খোলেন। তাঁহার লেখার যে সংগ্রহ প্রকাশ হইয়াছে তাহার অধিকাংশই এই নোট বহি

হইতে লওয়া। যে ব্যক্তি লক্ষ টাকার কেনাবেচার কথা বলিয়া তখনই আত্মজ্ঞানের গূঢ় বাক্য লিখিতে বসিয়া যায়, সে ব্যক্তি ব্যবসাদারের জাতের নহে, সে ব্যক্তি শুদ্ধ জ্ঞানীর জাতের। তাঁহার এই প্রকার জাতের অনুভব আমার একবার নহে অনেকবার হইয়াছে, আমি কখনও তাঁহাকে শান্তি হইতে বিচ্যুত অবস্থায় দেখি নাই। আমার সহিত তাঁহার কোনও স্বার্থের সম্বন্ধ ছিল না, তবুও আমি তাঁহার সহিত অতিশয় ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলাম। তখন আমি ভিখারী ব্যারিস্টার। কিন্তু যখনই আমি তাঁহার দোকানে গিয়াছি তখনই আমার সহিত ধর্ম কথা ভিন্ন অন্য কথাই বলিতেন না। তখনও আমার চোখ খোলে নাই এবং সাধারণতঃ ধর্মকথায় যে আনন্দ হইত এমনও বলা যায় না, তথাপি রায় চন্দ ভাইয়ের ধর্ম কথায় আনন্দ পাইতাম। অনেক ধর্মাচার্যের সংসর্গে আমি তাহার পর আসিয়াছি। প্রত্যেক ধর্মের আচার্যদের সহিত মিশিতে প্রযত্ন করিয়াছি কিন্তু রায়চন্দ ভাই আমার উপর যে ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন, আর কেহ তেমন ছাপ রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার বাক্য আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিত।

—'আত্মকথা বা সত্যের প্রয়োগ' হতে ; শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত কৃত অনুবাদ। পৃঃ ১৪৮-৫০।

বর্দ্ধমান-মহাবীর

[জীবন-চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

নালন্দা সেদিন ইতিহাসের সেই বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতি অর্জন করেনি। সেদিন তা ছিল মগধের রাজধানী রাজগৃহের শাখাপুর মাত্র। আজকের পরিভাষায় উপনগর। তবু নালন্দার আর এক ধরণের খ্যাতি ছিল। সূত্র কৃতাংগে লেখা রয়েছে অর্থীদের যা যথেপ্সিত দান করে তাই নালন্দা।

তাই নালন্দায় বর্ষাবাস করবার জন্য অন্য তীর্থিক সাধু ও সন্ন্যাসীরাও এসে থাকেন।

সেই তন্তুবায়শালায় এসে আছেন আর একজন নবীন শ্রমণ। নাম গোশালক। মংখলীপুত্র বলেও তিনি আবার পরিচিত।

মংখলীর পুত্র ছিলেন বলেই তাঁর নাম মংখলীপুত্র। আর গোশালক নামের কারণ তিনি গোশালে জন্ম গ্রহণ করেন।

মংখলী সম্ভবতঃ মংখ ছিলেন। চিত্র প্রদর্শন তাঁর জীবিকা ছিল। তাই জীবিকার জন্য তাঁকে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করতে হত।

এমনি পরিভ্রমণ করতে করতে তিনি একবার এসে উঠেছিলেন শরবন সন্নিবেশের এক ব্রাহ্মণের গোশালে। সেইখানে তাঁর স্ত্রী ভদ্রা গোশালকের জন্ম দেন।

গোশালক শৈশবে একটু উদ্ধত প্রকৃতির ছিলেন। তারপর যখন একটু বড় হলেন তখন পিতামাতাকে পরিত্যাগ করে স্বতন্ত্র ভাবে চিত্র প্রদর্শন করে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন। শেষে সাধু সন্ন্যাসীদের সর্বত্র সমাদর দেখে শ্রমণ হয়ে ইতস্ততঃ প্রব্রজন করতে লাগলেন।

এমনি প্রব্রজন করতে করতেই তিনি এবার এসেছেন নালন্দায়।

গোশালক প্রথম হতেই বর্দ্ধমানের দিকে আকৃষ্ট হলেন। যদিও বর্দ্ধমানের

এখন সেই কান্তি নেই, উপবাস ও তপশ্চর্যায় তাঁর শরীর কৃশ হয়েছে তবু তাঁর চারপাশে রয়েছে জ্যোতির এক পরিমণ্ডল। তাই প্রথম দর্শনেই চিত্ত শ্রদ্ধায় কেমন যেন নত হয়ে আসে।

তার ওপর গোশালক আরো দেখলেন তাঁর কৃচ্ছ্র সাধনা। দেখলেন বর্দ্ধমান বর্ষাবাসের প্রথম মাসে কোনো আহার্যই গ্রহণ করলেন না। রাত্রে ধ্যানে প্রায় বিনিদ্র রজনী যাপন করলেন। দংশমশক, শীতাতপের নির্যাতন সমভাবে সহ্য করলেন। দেখে গোশালক মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হল তিনি যেন এতদিন এমনি একজন আচার্যের সন্ধানে ছিলেন। তাই যেদিন মাসান্তের উপবাসের পর বর্দ্ধমান আহার্য ভিক্ষা নিয়ে ফিরে এলেন সেদিন গোশালক তাঁর নিকটে গিয়ে তাঁকে তিনবার প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে বললেন, দেবার্য, আজ হতে আমি আপনার শিষ্য।

বর্দ্ধমানের সেদিন মৌন ছিল। তাই তিনি তার কোনো প্রত্যুত্তর দিলেন না। আর গোশালক সেই মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নিয়ে তাঁর পরিচর্যায় নিরত হলেন।

গোশালক একটু উদ্ধত হলেও ছিলেন সরল প্রকৃতির। তাঁর মধ্যে বালক সুলভ চপলতা ছিল ও অকারণ কৌতূহল। তা ছাড়া তিনি নিয়তিবাদী ছিলেন—অর্থাৎ যা ঘটেছে তা নিয়তির জন্যই। নিয়তিতে যা লেখা রয়েছে তা না হয়ে যায় না। পুরুষাকার কথার কথা মাত্র। মানুষ যা ঘটবার তা রোধ করতে পারে না।

কর্ম ফলে বিশ্বাস এক, নিয়তিবাদ আর। মানুষ যেমন কর্ম করে তার ফল ভোগ তাকে করতে হয়, ইহ জীবনে নয়ত পর জীবনে। কিন্তু কি ধরণের কর্ম সে করবে তা তার ইচ্ছাধীন। সেই পুরুষাকার। যা হবার হবে বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা নয়, প্রতি নিয়ত নিজেকে সৎপথে নেবার জন্য চারিত্রের নির্মাণ। পুরুষাকারকে যদি স্বীকার না করি তবে কোন সাধনাই হয় না। বর্দ্ধমান কর্ম ফলে বিশ্বাস করেন কিন্তু তার চাইতেও বেশী বিশ্বাস করেন পুরুষাকারে। বলেন বারবার প্রয়াস করো। কারণ প্রয়াসের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থার মধ্যে দিয়ে না গিয়ে কে কবে আত্ম-জ্ঞান লাভ করেছে। সুপ্ত সিংহের মুখে কি হরিণ আপনা হতেই এসে প্রবেশ করে?

কিন্তু বর্দ্ধমানের সম্পর্কে এসে কোথায় গোশালকের নিয়তিবাদ নষ্ট হয়ে যাবে, তা না হয়ে সেই নিয়তিবাদই যেন আরো একটু দৃঢ় হল।

কার্তিক মাসের পূর্ণিমা। গোশালক ভিক্ষাচর্যায় চলেছেন। যাবার সময় বর্দ্ধমানকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবন্, আজ ভিক্ষাচর্যায় আমি কি পাব ?

বর্দ্ধমান বললেন, কদ্রব চালের বাসি ভাত, টক ঘোল ও অচল মুদ্রা। কদ্রব এক ধরণের নিকৃষ্ট চাল।

গোশালকের সেকথা বিশ্বাস হল না। তা ছাড়া তাঁর মনের ইচ্ছা বর্দ্ধমানকে একটু যাচাই করা। সেই সঙ্গে নিয়তিবাদকেও। নিয়তিতে যদি তাই থাকে তবে তাই তিনি পাবেন। বর্দ্ধমানের কথাও সত্য হবে। কিন্তু এর অন্যথা করবার চেষ্টাই তিনি করবেন। তাই ভেবে ভেবে সেদিন তিনি ভিক্ষায় ধনী শ্রেষ্ঠী পাড়ার দিকে গেলেন।

ধনী শ্রেষ্ঠী পাড়ায় সেদিন গোশালক ভিক্ষা পেলেন না।

গোশালক ভাবলেন, এও মন্দের ভালো। তিনি যে ভিক্ষা পেলেন না এতে বর্দ্ধমানের কথা মিথ্যা হবে, নিয়তিবাদও। তাই ভিক্ষা না নিয়েই তিনি তন্তুবায়শালায় ফিরবেন স্থির করলেন।

তাই ফিরছিলেনও। কিন্তু মাঝ পথ হতে তাঁকে ধরে নিয়ে গেল এক কুমোর। তারপর শ্রদ্ধা ভরে ভিক্ষা দিল বাসি কদ্রব চালের ভাত, টক ঘোল ও অচল মুদ্রা।

মুদ্রা অবশ্য সে অচল ভেবে দেয় নি কিন্তু কার্যতঃ তা অচল বলেই প্রমাণিত হল।

গোশালকের এতে যেমন বর্দ্ধমানের ওপর বিশ্বাস আরো দৃঢ় হল—তেমনি নিয়তিবাদের ওপরও। নিয়তিতে যা লেখা রয়েছে তা না হয়েই যায় না। ভাগ্য আগে হতেই নিরূপিত হয়ে আছে।

বর্দ্ধমান এই চাতুর্মাস্যের প্রথম মাসের উপবাসের পারণ করেছিলেন বিজয় শ্রেষ্ঠীর ঘরে, দ্বিতীয় মাসের আনন্দ শ্রাবকের ঘরে, তৃতীয় মাসের সুনন্দের ঘরে ও চতুর্থ মাসের নালন্দা হতে পরিব্রাজন করে কোল্লাগে ব্রাহ্মণ বহুলের ঘরে।

নালন্দা হতে বর্দ্ধমান যখন পরিব্রাজন করে গেলেন গোশালক তখন তন্তুবায়শালায় ছিলেন না। ভিক্ষাচর্যায় গিয়েছিলেন। ভিক্ষাচর্যা হতে ফিরে এসে তিনি যখন দেখলেন যে বর্দ্ধমান সেখানে নেই, তখন ভাবলেন হয়ত তিনি ভিক্ষাচর্যায় গেছেন। কিন্তু ভিক্ষাচর্যা হতে ফিরে আসার সম্ভাব্য সময়ও যখন উত্তীর্ণ হয়ে গেল তখন তিনি তাঁর সন্ধানে নগরে গেলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর কোনো সন্ধান পেলেন না। তখন হতাশ হয়ে আবার তন্তুবায়শালায় ফিরে এলেন।

কিন্তু সেই তন্তুবায়শালায় তিনি আর অবস্থান করলেন না। নিজের সমস্ত সঞ্চয় দান করে মুণ্ডিত মস্তক ও নগ্ন হয়ে বর্দ্ধমানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন।

সৌভাগ্যবশতঃ গোশালকও কোল্লাগের পথ নিলেন। তাই কিছুদূর যেতে না যেতেই তিনি পথে এক মহামুনির কথা শুনতে পেলেন। গোশালকের তখন বুঝতে বাকী রইল না যে এই মহামুনিই বর্দ্ধমান ও তিনি এখন কোল্লাগে অবস্থান করছেন।

গোশালক তাঁর সন্ধানে যেই নগরে প্রবেশ করতে যাবেন ওমনি বর্দ্ধমানের সঙ্গে পথের ওপরই তাঁর দেখা হয়ে গেল। গোশালক তখন তাঁকে প্রণাম করে বললেন, ভগবন্, এই দীন আপনার শিষ্য। তাকে গ্রহণ করুন।

বর্দ্ধমান তাঁকে স্বীকার করে নিলেন। বললেন, গোশালক তোমার যেমন অভিরুচি।

কোল্লাগ হতে গোশালকসহ সুবর্ণখলের দিকে চলেছেন বর্দ্ধমান।

আভীর পল্লীর মধ্যে দিয়ে পথ। সেই পথের ধারে একখানে প্রকাণ্ড এক মহীরুহের তলায় মাটীর হাঁড়ীতে আভীরেরা দুধ জ্বাল দিচ্ছিল। দুধ ক্ষীর হবে।

গোশালক তাই দেখে সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। বর্দ্ধমানের দিকে চেয়ে বললেন, দেবার্য, এবেলা এখানে অবস্থান করলে হয় না? তা হলে ভিক্ষেটা এখানেই হয়ে যায়।

শুনে বর্দ্ধমান বললেন, না গোশালক। জিহ্বার রসলোলুপতা শ্রমণ জীবনের বাধক। তাই আমি এখানে অবস্থান করব না। এগিয়ে যাব। তা ছাড়া—

তা ছাড়া এই ক্ষীর শেষ পর্যন্ত পক্ক হবে না।

পক্ক হবে না ?

না গোশালক।

তবে দেবার্য, আপনি এগিয়ে যান। আমি শেষ পর্যন্ত দেখে আসব।

বর্দ্ধমান তাই এগিয়ে গেলেন। আর গোশালক সেইখানে রয়ে গেলেন। তিনি দেখবেন যা হবার তা হয় কিনা। ক্ষীর কিভাবে পক্ক না হয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

গোশালক সেখানে শুধু অবস্থানই করলেন না, আভীরদের সতর্ক করে দিলেন। বললেন, ওই মহাত্মা বলে গেলেন, এই ক্ষীর পক্ক হবে না।

শুনে আভীরেরা হাসল। বলল, ক্ষীর কিভাবে পক্ক হবে তা তাদের জানার কথা, মহাত্মার নয়।

কিন্তু বর্দ্ধমানের কথাই সত্যি হল। আগুনের তাপে সেই হাঁড়ী এক সময় কী করে ফেটে গেল। ফেটে গিয়ে সমস্ত দুধ আগুনে পড়ে গেল।

দুধ আগুনে পড়তেই গোশালক বর্দ্ধমান যেদিকে গিয়েছিলেন সেই দিকে তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগিয়ে গেলেন। মনে মনে বললেন, নিয়তিকে কেউ ঠেকাতে পারে না। তার বিধান অনতিক্রমণীয়।

সুবর্ণখল হতে বর্দ্ধমান এলেন ব্রাহ্মণগ্রামে সেখানে ভিক্ষায় পর্যুষিত অন্ন পেলেন। অদীন মনে তাই গ্রহণ করলেন। তারপর নানাদেশ পরিভ্রমণ করে বর্ষাবাসের আগ দিয়ে এলেন চম্পায়।

চম্পা সেকালে অঙ্গ দেশের রাজধানী ছিল।

বর্দ্ধমান চম্পায় এবার বর্ষাবাস ব্যতীত করবেন। তৃতীয় বর্ষাবাস।

এই বর্ষাবাসে তিনি দুমাস পরপর মাত্র দু'বার অন্নগ্রহণ করলেন।

বর্ষাবাস শেষ হতে চম্পা পরিত্যাগ করে বর্দ্ধমান এলেন কালায় সন্নিবেশ। সেখানে একরাত্রি অবস্থান করে পরদিন সকালে চলে গেলেন পত্তকালয়। পত্তকালয় হতে কুমারাক সন্নিবেশে। কুমারাক সন্নিবেশ চম্পকরমণীয় উদ্যানে তাঁরা স্থিত হলেন।

কুমারাকে সেদিন ভিক্ষাচর্যায় গেছেন গোশালক। হঠাৎ পথের মাঝখানে তাঁর দেখা হয়ে গেল মুনিচন্দ্র স্থবিরের শিষ্যদের সঙ্গে। তাঁরাও তখন কুমারাকে এসে কুবণয় কামারের কর্মশালায় অবস্থান করছিলেন।

মুনিচন্দ্র ভগবান পার্শ্বনাথের শিষ্যসম্প্রদায়ের এক আচার্য ছিলেন। এঁদের বস্ত্র ও পাত্রাদি রাখা সম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধ ছিল না। তাই এঁরা নানা বর্ণের বস্ত্র পরিধান করতেন ও ভিক্ষাচর্যার জন্য পাত্রাদি উপকরণ বহন করতেন।

গোশালকের দৃষ্টি তাঁদের বিচিত্র বেশ ও পাত্রাদি উপকরণের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। তিনি কৌতূহলী হয়ে তাঁদের তাই জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কে ?

আমরা ভগবান পার্শ্বনাথের শিষ্যসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমণ নির্গ্রন্থ।

নির্গ্রন্থ ?

গোশালক মনে মনে ভাবলেন যাঁদের এত এত বস্ত্রাদির উপকরণ তাঁরা কেমন নির্গ্রন্থ ?

গোশালকের যদি বাক সংযম থাকত তবে তিনি সেকথা তাঁদের বলতেন না। কিন্তু গোশালকের বাক সংযম ছিল না। তাই সেকথা তাঁদের মুখের ওপর বলে বসলেন, বললেন। নির্গ্রন্থ? এত এত বস্ত্র ও পাত্রাদির উপকরণ থাকতে আপনারা কেমন নির্গ্রন্থ ? সত্যকার নির্গ্রন্থত আমার আচার্য যাঁর গায়ে একফালি সুতোও নেই, না সঙ্গে ভিক্ষার কাষ্ঠ পাত্র। তিনি ত্যাগ এবং তপস্যার প্রতিমূর্তি।

নগ্ন গোশালকের দিকে চেয়ে মুনিচন্দ্র স্থবিরের শিষ্যরা নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করলেন। তারপর বললেন। তোমার মতো স্বয়ংগৃহীত লিঙ্গ হবেন হয়ত তোমার গুরু।

বর্দ্ধমানের নিন্দায় গোশালকের রাগ হল। তিনি গায়ে পড়ে তাদের সঙ্গে ঝগড়া করলেন। শেষে তাঁদের অবস্থান স্থান অগ্নিদগ্ধ হোক বলে অভিশাপ দিয়ে প্রতিনিবৃত্ত হলেন।

তোমার মতো লোকের কথায় আমাদের অবস্থান স্থান দগ্ধ হয় না বলে মুনিচন্দ্র স্থবিরের শিষ্যরাও নিজেদের পথ নিলেন।

চম্পক রমণীয় উদ্যানে ফিরে এসেই গোশালক বর্দ্ধমানের কাছে সমস্ত কথা নিবেদন করলেন। বললেন, ভগবন্, আজ সারম্ভ ও সপরিগ্রহী শ্রমণদের সঙ্গে দেখা হল। তাঁদের সঙ্গে আমার বাদও হয়েছে।

বর্দ্ধমান বললেন, হাঁ গোশালক, তাঁরা ভগবান পার্শ্বনাথের পূজ্য শিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁদের সঙ্গে বাদ করে তুমি ভালো করো নি।

বর্দ্ধমান বোধ হয় এই জন্মই তীর্থংকর জীবনে তরুণ শিক্ষার্থী শিষ্যদের বিনয় শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেছিলেন :

অন্যের দুঃখদায়ী কর্কশ ভাষা সত্য হলেও কখনো উচ্চারণ করবে না।

অন্যের যা অবিশ্বাসের বা ক্রোধের কারণ হয় সেরূপ অহিতকর ভাষা সত্য হলেও কখনো উচ্চারণ করবে না।

এতে নিজের মনের সমভাবই যে নষ্ট হয় তা নয়, অন্যের মনেও দ্বেষ বা বৈরভাবের সৃষ্টি করে।

এইজন্মই বোধ হয় সম্যকত্ব প্রয়াসী সাধুকে প্রশান্তমনা, সংযতবাক ও অপ্রগলভ হতে হয়।

রাত্রির তখন দ্বিতীয় যাম। গোশালক সবে মাত্র শয্যা গ্রহণ করেছেন। এমন সময় দূরে নগরের দিক হতে—যেদিকে কুবণয় কামারের বাড়ী ছিল সেদিক হতে একটা আলোর প্রকাশের মতো দেখা গেল। সেই আলো ক্রমশঃই ওপরের দিকে উঠতে লাগল।

গোশালক সেই আলো দেখে উঠে বসলেন। উল্লসিত হয়ে উঠলেন। ভাবলেন এতক্ষণে তাহলে তাঁর অভিশাপটা সফল হল। সারম্ভী ও সপরিগ্রহী শ্রমণদের উপাশ্রয় নিশ্চয়ই দগ্ধ হচ্ছে।

বর্দ্ধমানকে সে কথা জিজ্ঞাসা করতেই বর্দ্ধমান বললেন, না, গোশালক, এইমাত্র পার্শ্বাপত্য শ্রমণ মুনিচন্দ্র স্থবিরের দেহাবসান হল। তুমি যে আলোর প্রকাশ দেখেছ সে তাঁর আত্মার উৎক্রান্তির প্রকাশ।

গোশালক আবার প্রশ্ন করলেন, ভগবন্, তিনিত অসুস্থ ছিলেন না ; তবে সহসা কি করে তাঁর দেহাবসান হল ?

বর্দ্ধমান বললেন, গোশালক, মুনিচন্দ্র স্থবির কর্মশালায় কায়োৎসর্গ ধ্যানে একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন ? কুবণয় অত্যধিক মদ্যপান করে এসে চোরভ্রমে তাঁর গলা টিপে ধরেছিল। তাইতেই তাঁর মৃত্যু হল।

[ক্রমশঃ

জৈন তীর্থংকর ভগবান ঋষভদেবই কি পুরীর জগন্নাথ?

[নিম্নলিখিত প্রবন্ধে ডাঃ পি. সি. রায়চৌধুরী সে কথাই বলতে চেয়েছেন। *Hindusthan Standard*-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের (১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪) বঙ্গানুবাদ এখানে প্রকাশিত করা হচ্ছে। —সম্পাদক]

ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক জৈনদের শেষ তীর্থংকর মহাবীরের পূর্বেও জৈনধর্ম উড়িষ্যায় প্রচলিত ছিল। জৈনদের আদি তীর্থংকর ছিলেন ভগবান ঋষভদেব। ঋষভ উড়িষ্যায় ঋুষভ রূপে উচ্চারিত হয়। ঋুষভদেবের প্রাচীন মূর্তি উড়িষ্যার বিভিন্ন প্রান্ত হতে পাওয়া গেছে। এ হতে বলা যায় যে ঋুষভ উপাসনা উড়িষ্যায় বহুল প্রচলিত ছিল। উড়িষ্যার মন্দিরে এখনো ঋুষভদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

উড়িষ্যার জৈনধর্মের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। ময়ূরভঞ্জ, কেয়নঝাড়, কটক, পুরী, বালাসোর ও কোরাপুট প্রভৃতি অঞ্চল হতে জৈন পুরাকীর্তি পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে তীর্থংকর মূর্তি, যক্ষ ও যক্ষিণীর মূর্তি, চৈত্য আদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভুবনেশ্বর, কটক, চৌদ্বয়ার আদি জায়গায় সেকালীন ও একালীন জৈন মন্দিরও বিদ্যমান।

খারবেলর সময় খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতকে জৈনধর্ম উড়িষ্যার রাষ্ট্রধর্ম ছিল। অশোক পৌত্র সম্প্রীতি জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন ও জৈনধর্মের প্রসারে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেছিলেন। খারবেলর উত্তরাধিকারীরাও প্রধানতঃ মুনিদের বাসের জন্য উদয়গিরি, খণ্ডগিরি ও নীলগিরিতে গুহামন্দিরাদি নির্মাণ ও জৈন ভাস্কর্য উৎকীর্ণ করান।

উড়িষ্যার জন জীবনেও জৈন ধর্মের প্রভাব আবার সুদূর প্রসারী। উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলের লোকেরা এখনো নিরামিশাষী। বটবৃক্ষ, কল্পবট, আদি সামাজিক উৎসব ও অনুষ্ঠান জৈন ধর্ম হতে উদ্ভূত। জৈন কথা ও কিম্বদন্তীর প্রভাব গ্রামীন কথা ও কিম্বদন্তীতে সুস্পষ্ট। সরলাদাসের মহাভারতসহ

প্রাচীন উড়িয়া সাহিত্য জৈনধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত। মহাভারতের জৌনগথ কাহিনী প্রাচীন জৈন কাহিনীর আর একটা রূপ মাত্র। উড়িয়্যার বউলা চরিত, রামকথা আদি জৈনগন্ধী। এমনকি উড়িয়া ভাগবতের কয়েকটা অধ্যায় জৈন আদর্শ ও শ্রাবকদের পালনীয় চারিত্র্য ধর্মে পরিপূর্ণ।

জৈন ধর্মের প্রভাব উড়িয়্যার ধর্মগুলিতে আরো অনেক বেশী। উড়িয়্যার সংখ্যালঘু দুটী ধর্মমত মহিমপন্থ ও অরখীয়পন্থে জৈন প্রভাব এত বেশী যে তাদের জৈনধর্মের শাখা বলে অভিহিত করা যায়। উড়িয়্যায় যে জগন্নাথ উপাসনা প্রচলিত তা হিন্দু না জৈন সেকথা বিবেচ্য। জৈন উপাসনার সঙ্গে জগন্নাথ উপাসনার সাদৃশ্য দৃষ্টে তাকে জৈন ধর্ম হতে উদ্ভূত বলেই মনে হয়। জগন্নাথ উপাসনা বৈষ্ণব বা শৈব ধর্মের মতো প্রাচীন নয় এবং পূর্বভারতের উড়িষ্যা, বাংলা ও বিহারের কয়েকটা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। পুরীতে জগন্নাথ-দেবের মন্দির থাকায় পুরীকে জগন্নাথদেবের ক্ষেত্র বলা হয়। বিহারেও কয়েকটা অঞ্চলে জগন্নাথদেবের মন্দির দেখা যায়। রাঁচীর জগন্নাথপুরের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যেখানে ভারী যন্ত্রের কলকারখানা এখন স্থাপিত হয়েছে। বাঙলার মাহেশের রথযাত্রার কথা সকলেই জানেন তবে শিব পার্বতী ও বিষ্ণুর মতো জগন্নাথ হিন্দুধর্মে সর্বমান্য নন। হস্তপদহীন জগন্নাথ মূর্তিও আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। এককভাবে তিনি আবার পুজিতও হন না। বলভদ্র ও সুভদ্রার সঙ্গে তিনি পুজিত হন। এমন কতকগুলো উৎসব ও অনুষ্ঠান রয়েছে যা কেবল জগন্নাথ উপাসনাতেই দেখা যায় অন্যত্র নয়। যেমন সুসজ্জিত রথে তাঁকে আরোহণ করিয়ে মানুষে রথ টানে (রথযাত্রা), উৎসব সহকারে জগন্নাথদেবকে স্নান করায় (স্নানযাত্রা), মূর্তির কলেবর পরিবর্তন করা হয় ও নূতন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয় (নব-কলেবর ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা)।

এ সবের মধ্যে রথযাত্রা স্পষ্টতঃই জৈন ধর্ম হতে গৃহীত। রথের আকার জৈন চৈত্যের অনুরূপ। পুরীতে আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া ও ভুবনেশ্বরে চৈত্র শুক্লা অষ্টমীতে রথযাত্রার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই দুইটি দিন শুভ দিন বলে গণ্য হয়ে থাকে ও কল্যাণক দিবস বলে যে কোন শুভ কাজ ওই দুটী দিন হতে আরম্ভ করা হয়। যদি আমরা এই মান্যতার উদ্ভবের কারণ অনুসন্ধান করতে

যাই তবে জৈন গ্রন্থের সাহায্য আমাদের গ্রহণ করতে হবে। জৈন ধর্ম-গ্রন্থানুসারে আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান ঋষভ মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন। সেইজন্য ওইদিন চৈত্যযাত্রা বা রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ভিন্ন মতে ঋষভ আষাঢ় শুক্লা চতুর্থীতে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন। গর্ভাবাসের সময় ৯ মাস ৪ দিন। আষাঢ় শুক্লা চতুর্থীর সঙ্গে ৯ মাস ৪ দিন যোগ করে আমরা চৈত্রশুক্লা অষ্টমী পাই। চৈত্রশুক্লা অষ্টমী ঋষভের জন্মদিবস বলে ভুবনেশ্বরে সেদিন রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

জৈন মূর্তিদের স্নান ও অভিষেকের সঙ্গে জগন্নাথদেবের স্নান যাত্রার সাদৃশ্য আছে। জগন্নাথদেবের চোখে বিলেপন ও নব যৌবন জৈন মূর্তি পূজার অনুরূপ। জগন্নাথদেবের শরীরে বিলেপন লাগাবার মতো স্থান না থাকায় কেবল তাঁর চোখেই বিলেপন লাগান হয়।

জগরনাথ বা জগন্নাথ নামটীও আবার জৈন ধর্ম হতে গৃহীত। 'অভিধান রাজন্দ্রে' বলা হয়েছে যে জগরনাথ বা জগন্নাথ জিনেশ্বর ঋষভ বা ঋষভের আর একটী নাম। জগন্নাথ মন্দিরের 'বটেরা' (বট) ঋষভের চৈত্যবৃক্ষ। জগন্নাথের নীলচক্র ঋষভের ধর্মচক্র। ভারতের যেখানে যেখানে ঋষভের মন্দির আছে তাকে চক্রক্ষেত্র বলা হয়। রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধ জৈনতীর্থ আবু চক্রক্ষেত্র। কেয়নঝাড়ের আনন্দপুর যেখানে ঋষভের মন্দির অবস্থিত তাও চক্রক্ষেত্র। জগন্নাথদেবের পীঠস্থান পুরীও চক্রক্ষেত্র। পুরীকে তাই ঋষভের পীঠস্থান বলা যায়। হিন্দুধর্মের প্রাবল্যের সময় ঋষভ জগন্নাথে রূপান্তরিত হয়ে যান।

অহিংসা ব্রত

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডাঃ হরিসত্য ভট্টাচার্য

জৈনগণ স্থাবর পদার্থেও প্রাণের সত্তা স্বীকার করেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা বৃক্ষাদির প্রতিও অহেতুক হিংসাচরণের বিরোধী। তাঁহারা বলেন, কোনও প্রাণীকে হত্যা বা আঘাত করিবার পক্ষে কোনও সুযুক্তি থাকিতে পারে না। ধর্মের নামে কোনও দেবতার তথাকথিত তুষ্টির জন্য প্রাণী হত্যা তাঁহাদের মতে মহাপাপ। যজ্ঞ কার্যে প্রাণী হত্যার সমর্থকগণ তাঁহাদের মত সমর্থনে বলেন দেবগণ ধর্ম বা সদাচারের স্বরূপ জগতে প্রকাশ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য চেতন জীবকে দেবতাগণের নিকট বলি স্বরূপে উৎসর্গ করা কর্তব্য; অতিথি-গণের রসনা-তৃপ্তির জন্য কেহ কেহ ছাগ, মেষ প্রভৃতির বধে কোনও দোষ দেখিতে পান না; বহু ক্ষুদ্র জন্তুর বধের পরিবর্তে কোনও বৃহৎ জীবের বধ দোষাবহ নহে, ইহা কাহারও কাহারও অভিমত; কোনও একটী প্রাণীকে হত্যা করিলে যদ্যপি তদ্বারা বহু জীবের রক্ষা সাধিত হয় তাহা হইলে পূর্বোক্ত একটী জীবকে বধ করা কর্তব্য, ইহাও কেহ কেহ বলেন; ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জীব বহু প্রাণীকে হত্যা করে, অতএব হিংস্র প্রাণীকে বিনাশ করা কর্তব্য, অনেকে এমতে বিশ্বাসী; রোগ ও দুঃখাদিতে জর্জর জীবকে বধ করিয়া তাহার দুঃখ কষ্টের অবসান করায় কোনো পাপ নাই, ইহাও কাহারও কাহারও অভিমত; কেহ কেহ বলেন, কোনও জীব ইহ জীবনে যে নানাবিধ সুখ উপভোগ করিতেছে, তাহার দ্বারা ইহা অনুমিত হয় যে ঐ জীব তাহার প্রাক্তন জন্মে তপস্যাদি বহু সুকর্ম করিয়াছিল অতএব যাহাতে ইতঃপর জীবনে ঐ সমস্ত সুকৃতির ফল আরও তীব্রতর ভাবে তাহার ভোগ্য হয় তজ্জন্য বধ সাধনের দ্বারা তাহার ইহজীবনে জীবনের অবসান করা যুক্তিযুক্ত,—কথিত হয়, কোনও সময়ে এমন অদ্ভুত মতেরও সমর্থক ছিল; তীর্থস্থানে মৃত্যুর ফলে স্বর্গাদি সুখময় স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায় এই বিশ্বাসে কেহ কেহ তীর্থস্থানে নিজের

অথবা তাঁহাদের আস্থাবান শিষ্যবর্গের মৃত্যুর সহায়তা করিতেন ; মৃত্যুর পরে স্বচ্ছন্দময় স্বর্গাদি লোকে গমন করিবেন এইরূপ বিশ্বাসে কোন সময়ে শিষ্যগণ ধ্যান-নিমগ্ন গুরুর সংহার সাধন করিতেন, এমনও শোনা যায় ; ক্ষুধার্ত প্রাণী-গণকে খাওয়াইবার নিমিত্ত নিজের দেহ হইতে মাংস খণ্ডন করিলে পুণ্য লাভ হয়, ইহাও কেহ কেহ বিশ্বাস করিতেন। জৈনগণ এই সমস্ত ইত্যাকার আচার ও ধারণা সমূহের নিন্দা করেন। নিজের অথবা অপরের প্রাণে, যে কোনও কারণেই হউক না কেন, কোনও আঘাত ঘটাইলে, হিংসা জনিত পাপ অনুষ্ঠিত হয়, ইহাই তাঁহারা ঘোষণা করেন।

অহিংসা ব্রত আচরককে অতি যত্ন সহকারে সর্বাগ্রে হিংসার স্বরূপ ও সীমা বুঝিয়া লইতে হইবে। অনুষ্ঠিত ও প্রত্যক্ষলব্ধ কোন হিংসা কার্যের চতুঃসীমানার মধ্যেই যে হিংসা বেষ্টনী বদ্ধ তাহা নহে। হিংসার একটা আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দিক আছে। ইচ্ছাপূর্বক একটা প্রকাশ্য আঘাত কর্ম করিলে হিংসানুষ্ঠানতো হয়ই (কৃত), ঐ আঘাত কর্ম নিজে না করিয়া অপরের দ্বারা করাইলেও, হিংসা করা হয় (কারিত), এমন কি ঐ আঘাত কর্ম নিজে না করিলেও এবং অপরের দ্বারা না করাইলেও, যদ্যপি কোনও ব্যক্তি ঐ কর্মের সমর্থন করে তাহা হইলে তাহারও হিংসানুষ্ঠান হয় (অনুমোদিত)। স্বয়ং কৃত, কারিত এবং অনুমোদিত—ত্রিবিধ হিংসা কর্মই বাক কায় বা মনের দ্বারা আচরিত হইতে পারে। জৈনগণ বলেন, তদনুসারে হিংসার নবধা ভেদ স্বীকার করা যায়।

ব্রতানুষ্ঠানে সাধারণ ভাবে নিষেধাত্মক শৈল্যগুলি পরিবর্জন করিয়া চলিতে হয়, ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। অহিংসা ব্রতের নির্দোষ পালনে সেইরূপ আটটি কার্য বিশেষ ভাবে পরিহার করিতে হয়। জৈনগণ সে-গুলিকে 'অষ্ট মূলগুণ' বলিয়া থাকেন। যথা : (১) মদ্য পান, (২) মাংসাহার, (৩) মধু পান, (৪-৮) উদুম্বরাদি পাঁচটী ফল ভক্ষণ। তাঁহাদের মতে অহিংসা ব্রতাচরণে এই আটটি নিষিদ্ধ কর্ম। সুরাপান সম্বন্ধে জৈনগণ বলেন, প্রথমতঃ, মদ্য পান জনিত মত্ততায় মানুষের মন মোহগ্রস্ত হয়, তথায় নানাবিধ জিঘাংসা বৃত্তির উদ্রেক হয়। তাহাকে সদাচারের পথ ভুলাইয়া দেয় এবং যে কোনও প্রকার আঘাতাদি নিষ্ঠুর কর্ম সাধনে মানুষকে প্রবৃত্ত করে। এই প্রসঙ্গে জৈনগণ

আরও বলেন যে মদ্যাদি সকল অম্লায়মান পদার্থে এমন কি দুগ্ধসারেও অসংখ্য ক্ষুদ্র জীবের উৎপত্তি হয়, সুতরাং ঐ মাদক দ্রব্য পান করিলে প্রাণী হত্যা অনিবার্য হইয়া পড়ে। মাংস ভক্ষণ জীব হনন ব্যতিরেকে অসম্ভব, দৃষ্টির অগোচর বহুবিধ সূক্ষ্ম জীব আম-মাংস ও সিদ্ধ পক্ক মাংস, উভয় প্রকার মাংসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং মাংসভোজী হিংসাচরণ এড়াইতে পারে না। মধুচক্রে যে সমস্ত মক্ষিকা থাকে তাহাদের অনিষ্টাচরণ ব্যতিরেকে মধু সংগ্রহ করা যাইতে পারে না। মধুচক্র বিচ্যুত মধুর মধ্যেও বহু সূক্ষ্ম জীব অবস্থান করে; সে কারণ মধুপানকারী বহু জীবের ঘাতক হইয়া পড়েন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ পরিব্যাপ্ত পঞ্চবিধ উদুম্বর (ডুম্বুর জাতীয়) ফল অসংখ্য ক্ষুদ্র জীবের আশ্রয় স্থল, সুতরাং উদুম্বর ভক্ষণে জীব হিংসা হইয়া থাকে।

সংকল্পিত হিংসা কর্ম ব্যতীত মানুষ অনিচ্ছা ভাবে ও অনবধানতাবশতঃও অনেক হিংসা কর্ম করিয়া থাকে। এই অসংকল্পিত হিংসা কার্যের মধ্যে জৈনগণ বিশেষ ভাবে পাঁচটী কার্যের উল্লেখ করেন, এইগুলি অহিংসা সম্বন্ধে পঞ্চ 'অতিচার' নামে অভিহিত হয় এবং এই অতিচার পাঁচটী অহিংসা ব্রত-ধারীর পক্ষে বর্জনীয়। কোনও প্রাণীর 'বন্ধ' অর্থাৎ তাহাকে অকারণ বাঁধিয়া রাখা, 'বধ' বা কোন জীবকে প্রহার করা, 'ছেদ' বা কোন প্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন অংশ কাটিয়া দেওয়া, 'অতিভারারোপণ' অর্থাৎ কোনও প্রাণীর উপর তাহার বহন শক্তির অতিরিক্ত ভার চাপাইয়া দেওয়া এবং 'অন্নপান-নিরোধ' বা তাহার ভোজ্য বা পানীয় হইতে কোনও জীবকে সরাইয়া রাখা,—এই পাঁচ প্রকার নিষ্ঠুর কর্ম ক্রোধ বা অনবধানতাবশতঃ অনুষ্ঠিত হইলে অহিংসা ব্রতের অতিচার হইয়া থাকে। জৈনগণের কথিত অহিংসা-অতিচার নামক এই পাঁচটী হিংসা কর্ম বর্তমান যুগে প্রত্যেক সভ্য দেশে দণ্ডনীয় অপরাধ রূপে গণিত হয়,—ইহা এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়।

ব্রতপালনে নিষেধাত্মক শল্য-পরিহারের সহিত বিধ্যাত্মক ভাবনার যেমন প্রয়োজন, অহিংসা ব্রতীর পক্ষে নিষেধাত্মক উপরোক্ত অষ্ট মূলগুণ ও অতিচার বর্জনের সহিত বিধ্যাত্মক পাঁচটী ভাবনাও আবশ্যক। এই ভাবনা পঞ্চকের ফলে অহিংসানুষ্ঠান দোষ-লেশ-শূন্য এবং অচঞ্চল হইয়া থাকে। যে বাক্যসকল উচ্চারিত করা হয়, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে সংযত হওয়া উচিত, ইহাই প্রথম

ভাবনা এবং ইহার নাম 'বাগ্-গুপ্তি'। মনোভাব সকলেরও সংযম প্রয়োজন,—এই মনঃসংযমের নাম 'মনোগুপ্তি'। অহিংস ব্যক্তির পক্ষে ভ্রমণকালে সাবধানতা আচরণ কর্তব্য, ইহার নাম 'ঈর্ষা' এবং ইহা তৃতীয় ভাবনা। চতুর্থ ভাবনার নাম 'আদান-নিক্ষেপ' সমিতি। কোনও বস্তু লইবার বা রাখিবার সময়ে যে সাবধানতা আচরণীয়, তাহার নাম আদান-নিক্ষেপ সমিতি। পান বা ভোজনের সময়ে পানীয় ও ভোজ্য পদার্থ বিশেষ ভাবে দেখিয়া লইয়া পান বা ভোজন করা উচিত, ইহার নাম 'আলোকিত পান-ভোজন'। এই পঞ্চবিধ ভাবনার ফলে অহিংসাচরণেচ্ছু ব্যক্তির বাক্য, চিন্তাদি মনোভাব ও শারীরিক ক্রিয়া সকল প্রাণী হিংসা-দোষে দুষ্ট হয় না।

॥ ৩ ॥

পঞ্চ-মহাব্রতের মধ্যে অহিংসাই মূল এবং অহিংসা ব্রতানুষ্ঠানের উপর সত্যাদি অপর চারিটী ব্রত প্রতিষ্ঠিত। অহিংসা পালন না করিলে অন্য ব্রতের অনুষ্ঠান অসম্ভব। ধর্মময় জীবনে মহাব্রত পঞ্চক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ব্রত পঞ্চক তথা অহিংসার অনুষ্ঠানে জৈন মতে যে সমস্ত বিঘ্ন (শল্য) ও অতিচার পরিহার করিতে হয় এবং যে সমস্ত পুণ্যময় ভাবনায় অনুপ্রাণিত থাকিতে হয় সংক্ষেপে সেগুলি উপরে বর্ণিত হইয়াছে। জৈনগণ বলেন, ব্রতানুষ্ঠান সর্বাঙ্গ সুন্দর করিতে হইলে, তাহার সহিত 'শীল' পরিপালন আবশ্যক। ব্রত তথা অহিংসার অনুষ্ঠানের সহিত শীল পালনের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য বলিলেও হয়। 'গুণব্রত' ও 'শিক্ষাব্রত' ভেদে শীল সাধারণতঃ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে শিক্ষাব্রত সংখ্যায় চারিটি ও গুণব্রত সংখ্যায় তিনটি। তদনুসারে শীল সপ্তবিধ। গুণব্রত অনুষ্ঠানের ফলে ব্রত তথা অহিংসার মূল্য বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত হয় এবং শিক্ষাব্রত ব্রত পরিপালনকে সুশৃঙ্খল করিয়া থাকে।

'দিগব্রত' গুণব্রত ত্রয়ের মধ্যে প্রথম। দশদিকের মধ্যে কাহারও সারা-জীবনের কর্মপদ্ধতি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখার প্রতিজ্ঞা গ্রহণের নাম দিগব্রত। (১) ঊর্দ্ধ দিকে যে সীমা নির্দিষ্ট করা হয়, (২) অধোদিকে গতি-বিধির সীমা, (৩) অপর অষ্ট দিকের জন্য নির্দিষ্ট পরিধি, (৪) অপরদিকে সীমা অতিক্রম না করিয়াও অথবা স্বল্পতর করিয়াও সীমা অতিক্রম করিলে

এমন কি (৫) নির্দিষ্ট সীমা প্রকৃত পক্ষে অতিক্রম না করিয়াও যদ্যপী ব্রতী ঐ সীমা বিস্মৃত হয়েন তাহা হইলে দিগব্রতের অতিচার করা হয়।

'দেশব্রত' দ্বিতীয় প্রকার গুণব্রত। সারা জীবনের জন্য যে দিগব্রতের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হয়, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেই দিগব্রতের সীমা আরও স্বল্প-পরিসর করিবার সংকল্পের নাম দেশব্রত। (১) এই দেশব্রতের সীমা নিজে অতিক্রম না করিয়া যদ্যপি ব্রতী ঐ সীমার বর্হিদেশ হইতে কোনও বস্তুর আনয়নের ব্যবস্থা করেন, (২) দেশব্রতের সীমার বহির্দেশে যদ্যপি ব্রতী কোনও উদ্দেশ্যে কোনও প্রেষ্য প্রয়োগ করেন অর্থাৎ কোনও ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন, (৩) 'শব্দানুপাত' (যথা, বর্তমান যুগের টেলিফোনাদি যন্ত্রের) দ্বারা নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে আপনার কণ্ঠস্বর যদ্যপি ব্রতী প্রেরণ করেন, (৪) যদ্যপি ব্রতগ্রাহী 'রূপানুপাত' অর্থাৎ শারীরিক সঙ্কেতাদি দ্বারা নির্দিষ্ট পরিধির বহির্ভাগে অবস্থিত ব্যক্তিগণের সহিত মনোভাবের আদান-প্রদান করেন অথবা (৫) যদ্যপি দেশব্রতী 'পুদ্গল-ক্ষেপ' অর্থাৎ নির্দিষ্ট সীমার বাইরে দ্রব্য নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে ব্রতীর প্রতিজ্ঞাত দেশব্রতের অতিচার বা লঙ্ঘন হয়।

তৃতীয় গুণব্রতের নাম 'অনর্থ-দণ্ড-বিরমন ব্রত'। অনর্থক পাপাচরণ হইতে বিরত থাকিবার জন্য ব্রত পরায়ন ব্যক্তির যে প্রতিজ্ঞা, তাহাই অনর্থ-দণ্ড-বিরমন ব্রত। (১) 'অপধ্যান' বা অপরের সম্বন্ধে কুচিন্তা, (২) 'পাপোপদেশ' অর্থাৎ অপরের নিকট দুষ্কর্ম করণের উপদেশ দান, (৩) 'প্রমোদ চারিত্র' অর্থাৎ বৃক্ষশাখাদি বিনা উদ্দেশ্যে ভগ্ন করার ন্যায় নিরর্থক অনিষ্টাচরণ, (৪) 'হিংসাদান' অর্থাৎ জনগণের মধ্যে আঘাতকারী অস্ত্রাদির বিতরণ এবং (৫) 'দুষ্কৃতি' বা কু-কাব্যাদির পাঠ বা শ্রবণ, এই পঞ্চবিধ দুঃশীল অনর্থ-দণ্ড-বিরমন ব্রতের অন্তর্গত। কোনও ব্যক্তি সম্বন্ধে বা কাহারও সহিত পরিহাস করিলে (কন্দর্প) কাহারও সহিত সক্রিয় ও অনিষ্টকর কৌতুক করিলে (কৌৎকুচ্য), অবিরাম বাক্যপ্রয়োগ করিতে থাকিলে (মৌখর্য্য), প্রয়োজনের অতিরিক্তভাবে কোনও কার্য করিলে (অসমীক্ষাধিকরণ) অথবা নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ্য-উপভোগ্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করিলে (উপভোগ-পরিভোগানর্থক্য) ব্রতধারীর পক্ষে অনর্থ-দণ্ড ব্রতের অতিচার করা হয়।

শিক্ষাব্রত চারিপ্রকার ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম শিক্ষা-

ব্রতের নাম 'সামায়িক'। প্রতিদিন সূর্যোদয় সময়ে, মধ্যাহ্নে বা সূর্যাস্তকালে নির্দিষ্ট কাল ধরিয়া যে আত্মচিন্তন, তাহাই সামায়িক নামে অভিহিত হয়। সামায়িক কালে 'মনোদুষ্প্রনিধান' বা অন্য বিষয়ে চিন্তা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির যথেচ্ছ সঞ্চালন বা 'কায়দুষ্প্রনিধান', 'বাক দুষ্প্রনিধান' অর্থাৎ বাক্যের অপপ্রয়োগ, সামায়িকে 'অনাদর' অথবা সামায়িক সম্বন্ধে 'স্মৃত্যনুপস্থান' বা নিয়মাদির বিস্মরণ এই পঞ্চবিধ কার্যের দ্বারা ব্রতধারীর সামায়িক ব্রতের অতিচার হয়।

'পোষধোপবাস' দ্বিতীয় শিক্ষাব্রত। প্রতি মাসে দুই অষ্টমী তিথিতে ও দুই চতুর্দশী তিথিতে অন্নপান গ্রহণ না করিয়া উপবাসী থাকা এবং ঐ চারিটী উপবাস দিবসে ধর্মশাস্ত্রাদি পাঠ করা, প্রোষধোপবাসের অঙ্গ। কোনও স্থান পূর্বে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ ও সম্মার্জন না করিয়া তথায় মলমূত্র ত্যাগ করিলে (অপ্রত্যবেক্ষিতা প্রমার্জিততোৎসর্গ), ঐরূপ অপ্রত্যবেক্ষিত ও অপ্রমার্জিত স্থানে কোনও দ্রব্য রাখিলে বা ঐরূপ স্থান হইতে কোনও দ্রব্য উঠাইয়া লইলে (অপ্রত্যবেক্ষিতা প্রমার্জিতাদান), ঐ প্রকার স্থানে উপবেশন করিবার আয়োজন করিলে (অপ্রত্যবেক্ষিতা প্রমার্জিত সংগুরুপক্রমণ), উপবাসে অনাদর করিলে অর্থাৎ আস্থাহীন হইলে এবং উপবাস সম্বন্ধে বিহিত নিয়মাদি বিস্মৃত হইলে (স্মৃত্যনুপস্থান) প্রোষধোপবাসের অতিচার হয়।

যে বস্তুর ভোগ সীমাবদ্ধ তাহার নাম 'উপভোগ্য' এবং যাহার ভোগ সীমাবদ্ধ নহে তাহার নাম 'ভোগ্য'। ভোগ্য ও উপভোগ্য উভয়বিধ বস্তুর উপভোগ নির্দিষ্টভাবে সীমাবদ্ধ করিবার সংকল্পের নাম 'ভোগাপভোগ পরিমাণ' এবং ইহা তৃতীয় শিক্ষাব্রত। ব্রতধারী যদ্যপি সজীব বস্তু (এমন কি সজীব শাকাদিও) আহার করেন (সচিত্তাহার), সজীব শ্যামবর্ণ পত্র আহারপাত্র স্বরূপে ব্যবহার করার ন্যায় কোন সজীব পদার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনও বস্তু আপনার প্রয়োজনে যদ্যপি ব্রতী ব্যবহার করেন (সচিত্ত সাবদ্ধাহার), উষ্ণ ও শীতল জল একসঙ্গে পান করার ন্যায় যদ্যপি ব্রতী অজীব ও সজীব উভয়বিধ সত্ব মিশ্রিত কোনও দ্রব্য আহার করেন (সচিত্ত সম্মিশ্রাহার), যদ্যপি তিনি কোনও উত্তেজক বা বিশেষভাবে বীর্যবিধায়ক বস্তু আহার করেন (অভিষবাহার), অথবা ব্রতচারী ব্যক্তি যদ্যপি কোনও সুসিদ্ধ নহে এমন অন্নাদি আহার করেন (দুঃপক্কাহার) তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ভোগোপভোগ-পরিমাণ ব্রতের অতিচার করা হয়।

চতুর্থ শিক্ষাব্রতের নাম 'অতিথি-সংবিভাগ'। নিজের অন্নপানাদির একাংশ প্রথমে অতিথিকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অংশ নিজে ভোজন করার যে সংকল্প গ্রহণ তাহার নাম অতিথি-সংবিভাগ। অতিথি যোগ্য ও উপযুক্ত হইলেই ভাল হয়। যিনি সম্যক দর্শনের অধিকারী অর্থাৎ সত্য তত্ত্বে শ্রদ্ধাবান্ এবং যিনি সম্যক চারিত্র অর্থাৎ বিধিবিহিত সৎ কার্যাদি করিয়া থাকেন এইরূপ নিষ্কলুষ যতিকে অতিথিরূপে প্রাপ্ত হওয়া বহু সৌভাগ্যের ফল; এইরূপ মহাপ্রাণ যতি-মুনির অভাবে সম্যক চারিত্রবান গৃহী অতিথিরূপে পূজনীয়; তাঁহার অভাবে সম্যক চারিত্রের অনধিকারী অথচ সম্যক দর্শনবান গৃহস্থ অতিথিকে সসম্মানে গ্রহণ করা যায়। এই ত্রিবিধ অতিথিই সুপাত্র। যাহার সম্যক দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বার্থে শ্রদ্ধা নাই অথচ যাহার বাহ্য কর্মসমূহ নিন্দনীয় নহে, অতিথি বিবেচনায় সে ব্যক্তিকে 'কুপাত্র' বলিয়া বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির সম্যক দর্শন নাই এবং যে দুষ্কর্মে লিপ্ত, দান ব্যাপারে সে ব্যক্তি একান্তই 'অপাত্র' অতিথি। দান সম্বন্ধে জৈনগণ কতকগুলি বিধি নিষেধের উল্লেখ করেন; অতিথিকে কোন দ্রব্য দিবার সময় সে দ্রব্যের স্বভাব ভাবিয়া দেখা উচিত, যথা—দেয় দ্রব্য যদি অতিথির ধর্মচর্চা বিষয়ে সহায়ক হয়, তাহা হইলে সেই দ্রব্যই প্রশংসনীয় ইত্যাদি। কিভাবে অতিথিকে গ্রহণ করিতে হয়, তাহাও মনে রাখা কর্তব্য; যথা, অতিথিকে স্বাগত প্রশ্নাদিপূর্বক অভ্যর্থনা করা কর্তব্য। অতিথি সেবায় মনোভাবও উপযুক্ত হওয়া উচিত অর্থাৎ অতিথি-সৎকার কালে দাতার মন বিনয়াদি সদ্‌ভাবে নির্মল রাখিতে হয়। আতিথ্য সম্বন্ধে জৈনগণের একটি লক্ষনীয় বিধি আছে। তাঁহারা বলেন—খাদ্য, ঔষধ, জ্ঞান ও অভয় এই চতুর্বিধ দেয় সম্বন্ধে গ্রহীতা জৈন কি অজৈন, মনুষ্য বা মনুষ্যেতর জীব ইত্যাকার কোনও রূপ বিচারের আবশ্যকতা নাই; এই চারিটি নির্বিচারে জাতি বর্ণনির্বিশেষে সকল অর্থীকেই প্রদান করা কর্তব্য। অতিথি সৎকার সম্বন্ধে পরিশেষে জৈনগণ এইরূপ নির্দেশ করেন যে—'সচিত্ত-নিক্ষেপ' বা শ্যামল পত্র প্রভৃতি সজীব পদার্থের উপর অতিথির খাদ্য রক্ষা করিলে, 'সচিত্তাপিধান' বা সজীব পদার্থের দ্বারা অতিথির খাদ্য আচ্ছাদন করিলে 'পরব্যপদেশ' বা অতিথি সেবার ভার অপরের ওপর অর্পণ করিলে, 'মাৎসর্য' বা উদ্ধত ব্যবহার অথবা অপরের সহিত প্রতি-স্পর্দ্ধার উদ্দেশ্য লইয়া দান-কর্ম

অনুষ্ঠিত হইলে, 'কালাতিক্রম' অর্থাৎ বিহিত সময়ে অতিথি সেবা না করিলে—অতিথি-সংবিভাগ ব্রতের অতিচার হইয়া থাকে।

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত সপ্তশীল অর্থাৎ ত্রিবিধ গুণব্রত ও চতুর্বিধ শিক্ষাব্রত, ব্রতপালনে যেমন সুশোভন, অহিংসানুষ্ঠানেও সেইরূপ প্রশংসার্হ মনে হইতে পারে। শল্যবিহীন, ভাবনাযুক্ত, অতিচার পরিহৃত এবং শীলবিভূষিত উপরোক্ত যে অহিংসা, তাহার অনুষ্ঠান অসম্ভব। প্রাচীনকালে জৈন মনীষিগণের মনে যে ইত্যাকার আশঙ্কা ছিল না তাহা নহে। সেইজন্য তাঁহারা স্পষ্টই স্বীকার করেন যে সংসার ত্যাগী সাধুগণের পক্ষেই পূর্ণ অহিংসার পালন সম্ভব এবং গৃহীর পক্ষে অহিংসানুষ্ঠান পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। এইজন্য মুনি আচরিত অহিংসাদি ব্রত 'মহাব্রত' ও গৃহীর অনুষ্ঠিত অহিংসাদি ব্রত 'অণুব্রত' নামে অভিহিত হয়। অনুষ্ঠান মাত্রায় তারতম্য ব্যতীত মহাব্রত ও অণুব্রতের মধ্যে কোনও মৌলিক বা প্রকৃতিগত বিভিন্নতা নাই। কথিত হয় শীলসপ্তক সাধারণতঃ গৃহী অনুষ্ঠিত অহিংসাদি অণুব্রত পঞ্চকেরই সহায়ক অর্থাৎ উপরোক্ত গুণব্রত ও শিক্ষাব্রত অণুব্রত অনুষ্ঠানের সহায়তাকল্পে গৃহীগণেরই আচরনীয়।

অণুব্রত পালন তথা কায়মনোবাক্যে যথাসম্ভব অহিংসাচরণ গৃহস্থের ধর্ম—ইহা স্বীকার করিলেও সামাজিক ব্যাপারে বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অহিংসাকে আদর্শ বা কর্মপদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে কিনা তদ্বিষয়ে অনেকেরই মনে একটা সংশয় আছে। একথা সত্য যে বিবদমান দুইটী সমাজ বা রাষ্ট্রের মধ্যে যদি উভয়েই অহিংসা-পরায়ণ হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষ বা লোকক্ষয়কর যুদ্ধ ঘটিতে পারে না। কিন্তু বিরাট জনসংঘ বা রাষ্ট্র আদৌ অহিংস হইতে পারে কিনা—ইহাই সন্দেহজনক।

তবে ইতিহাসে অহিংসা রাজ্যের যে একেবারে উল্লেখ পাওয়া যায় না, এমন নহে। মহারাজ অশোকের সুব্যবস্থায় তৎকালিক ভারতবর্ষ যে এক বিরাট অহিংসারাজ্য ছিল, তাহার প্রমাণ তাঁহার উৎকীর্ণ শৈললিপি প্রভৃতি অদ্যাপি বহন করিয়া আসিতেছে।

রাষ্ট্রীয় অহিংসাচারের দ্বারা অতি সুপ্রাচীন যুগে কিভাবে একটী যুদ্ধ নিবারিত হইয়াছিল এবং তাহার পরিবর্তে মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল, তাহা প্রাচীন ঐতিহাসিক প্লুটার্কের একটী বর্ণনায় পাওয়া যায়। সে আজ কিঞ্চিদূন তিন হাজার বৎসরের কথা। বিশ্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডার সুসমৃদ্ধ পারস্য সাম্রাজ্য দলিত মথিত করিয়া ভারতের প্রত্যন্ত দেশ তক্ষশীলার সীমান্তে উপস্থিত। বলোন্মত্ত গ্রীক সৈন্য তক্ষশীলা আক্রমণের জন্য মাসিডন-পতির আদেশের অপেক্ষা করিতেছে। এদিকে তক্ষশীলাও নগণ্য দেশ নয়। তৎকালে তক্ষশীলারাজ্য ইজিপ্ট দেশের ন্যায় সুবিস্তৃত ছিল এবং জনাকীর্ণ, সুসমৃদ্ধ ও বহুনগর ও জনপদে পরিপূর্ণ ছিল। একথা বলা যাইতে পারে যে পরবর্তী সময়ে গর্বিত মাসিডন বাহিনীর গতিরোধ করিতে মহারাজ পুরু যে শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তক্ষশীলা পতি মহারাজ অম্ভিরও সে শক্তি ছিল। সুতরাং গ্রীক ও ভারতের রক্তে তক্ষশীলার সীমান্তগিরিগাত্র ভয়াবহভাবে সিক্ত হইবার সমস্ত উপকরণই প্রস্তুত। মহামতি প্লুটার্ক লিখিয়া গিয়াছেন—"তক্ষশীলার রাজা অতিশয় জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। আলেকজাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎকারের সময় উভয়ের মধ্যে অভিবাদন বিনিময়ের পর রাজা বলিয়াছিলেন—আপনার ও আমার মধ্যে যুদ্ধ হইবার কি কারণ থাকিতে পারে? দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের পক্ষে অপরিহার্য ভোজ্য ও পানীয়াদি হইতে কেহ অপরকে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইলে শেষোক্ত ব্যক্তি আত্মরক্ষার নিমিত্ত অস্ত্রধারণে বাধ্য হয়। যদ্যপি আপনি ভোজ্য পানীয়াদি হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে উদ্যত না হয়েন, তাহা হইলে কেন আমাদের মধ্যে যুদ্ধ হইবে? স্বর্ণ, রৌপ্য, বৈভবাদি সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, যদ্যপি আপনার অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্যশালী হই তাহা হইলে আমার ঐশ্বর্যের অংশ আপনার তুষ্টির জন্যে আপনাকে দিতে পারি; আর যদ্যপি আমি আপনার অপেক্ষা কম বিত্তবান হই, তাহা হইলে আপনার নিকট হইতে আপনার বিত্তের দান গ্রহণে আমার কোন আপত্তি নাই। বিবদমান দুইটী শক্তির মধ্যে আশঙ্কিত যুদ্ধ বন্ধ হইয়া গেল।" আলেকজাণ্ডার ও অম্ভি উভয়ে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বে আবদ্ধ হইলেন। পরবর্তী সময়ে আলেকজাণ্ডার ভারতের কৃষ্টি ও ঋষি তপস্বীগণের সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, কথিত হয়, মহারাজ অম্ভিই তদ্বিষয়ে আলেকজাণ্ডারের পথ-প্রদর্শক ও প্রধান সহায়ক ছিলেন। বিনা রক্তপাতে কোনও পরাধীন দেশ স্বাধীন হয় নাই—ইতিহাস

এ যাবৎ এই সাক্ষ্যই দিয়া আসিতেছে। স্বারাজ্যের অকলুষ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, সম্পূর্ণ অকলুষ অহিংসা উপায়ে পরতন্ত্র দেশের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করাও যে সম্ভবপর, ভারতবর্ষ বর্তমান যুগে তাহা সুস্পষ্টরূপে সপ্রমাণ করিয়াছে। শুধু বৈদেশিক শাসকের শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ ব্যাপারেই নয়, ভারতবর্ষ রাজনীতিক্ষেত্রে অহিংসা ধর্মকে নীতি স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। উদ্দেশ্য 'কষায়'-বিহীন এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির সাধন প্রমত্তযোগ বিবর্জিত রাখিয়া কর্তব্যপথে সম্পূর্ণ অহিংসভাবে অগ্রসর হইলে শুধু ব্যক্তির পক্ষে নয়, জাতির পক্ষেও, যে সিদ্ধিলাভও সম্ভব, বর্তমান ভারত তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে না।

মৃগাপুত্রীয়

ভীষণ যন্ত্রণা আমি সহ্য করিয়াছি বারে বারে
জীবনে জীবনে। ছিন্ন মোরে করেছে কুঠারে,
আগুনে করেছে দগ্ধ। ছাড়ায়ে নিয়েছে মোর ছাল,
আবদ্ধ করেছে ফাঁদে তুলেছে আমায় ফেলি জাল;
বিদীর্ণ করেছে শূলে। বিদ্ধকরি তীক্ষ্ণ শরে
অস্থি মোর চূর্ণ চূর্ণ করেছে তোমারে।

কখনো পাইনি সুখ জীবনের সামান্য আশ্বাস
অনন্ত জীবন ধরে। আজ তাই জীবনে হতাশ
বাঁধিতে চাই না ঘর অনিশ্চিত পথের ওপর,
যেখানে অনন্ত সুখ সেখানে বাঁধিব মোর ঘর।

উত্তরাধ্যয়ন, অধ্যয়ন ১৯

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ আষাঢ় ১৩৮১ ॥ তৃতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :

গণেশ লালওয়ানী

পদ্মপ্রভ, পাকবিরর্‌রা, পুরুলিয়া

বর্দ্ধমান-মহাবীর

[জীবন চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

বর্দ্ধমান কোথাও স্থিত হন না। তাই পরদিন সকালেই চলে এলেন চোরাক সন্নিবেশ।

বর্দ্ধমান চোরাকে প্রবেশ করতে যাবেন। প্রবেশ পথে আরক্ষকেরা তাঁদের বাধা দিল। জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কে?

বর্দ্ধমানের মৌন ছিল তাই কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না। তা'ছাড়া তাঁদের কিই-বা পরিচয়? পূর্বাশ্রম তাঁরা পরিত্যাগ করে এসেছেন। এখন কেবল শ্রমণ, পরিব্রাজক। গোশালক সেই কথাই বললেন। বললেন, নগরে প্রবেশের কি কোনো বাধা আছে?

আরক্ষকেরা গোশালকের সেই প্রত্যুত্তরে তুষ্ট হল না। এক, গোশালকের কথা বলার এই বিশেষ ভঙ্গী। দুই, চোরাকের সঙ্গে প্রতিবেশী এক রাষ্ট্রের তখন যুদ্ধ বাধবার উপক্রম হয়েছে। গুপ্তচরেরা নানাভাবে তাই সংবাদ সংগ্রহ করতে আসছে। আর সাধু শ্রমণের বেশে আসাই ত সবচেয়ে নিরাপদ।

তাই বার বার প্রশ্ন করেও যখন আরক্ষকেরা সন্তোষজনক কোনো প্রত্যুত্তর পেল না তখন তাঁদের ধৃত করে আরক্ষালয়ে নিয়ে গেল।

বর্দ্ধমান তাই চান। পরিবেশ যত প্রতিকূল হবে, তাঁরা যত বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হবেন, কর্ম নির্জরা ততই সহজ হবে।

আরক্ষালয়ে প্রকৃত তথ্য জানবার জন্য আরক্ষকেরা তাঁদের ওপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হল। বর্দ্ধমান সে সব অত্যাচার সহ্য করেও যেমন চুপ করে ছিলেন তেমনি চুপ করে রইলেন। গোশালকও শেষে প্রত্যুত্তর দেওয়া হতে নিবৃত্ত হলেন। এতে তাঁরা যে গুপ্তচর সে সম্বন্ধে আরক্ষকদের আর কোনো সন্দেহই রইল না। তারা তখন তাঁদেরকে আরো উৎপীড়ন করতে প্রবৃত্ত হল।

অনেকদিন পরের কথা। গৌতম বর্দ্ধমানকে জিজ্ঞাসা করছেন, ভগবন্, নির্বেদে জীব কি উপসর্জন করে ?

নির্বেদে সে সমস্ত রকম সুখভোগে উদাসীনতাকে প্রাপ্ত হয়। তার কোনো বিষয়েই আসক্তি থাকে না। সে তখন সর্বারম্ভ পরিত্যাগী হয়ে মোক্ষমার্গ অবলম্বন করে।

বর্দ্ধমান সেই মোক্ষমার্গ অবলম্বন করেছেন। কোনোরকম সুখভোগে তাই তাঁর ইচ্ছা নেই। কোনো কিছুতেই তাঁর আসক্তি নেই। তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহরূপ কষায় জয় করে প্রিয় অপ্রিয় শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়েছেন।

উদাসীন হয়েছেন তাই যখন কোমরে দঁড়ি বেঁধে আরক্ষকেরা তাঁকে কূয়োর ভেতর নামিয়ে দিয়েছে তখনো তিনি প্রশান্তমনা।

আরক্ষকেরা তাঁকে একবার জলের মধ্যে চুবিয়ে দিচ্ছে আবার ওপরে টেনে তুলছে ও বলছে—বল, এখনো বল, তোরা গুপ্তচর কিনা !

গুপ্তচরদের সাজা দেওয়া হচ্ছে সে-খবর ততক্ষণে সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের সাজা দেখবার জন্য আরক্ষালয়ে মানুষের ভীড় জমে উঠেছে। কেউ বলছে, কেমন ঢীট্, ধরা পড়েও স্বীকার পাচ্ছে না। কেউ বলছে, কি জানি হতেও পারে সত্যিকার শ্রমণ। ধরা পড়ে অযথা নির্যাতন সহ্য করছে।

সেই সময় সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন সাধ্বী জয়ন্তী ও সোমা।

জয়ন্তী ও সোমা অস্থিক গ্রামের নৈমিত্তিক উৎপলের বোন। সাধ্বীধর্ম গ্রহণ করে প্রব্রজন করতে করতে তাঁরা চোরাকে এসে আছেন কয়েক দিন।

আরক্ষালয়ের পাশে মানুষের ভীড় দেখে তাঁরাও সেদিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর সমস্ত শুনে অপরাধীদের জল হতে টেনে তুলতে বললেন।

জয়ন্তী ও সোমাকে শ্রদ্ধা করে আরক্ষকেরা। তাই তাঁদের কথায় তারা বর্দ্ধমানকে কূয়োর ভেতর হতে টেনে তুলল।

জয়ন্তী ও সোমা বর্দ্ধমানকে একবার দেখেছিলেন শূলপাণি যক্ষায়তনে। তাই দেখা মাত্রই তাঁকে চিনতে পারলেন। তখন আরক্ষকদের দিকে চেয়ে বললেন, এ কি করেছ তোমরা ? এঁকে কী তোমরা চেন না ? ইনি ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুরের রাজপুত্র। প্রব্রজ্যা নিয়ে এখন সর্বত্র বিচরণ করে বেড়াচ্ছেন ছদ্মস্থ

অবস্থায়। এঁর আত্মিক শক্তি অপরিসীম। তাই শীঘ্র এঁদের মুক্ত করে এঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর।

,আরক্ষকেরা তখন ভয় পেয়ে তাঁদের বন্ধন মুক্ত করে দিয়ে বর্দ্ধমানকে বলল, দেবার্য, আপনি কে তা না জেনে আপনাদের ওপর আমরা অত্যাচার করেছি। আমাদের অজ্ঞানকৃত এই অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন।

বর্দ্ধমানের অবশ্য ক্ষমা করবার কিছু ছিল না। ক্রুদ্ধ হলে তবেই ত ক্ষমা। বর্দ্ধমান ক্রুদ্ধই হন নি।

বর্দ্ধমান এখন সর্বত্র সর্বদা ক্ষমা ভাব অর্জন করেছেন। তাই সকলের প্রতি তাঁর মৈত্রী ভাব। এমন কি যে তাঁকে নির্যাতন করছে তার প্রতিও।

তবুও হাত তুলে তাদেরকে আশ্বস্ত করে বর্দ্ধমান পৃষ্ঠচম্পার পথ নিলেন।

পৃষ্ঠচম্পাতেই বর্দ্ধমান যাপন করলেন তাঁর প্রব্রজ্যা জীবনের চতুর্থ বর্ধাবাস।

এবারের চাতুর্মাস্যে বর্দ্ধমান একদিনও আহার গ্রহণ করলেন না। বীরাসনে নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে নিশিদিন অতিবাহিত করলেন।

চাতুর্মাস্য শেষ হতে পৃষ্ঠচম্পা হতে তাঁরা এলেন কয়ংগলায়।

কয়ংগলায় থাকেন দরিদ্দথেরা পাষণ্ডীরা। তাঁরা সপত্নীক, সারম্ভী ও সপরিগ্রহী।

বর্দ্ধমান তাঁদের দেবায়তনে সেদিন আশ্রয় নিয়েছেন।

দরিদ্দথেরাদের সেদিন রাত্রে কি একটা উৎসব ছিল ও সেই উপলক্ষ্যে রাত্রি জাগরণ। সেজন্য তাদের সকলে সেই দেবায়তনে সমবেত হয়েছে।

শুধু সমবেত হওয়াই নয়। এক নৃত্য গীতের আয়োজন করেছে। ধর্ম ধ্যানের মধ্য দিয়ে রাত্রি জাগরণের চাইতে নৃত্য গীতের ভেতর দিয়ে রাত্রি জাগরণ অনেক বেশী সহজ।

বর্দ্ধমান সেই দেবায়তনের এককোণে কায়োৎসর্গ ধ্যানে স্থিত হয়েছেন। তাই তাঁর কিছু চোখে পড়ছে না বা কানে যাচ্ছে না। কিন্তু গোশালক সমস্তই দেখছেন, সমস্তই শুনছেন। দেখছেন যে-রকম বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হয়ে উপস্থিত হয়েছে দরিদ্দথেরা রমণীরা, দেখছেন তাদের হাবভাব বিলাস ও বিভ্রম আর শুনছেন তাদের গান, তাদের সংলাপ। আর ভাবছেন, এর মধ্যে ধর্ম কোথায়? ধর্ম কি বিলাস সর্জনে না বিলাস বর্জনে?

গোশালক চুপ করে থাকতে পারলেন না। বলে ফেললেন সে কথা। বললেন, এর মধ্যে ধর্ম নেই, নেই রাত্রি জাগরণের সার্থকতা। এর চাইতে মীনকেতনের মন্দিরে গিয়ে মদন মহোৎসব অনেক বেশী ভালো ছিল।

কিন্তু সেকথা সহ্য হবে কেন দরিদ্দথেরা পাষণ্ডীদের। তারা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে মন্দির হতে বার করে দিল।

একে শীতের রাত। তার ওপর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে সন্ধ্যার পর-পরই। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। থেকে থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। আর হাওয়া। মনে হয় সে যেন তুষার শীতল মৃত্যুর রাজ্য হতে উঠে এসেছে। সেই হাওয়া গোশালকের অনাবৃত দেহে এসে বিঁধছে!

কিন্তু উপায়?

কাছাকাছি এমন কোন আশ্রয় নেই, যেখানে তিনি চলে যাবেন।

না; সংসারের সমস্তই এমনি। এখানে সত্যের কোনো মূল্য নেই। যে সত্য কথা বলে তাকে এমনি দুর্ভোগ ভুগতে হয়। গোশালকের তখন মনে পড়ে যায় বাসি পর্যুসিত অন্ন গ্রহণ করবে না বলায় ব্রাহ্মণগ্রামে উপানন্দের দাসী যে ভাবে তাঁর গায়ে সেই বাসি পর্যুষিত অন্ন ছুঁড়ে মেরেছিল। পত্তকালয়ে নির্জন অরণ্যে বর্দ্ধমান যখন ধ্যানস্থিত ছিলেন তখন গ্রামপতির পুত্র সেখানে এক ক্রীতদাসীর সঙ্গে কামোপভোগে নিরত হলে তাকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে যে ভাবে তিরস্কৃত হয়েছিলেন। আর আজ?

বাতাসের মুখে গাছের পাতা যেমন থরথর করে কাঁপে গোশালক তেমনি থরথর করে কাঁপছিলেন। তাঁর সেই দুরবস্থা দেখে দরিদ্দথেরাদের মধ্যে যাঁরা একটু বয়স্ক, বয়সে প্রবীণ, তাঁরা গোশালককে ভেতরে ডেকে নিলেন। বাজনাদারদের বললেন, তোরা আরো একটু জোরে জোরে বাজা যাতে ও কিছু বললে কারু কানে না যায়।

গোশালকের আর কোনো কথা বলবারই ইচ্ছে ছিল না। তাই দেবায়তনের এক কোণে গিয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

পরদিন সূর্যোদয় হতেই বর্দ্ধমান শ্রাবস্তীর পথ নিলেন। কিন্তু শ্রাবস্তীতে এসে নগরে প্রবেশ করলেন না, নগরের বাইরেই অবস্থান করলেন।

তারপর দিন সেখান হতে চলে গেলেন হলিদুয় গ্রামে। সেই গ্রামের

বাইরে হলিদ্দুগ নামে এক বিশাল মহীরুহ ছিল। সেই মহীরুহের তলায় সেদিন তাঁরা রাত্রি যাপন করলেন।

শ্রাবস্তী যাবার মুখে একদল সার্থবাহও সেদিন সেই গাছের তলায় রাত্রি যাপন করছে। গভীর রাতে শীতের তীব্রতার জন্যই তারা লতাপাতা একত্রিত করে অগ্নি প্রজ্বালিত করল। তারপর সেই আগুনের চারদিকে বসে তারা রাত্রি অতিবাহিত করল।

পরদিন সকাল হতেই তারা যে যার মতো উঠে চলে গেল। সেই আগুন নিবোবার কথা একেবারেই ভুলে গেল।

ভুলে গেল তাই সেই আগুন শুকনো ঘাসে ধরে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। শেষে বর্দ্ধমান যেখানে কায়োৎসর্গ ধ্যানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে পর্যন্ত বিস্তৃত হল। গোশালক তখন নিকটে ছিলেন না আর বর্দ্ধমানেরো বাহ্য সম্বীতি ছিল না। তাই সেই আগুন বর্দ্ধমানের পা দুটো ঝলসে দিল।

কিন্তু বর্দ্ধমানের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। দেহকে দেহ বলে তিনি আর মনে করেন না। তাই সেই দগ্ধ পা নিয়েই তিনি হেঁটে এলেন নংগলা গ্রামে। দ্বিপ্রহরে সেখানে বাসুদেব মন্দিরে খানিক বিশ্রাম নিয়ে চলে গেলেন আবত্তা। আবত্তায় বলদেব মন্দিরে অবস্থান করলেন।

আবত্তা হতে তাঁরা গেলেন চোরায়। চোরায় হতে কলংবুকা।

কলংবুকার নিকটেই থাকেন শৈলপ মেঘ ও কালহস্তী। কালহস্তী সসৈন্য তখন দুর্বৃত্ত দমনে গমন করছিলেন। পথে বর্দ্ধমান ও গোশালককে দেখে গুপ্তচর ভেবে তাঁদের ধরে মেঘের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

মেঘ একবার বর্দ্ধমানকে ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুরে দেখেছিলেন। তাই তিনি তাঁকে দেখা মাত্রই চিনতে পারলেন ও তাঁদের মুক্ত করে দিলেন।

এই অপ্রত্যাশিত মুক্তিলাভে বর্দ্ধমানের মনে হল এবার তাঁদের অনার্য-দেশের দিকে যাওয়া উচিত যেখানে কেউই তাঁদের পরিচিত নেই। কলংবুকায় এই প্রথম তিনি মুক্তিলাভ করেন নি। এর আগে চোরাকেও তিনি মুক্তি-লাভ করেছেন। এতে কর্ম নির্জরারই বিলম্ব হচ্ছে। তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনা হতে হবে আরো কঠোর, তপস্যা আরো তীব্র।

বর্দ্ধমান তাই গোশালককে সঙ্গে নিয়ে আর্যসীমা অতিক্রম করে পথহীন রাঢ়প্রদেশে প্রবেশ করলেন।

সেকালে রাঢ়প্রদেশ অনার্য দেশ বলেই পরিগণিত হত। তা ছিল আর্যপরিধির বাইরে।

সেই দুর্গম রাঢপ্রদেশের বজ্র ও সুব্‌ভ ভূমিতে বর্দ্ধমান ও গোশালক দীর্ঘদিন প্রব্রজন করলেন। প্রব্রজন কালে তাঁদের বহুবিধ বিপদের সম্মুখীন হতে হল। বালু ও কঙ্করময় ভূমিতে অবস্থান করতে হল।

রাঢ়দেশের অধিবাসীরা রুক্ষ ও শুষ্ক ভোজী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল। তাই রাঢ়প্রদেশে তাঁদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হল।

সেখানে তাঁরা রুক্ষ, শুষ্ক ও অল্পপরিমিত আহারই প্রাপ্ত হতেন। কুকুরেরা তাঁদের ওপর উৎপতিত হত, দংশন করত। কুকুরের আক্রমণ হতে কেউ তাঁদের রক্ষা করত না বরং চুচু শব্দ করে আরো লেলিয়ে দিত।

রাঢদেশের গ্রামগুলি দূরে দূরে অবস্থিত ছিল, তাই রাত্রিতে অবস্থানের জন্য তাঁরা প্রায়ই গ্রাম পর্যন্ত পৌছতে পারতেন না। পৌছলেও গ্রামবাসীরা গ্রামে তাঁদের প্রবেশ করতে দিত না। প্রহার করে গ্রাম হতে দূর করে দিত। কখনো ঢিল, কখনো নরকপাল, কখনো কলসীর কানা ছুঁড়ে মারত। কখনো ঠেলে ফেলে দিত। কখনো বা ওপরে তুলে নীচে গড়িয়ে দিত। বুকের ওপর বসে মাথার চুল ছিঁড়ে নিত। গায়ে মুখে ধূলোবালি ছড়িয়ে দিত। শরীর হতে মাংস কেটে নিত। শরীরের প্রতি মমত্বহীন তাঁরা এসব অত্যাচার বিনম্রভাবে সহ্য করতেন।

সহ্য করবার জন্যইত বর্দ্ধমান ব্রাত্য, অন্ত্যজ, দস্যুভূয়িষ্ঠ রাঢ়প্রদেশে এসেছেন।

স্বর্ণ ততই উজ্জল হয়ে ওঠে যতই তাকে দগ্ধ করা যায়। বর্দ্ধমানও তেমনি এই সমস্ত দুঃখকষ্ট সহ্য করে কর্ম নির্জরার ভেতর দিয়ে আরো উজ্জল হয়ে উঠেছেন। আরো প্রদীপ্ত।

অনার্যদেশ পরিভ্রমণ তখনো তাঁদের শেষ হয়নি। এমন সময় নেমে এল বর্ষা। ঘন কৃষ্ণ বর্ষা।

বর্দ্ধমান তাই অনার্যপ্রদেশ পরিত্যাগ করে ফিরে এলেন আর্য দেশের পরিধিতে। পঞ্চম বর্ষাবাস তিনি ভদ্দিয়া নগরীতে ব্যতীত করবেন।

মলয় দেশের রাজধানী এই ভদ্দিয়া। এই চাতুর্মাস্যেও বর্দ্ধমান আহার গ্রহণ করলেন না। যোগানুষ্ঠান ও ধ্যান সমাহীতিতেই সমস্ত সময় অতিবাহিত করলেন।

ঘরের ভেতর কে ও?

আমরা শ্রমণ—গোশালক ভেতর হতে প্রত্যুত্তর দিলেন।

বাইরে বেরিয়ে এস।

ভদ্দিয়ায় চাতুর্মাস্য শেষ করে বর্দ্ধমান এলেন কদলী সমাগম। কদলী সমাগম হতে জংবায়, জংবায় হতে কুপীয়। কুপীয়য় এক নির্জন পোড়ো ঘরে তাঁরা রাত্রি যাপন করছেন।

কিছুক্ষণ আগে সেখানে এসেছিল এক কামাসক্ত নারী। নানারকম হাবভাবে সে তাঁদের প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু যখন কোনো রকমেই সে তাদের বিচলিত করতে সমর্থ হয়নি তখন আরক্ষালয়ে গিয়ে আরক্ষকদের সে খবর দিয়ে এসেছে। দুজন গুপ্তচর গ্রামের প্রত্যন্তে অবস্থিত পোড়োঘরে এসে অবস্থান করছে।

আরক্ষকেরা তাই তাঁদের খবর নিতে এসেছেন।

গোশালক বাইরে বেরিয়ে এলেন। বর্দ্ধমানও।

শ্রমণ? এখন আরক্ষালয়ে চল। কাল সকালে দেখা যাবে।

সকালে তাঁদের ওপর অত্যাচার করে তথ্য বার করবারই উপক্রম হচ্ছিল। এমন সময় সেখানে এসে পড়লেন সাধ্বী বিজয়া ও প্রগলভা। এঁরা পার্শ্বনাথ শ্রমণ সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের মুক্ত করিয়ে নিলেন।

কিন্তু গোশালক আর বর্দ্ধমানের সঙ্গে থাকতে চাইলেন না। বর্দ্ধমানের সঙ্গ ত্যাগ করবার কথা তিনি অনেকদিন হতেই ভাবছিলেন। বিশেষ করে অনার্য দেশ হতে ফিরে আসার পর হতে। সেখানে তাঁকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, অনেক লাঞ্ছনা ও অপমান। এত কষ্ট কী মানুষের শরীরে সহ্য হয়! প্রকৃতির বা দংশ মশকের অত্যাচারই নয়, মানুষের কৃত উৎপীড়ন! যেখানে শ্রমণদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা নেই সেখানে কেনই বা যাওয়া? গোশালক তাই মনে মনে ভাবেন এ সমস্তর জন্য যেন বর্দ্ধমানই দায়ী।

তিনি আপদে বিপদে তাঁকে রক্ষাত করেনই না বরং এমন সব জায়গায় নিয়ে যান যেখানে ভিক্ষেই পাওয়া যায় না বা যেখানে শারীরিক পীড়ন সহ্য করতে হয়। তবে আর তিনি কি সুখে তাঁর অনুসরণ করবেন?

গোশালক সেই কথাই বললেন বর্দ্ধমানকে। বললেন, ভগবন্, আপনার সঙ্গে থেকে আমার সুখ নেই। আমি স্বতন্ত্র বিচরণ করতে চাই।

সুখ?

কিন্তু বর্দ্ধমানও বা কিভাবে তাঁকে সুখ দিতে পারেন? তার জন্যত সংসার। সেখানে যেমন দুঃখ আছে তেমনি সুখও। অবশ্য সে সুখ নিত্য নয়, আত্যন্তিকও নয়। কিন্তু সে সুখত বর্দ্ধমান গোশালককে দিতে পারেন না। তিনি যা দিতে পারেন তা আনন্দ।

আনন্দ সুখ নয়। সুখ দুঃখ বিরহিত একটী অবস্থা। যখন সর্বত্র সম।

প্রব্রজ্যা নেবার সময় এই সমভাবই বর্দ্ধমান গ্রহণ করেছিলেন। আজ হতে সর্বত্র আমি সম হব। সুখে দুঃখে, শীতে গ্রীষ্মে, মানে অপমানে।

সাধনার সিদ্ধি যখন সমদর্শনে সাধন অবস্থায় সাধুকে তাই সর্বত্র সমদর্শী হতে হয়। অবহেলা-নিন্দা-তর্জন-তাড়নায় সমান অবিচলিত থাকতে হয়।

বর্দ্ধমান তাই-ই আছেন। সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম, মান অপমান সমস্ত কিছুকে তিনি সমভাবে গ্রহণ করে চলেছেন। তাঁর কারো প্রতি দ্বেষ নেই, না অনুরাগ। প্রতিকূল উপসর্গ উপস্থিত হলেও তাই তিনি তার নিবারণ করেন না বা নিরাকরণ।

কিন্তু সুখ দুঃখের এই বৈপরীত্যকে কি সকলে সমভাবে গ্রহণ করতে পারে? নির্দ্দন্দ্ব হতে পারে?

পারে না। কারণ এর জন্য চাই অসীম বল, ধৈর্য ও সাহস। যার বল, ধৈর্য ও সাহস নেই সে এই সংযমভার বহন করতে সমর্থ হয় না।

শীতের দিনে শীতের প্রকোপে সে তেমনি কাতর হয় যেমন কাতর হয় কোনো রাজ্যভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়।

গ্রীষ্মের দিনে তপন তাপে সে তেমনি সন্তপ্ত হয় যেমন সন্তপ্ত হয় স্বল্প জলে মীন।

দংশ মশকের জ্বালা ও তৃণশয্যার রুক্ষ স্পর্শ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে সে

তখন মনে করে পরলোক আমি প্রত্যক্ষ করিনি কিন্তু মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করছি।

অনার্য পুরুষের অত্যাচার বা অজ্ঞানের 'এ চর', 'এ চোর' এই সন্দেহে, বন্ধনে, পীড়নে সে বন্ধু-বান্ধবের কথা স্মরণ করে, যেমন স্মরণ করে ক্রোধবশে গৃহ পরিত্যাগ করে আসা পৌর স্ত্রী।

তবু বর্দ্ধমান গোশালককে নিবারণ করলেন না। বললেন, গোশালক, যেমন তোমার অভিরুচি।

গোশালক তাই বর্দ্ধমানের সঙ্গ ত্যাগ করে রাজগৃহের পথ নিলেন। আর বর্দ্ধমান? বর্দ্ধমান এলেন বৈশালী।

বৈশালীতে এক কর্মকারশালায় তিনি আশ্রয় নিলেন।

[ক্রমশঃ

জৈন সন্ত-সাহিত্য

হিন্দী সন্ত সাহিত্যের কথা আমাদের জানা আছে। দাদূ, কবীর, নামদেব, মীরাবাঈ, রৈদাস—এঁদের রচনার সঙ্গে কমবেশী আমরা সকলেই পরিচিত। কিন্তু এঁদের রচনার মতো রচনা জৈন সাহিত্যেও বিরল নয়। তেমনি ভাব-ঘন, তেমনি উদার, ও ভক্তিমূলক, অনুভবসিদ্ধ ও সার্বজনীন। কিন্তু তাঁদের কথা আমরা জানি না। এর কারণ এঁদের রচনার সঙ্গে কেউ আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় নি। দাদূ, কবীর, নামদেব, এঁদের নাম আমরা হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস হতে পেয়েছি। কিন্তু যাঁরা হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন তাঁরা জৈন কবিদের উপেক্ষা করে সেই ইতিহাস রচনা করেছেন। অথচ হিন্দী সাহিত্যের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে জৈন কবি ও সাহিত্যিকদের রচনা সম্ভার।

সন্ত সাহিত্যের কথাই ধরা যাক্। সন্ত সাহিত্যের রচনা কাল বিক্রম পঞ্চদশ শতক হতে উনবিংশ শতক। জৈন সন্ত সাহিত্যের রচনাকালও তাই। তবু এর সূত্রকে যদি আমরা অনুসরণ করতে চাই তবে অপভ্রংশ যুগেও চলে যেতে পারি। অপভ্রংশেও এমন এক বিরাট সাহিত্য রয়েছে যার খবর কিছুদিন আগেও আমরা জানতাম না। যে সন্ত সাহিত্যের কথা বলছি তার আদর্শ ও কাঠামো আমরা অপভ্রংশ কালেও পাই। অপভ্রংশ যুগের সন্ত সাহিত্য-ধর্মী কবিদের মধ্যে আমরা মুনি রামসিং ও জোইন্দুর নাম উল্লেখ করতে পারি। এঁরা দু'জনেই জৈন কবি। জোইন্দুর সময় আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক। এঁর গ্রন্থ 'পরমাত্ম প্রকাশ' প্রধানতঃ আত্মোপলব্ধি, জ্ঞানতত্ত্ব ও কর্মবাদের চর্চায় পূর্ণ।

জোইয় নিয়মণি নিম্মলএ পরদীসই সিউ সংতু।
অংবরি নিম্মলি ঘণ রহিএ ভাণুজি জেম ফুরংতু॥

হে যোগী, নিজের মন নির্মল করে নিলেই শান্ত শিবের দর্শন হয়। তখন মেঘশূন্য নির্মল আকাশে সূর্যের প্রকাশের মতোই তিনি প্রকাশিত হন।

রায় দোস বে পরিহরিবি জে সম জীব ণিয়ংতি।
তে সম ভাবি পরিঠ্ঠিয়া লহু ণিব্বাণু লহংতি ॥

রাগ-দ্বেষ পরিহার করে যিনি সমস্ত প্রাণীকে একরূপ দেখেন এবং যিনি সেই সমভাবে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তিনি শীঘ্রই নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

সত্তু বি মিত্তু বি অপ্পু পরু জীব অসেসু নি এই।
এক্কু করেবিণু জো মুণই সো অপ্পা জাণেই ॥

যে মুনি শত্রু মিত্র, আপন পর সকল জীবের প্রতি একরূপ ব্যবহার করেন তিনি নিজেকে জানেন।

মুনি রামসিং জোইন্দুর পরবর্তী যুগের কবি। আনুমানিক খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী। এঁর রচনা 'পাহুড় দোঁহা' অনেকটা 'পরমাত্ম প্রকাশে'র মতো।

জসু জীবংতহং মণু মুবউ পচেন্দিয়হং সমাণু।
সো জাণিজ্জই মোক্কলউ লদ্ধউ পহু নিব্বাণু ॥

বেঁচে থাকতেই যাঁর মন পঞ্চেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মরে গেছে, তিনিই মুক্ত, তিনিই নির্বাণ-পথ-প্রাপ্ত।

হউং সগুণী পিউ নিগ্গুণই নিল্লখন্নুনীসংগু।
একহি অগি বসং তয়ংহ মিলিউন অংগহি অংগু ॥

আমি সগুণ কিন্তু আমার প্রিয়তম নির্গুণ, লক্ষণ-রহিত ও নিঃসঙ্গ। একই ঘরে বাস করা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে মিলিত হতে পারলাম না।

মুংডিয় মুংডিয় মুংডিয়া।
সিরু মংডিউ চিত্তু ন মুংডিয়া ॥
চিত্তহং মংহমু জিং কিয়উ।
সংসারহং খংডমু তিং কিয়উ ॥

হে মুণ্ডি, তুমি তোমার মাথাই মুড়িয়েছ, চিত্ত মুড়াও নি। যিনি চিত্তকে মুড়িয়েছেন তিনি সংসার বিনষ্ট করেছেন।

সন্ত কবীরাদির রচনাও এই ধরণের। তাঁদের বিষয় ও রচনাশৈলীও এই প্রকারের।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতক হতে উনবিংশ শতকের মধ্যে যে সমস্ত জৈন সন্ত কবি জন্ম গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সকলের পরিচয় দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবে তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিশিষ্ট তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও কৃতির এখানে উল্লেখ করব।

এঁদের মধ্যে প্রথমেই সময়সুন্দরের নাম করতে হয়। জন্ম ১৬২০ বিক্রমাব্দ। ইনি খরতর-গচ্ছাচার্য আকবর-প্রতিবোধক যুগপ্রধান জিনচন্দ্র সূরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এঁর 'অষ্টলক্ষী' গ্রন্থ জৈন সাহিত্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এঁর গ্রন্থ সংখ্যা পঁচিশ। এঁর যেমন সংস্কৃত, প্রাকৃত, গুর্জর, রাজস্থানী, হিন্দী ও সিন্ধি ভাষায় অধিকার ছিল, তেমনি ছন্দ, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষেও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। এঁর রচনার উদাহরণ:

কোঁ্য ন ভয়ে হম মোর বিমলগিরি
কোঁ্য ন ভয়ে হম মোর।
কোঁ্য ন ভয়ে হম শীতল পানি,
সীঁচত তরুবর ছোর॥
অহনিশ জিনজী কে অঙ্গ পখালন
তোড়ত করম কঠোর।

বিমলগিরিতে (শত্রুঞ্জয় পাহাড়, পালিতানা) কেন আমি ময়ূর হয়ে জন্মালাম না? কেন আমি হলাম না সেখানকার শীতল জল? তাহলে সেই জলে তরুমূল সিঞ্চিত হত। প্রক্ষালিত হত জিন অঙ্গ। তাতে আমার কর্ম বন্ধনের ক্ষয় হত।

সময়সুন্দরের সঙ্গে সঙ্গে জিনরাজ সূরীরও নামোল্লেখ করতে হয়। ইনি সপ্তদশ শতকের উত্তরার্দ্ধের কবি ও সময়সুন্দরের দীক্ষাগুরু জিনচন্দ্র সূরীর প্রশিষ্য। এঁর রচনার উদাহরণ:

কবহুঁ মই নীকই নাথ ন ধ্যায়উ।
বালাপণ নিত ইতউত ডোলত
ধরমক কউ মরম ন পয়উ॥

জোবন তরুণীতন্থ রেবা তট
মন-মাতঙ্গ মায়উ।
বুঢ়াপণি সব অঙ্গ শিথিল ভএ
লোভই পিণ্ড ভয়াওউ ।।

কখনও আমি ঠিক মতো তাঁর ধ্যান করি নি। বাল্যকাল এদিক ওদিক করতেই গেল। ধর্মের কোনো মর্মই পেলাম না। যৌবনে তরুণী দেহরূপ রেবাতটে মন মাতঙ্গ মেতে রইল। এখন বার্দ্ধক্যে সমস্ত অঙ্গ শিথিল। দেহ পিণ্ড কী ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে।

তাঁর কাব্যে শুধু এই কান্নাই নয়, পেয়েছেন তিনি তীর্থংকরের চরণ শরণ, সেই পরম অভীষ্ট। সে কথাও তিনি বলেছেন :

মন মধুকর রহউ রিষভ চরণ অরবিন্দরে।
উড়ায় উড়ই নহী লীনউ গুণ মকরন্দরে ॥

মন মধুকর ঋষভদেবের চরণারবিন্দে মুগ্ধ হয়ে রইল। ওড়ালেও ওড়ে না। তাঁর গুণরূপ মকরন্দপানে সে মত্ত।

কবি বনারসীদাসও সপ্তদশ শতকের কবি। জন্মস্থান জৌনপুর। প্রথম জীবনে শৃঙ্গার রসাত্মক কাব্যই ইনি রচনা করেন কিন্তু পরবর্তীকালে গভীর অধ্যয়ন ও আত্মবিচারের ফলে এঁর চিন্তাধারায় যে পরিবর্তন আসে তার ফলে এঁর কাব্য শান্ত-রসাশ্রয়ী হয়। ইনি যে কেবল সন্ত কবিদের শৈলীতেই লিখতেন তা নয়, তাঁকে তাঁর কাব্যে সমকালীন সুন্দর দাসের মতো দৃঢ় দার্শনিক তত্ত্বেরও স্পষ্টীকরণ করতে দেখা যায়। যেমন :

চেতন তূঁ তিহুঁ কাল একেলা।
নদী নাব সংযোগ মিলৈ জোঁ।
তোঁ্যা কুটুম্বকা মেলা ॥
অহ সংসার অসার রূপ সব
জোঁ অহ পেখন খেলা।
সুখ সম্পত্তি শরীর বুদ্বুদ
বিনশত নাহীঁ বেলা ॥

চেতনারূপী আত্মা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তিন কালেই একেলা। যেমন নদী ও নৌকার সংযোগ তেমনি আত্মীয় পরিজনের মিলন। এই সংসারের সমস্তই অসার যেমন প্রেক্ষাগৃহের অভিনয়। সুখ, সম্পত্তি ও শরীর জলবুদ্বুদের মতো, নষ্ট হতে সময় লাগে না।

জ্যোঁ সুবাস ফলফুল মে দহী দুধমে ঘীউ।
পাবক কাঠ পাষাণ মেঁ ত্যোঁ শরীরমে জীউ॥

ফল-ফুলে যেমন সুবাস, দই-দুধে ঘী, কাঠ-পাষাণে আগুন, তেমনি এই শরীরে জীব।

কহত বনারসি মিথ্যা মত তজ
হোয় সগুরুকা চেলা।
তাস বচন পরতীত আন জিয়
হোই সহজ সুরঝেলা॥

বনারসী তাই বলেছেন, সুগুরুর চেলা হয়ে মিথ্যামত পরিত্যাগ কর। তাঁর বাক্যে বিশ্বাস আন, সমস্তই সহজ ও জটিলতাশূন্য হয়ে যাবে।

বনারসী যে কেবল তত্ত্বার্থমূলক পদই লিখেছেন তা নয়, তাঁর কাব্যে প্রেম বিরহের পদও পাওয়া যায়:

মৈঁ বিরহিন পিয়কে অধীন।
যোঁ তলফোঁ জ্যোঁ জল বিন মীন॥

প্রিয়ের অধীনা আমি বিরহিনী জলহীন মীনের মতো ছটফট করছি।

বনারসী তাই বলছেন:

বসো সদা মৈঁ পিয়কে গাঁউ।
পিয় তজ ওর কাঁহা মে জাঁউ॥

আমি সর্বদা প্রিয়র গ্রামেই বাস করি। প্রিয়কে পরিত্যাগ করে আর কোথায় আমি যাব? কারণ

পিয় সুমিরন পিয়কো গুণগান।
য়হ পরমারথ পংথ নিদান॥

প্রিয় স্মরণ ও প্রিয়গুণ গানই পরমার্থের পথ।

বনারসীর রচনা সম্বন্ধে তাই একজন সমালোচক বলেছেন যে জৈন সাহিত্যে ইনি যেন আনন্দঘন গঙ্গা ও জ্ঞানসার যমুনার একত্র মিলন ঘটিয়েছেন।

মিলন যে ঘটিয়েছেন তা এই পদ হতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে :

বাহির দেখুঁ তো পিয় দূর।···
ঘট মহীঁ গুপ্ত রহৈ নিরধার।
বচন অগোচর মনকে পার॥

বাহিরে দেখিত প্রিয় দূরে। ···তিনি নিরাধার তবু এই ঘটের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছেন। তিনি বাক্যের অগোচর, মনের অতীত!

জল তরঙ্গ জ্যোঁ দ্বিবিধা নাহি।

আমি ও প্রিয় জল ও জলতরঙ্গের মতো অভিন্ন।

বনারসী দাসেরই সমকালীন কবি রূপচন্দ। ইনি আগ্রার অধিবাসী ছিলেন। এঁর রচনা পূর্বোদ্ধৃত অপভ্রংশ দোঁহার অনুরূপ।

চেতন চিত পরিচয় বিনা জপ তপ সবৈ নিরত্থ।
কন বিন তুস জিমি ফটকতৈ আবৈ কছুনা হত্থ॥

চেতন আত্মার সঙ্গে পরিচয় ছাড়া জপতপ সমস্তই নিরর্থক। শস্যহীন তুস ঝাড়লে হাতে কিছুই আসে না।

বিক্রম সপ্তদশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধের কবি আনন্দঘন। এঁর অপর নাম লাভানন্দ। এঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম 'আনন্দঘন চৌবিসী'। এঁর রচনায় সন্ত-সাহিত্যের শব্দাবলীর বহুল প্রয়োগ দেখা যায় এবং বিষয়ও তদনুরূপ। এঁর উক্তি সজীব ও অনুভবসিদ্ধ। এঁর রচনা সম্পর্কে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন 'প্রবাসী' ১৩৩৮ এর কার্তিক সংখ্যায় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

রাম কহো রহমান কহো কেউ কান কহো মহাদেবরী।
পারসনাথ কহো কোই ব্রহ্মা সকল ব্রহ্ম স্বয়মেবরী॥
ভজনভেদ কহাবত নানা এক মৃত্তিকা রূপরী॥

রাম বল কি রহমান, কৃষ্ণ বল কি মহাদেব, পার্শ্বনাথ বল কি ব্রহ্মা, সকলেই ব্রহ্ম স্বরূপ। মৃত্তিকা একই, ভাজন ভেদে বিভিন্ন নাম।

এমে জিন চরণে ল্যাউয়েঁ মনা।
এসে অরিহংত কে গুণ গাউয়েঁ মনা॥

এমন জিন চরণে আমি আমার মন অর্পণ করেছি। এমন অরিহন্তদের গুণ আমি গান করি। কারণ

অব হম অমর ভয়ে ন মরেঁগে।
যা কারণ মিথ্যাত দিয়ো তজ
ক্যুকর দেহ ধরেঁগে॥
রাগ দোস জগবন্ধ করত হৈ
ইনকো নাস করেগেঁ॥

এখন আমি অমর হয়েছি তাই আর মরব না। যখন মিথ্যাত্ব বা অবিদ্যাকে পরিহার করেছি তখন কি করে আর দেহ ধারণ করব? রাগ ও দ্বেষ হতে হয় সংসার বন্ধন। এদের আমি নাশ করেছি।

বাস্তবে আনন্দঘনের ভাষা সরল, কিন্তু ভাব গম্ভীর। হৃদয় সরল কিন্তু জ্ঞান গম্ভীর, মস্তিষ্ক সরল কিন্তু তত্ত্ব গম্ভীর।

উপাধ্যায় যশোবিজয় বিক্রম সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের কবি ও গ্রন্থকার। প্রায় ৫০০টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যশোবিজয়ের অনুভব ব্যাপক। তিনি তাঁর রচনাকে সম্ভোগ ও শৃঙ্গারের ভিতর দিয়ে উচ্চ অধ্যাত্ম রাজ্যে নিয়ে গেছেন, সামান্য বিষয়ে অসামান্য আধ্যাত্মিক দ্যোতনা এনেছেন। তাঁর হোরী গীত তার দৃষ্টান্ত।

অবত ধার অধ্যাত্ম শৈলী
আয়ু ঘটত থোরী থোরী।

হোরী খেল, কিন্তু সে খেলা হোক অধ্যাত্মশৈলীতে, আধ্যাত্মিক হোরী খেলা। কারণ আয়ু অল্প অল্প করে কমেই যাচ্ছে।

সমতা সুরজ, সরুচি পিচকারী
জ্ঞান গুলাল সজোরী।

সে হোরী খেলায় সমতা হোক রঙ, চারিত্র্য পিচকারী, জ্ঞান অভ্র-আবীর।

শম দম সাজ বজায় সুঘট নয়
প্রভুগুণ গায় নাচোয়ী।

শম দম রূপ সজ্জায় সজ্জিত হয়ে প্রভুগুণ গান করতে করতে নৃত্য কর।

ভৈয়া ভগবতীদাস অষ্টাদশ শতকের কবি। এঁর রচনায় দৃষ্টান্ত :

আতমরস চাখ্যো মৈঁ অদ্ভুত
পায়ো পরম দয়াল।

আমি অদ্ভুত আত্মরস আস্বাদন করেছি, পেয়েছি সেই পরম দয়ালের সাক্ষাৎকার।

চেতহু চেত সুনোয়ে ভৈয়া
আপহী আপ সংভারো।

হে ভাই শোন, ওঠ, জাগো, নিজেই নিজেকে উদ্ধার করো।

এঁরই সমকালীন কবি ভূধর দাস। এঁর রচনা অনেকটা কবীরের রচনার মতো।

ভগবন্ত ভজন কোঁ্যা ভুলায়ে।
য়হ সংসার রৈনকা সপুনা
তন ধন বারি ববুলায়ে।
ইস জীবনকা কোন ভরসা
পাবক মেঁ তৃণ পুলায়ে॥

প্রভুর ভজন করতে কেন ভুলে গেলে? এই সংসার ঘুমের ঘোরে দেখা স্বপ্নের মতো আর দেহ ধারাপাতোত্থিত জল বুদ্বুদের মতো। এই জীবনের কোনো স্থিরতা নেই, এ যেন আগুনে ফেলা তৃণের পুলিন্দা।

দ্যোনত রায় ভূধরদাসেরই সমকালীন কবি। এঁর রচনার দৃষ্টান্ত :

সাধো ছাঁড়ো বিষয়বিকারী।
জাতৈ তোহি মহাদুখ ভারী॥

সাধু বিষয়রূপ বিকার অতিক্রম কর। তাহলে মহাদুঃখ হতে তুমি পরিত্রাণ পাবে।

এঁর আর একটী পদ :

এসো স্থমিরন কর মেরে ভাই।
পবন থমৈ মন কিতহঁ ন জাই ॥
সো তপ তপো বহুরি নহি তপনা।
সো জপ জপো বহুরি নহি জপনা ॥
সো ব্রত ধরো বহুরি নহি ধরনা।
এসো মরো বহুরি নহি মরনা ॥

হে ভাই, এমন স্মরণ কর যাতে প্রাণ বায়ু স্তম্ভিত হয় ও মন অবিচল। সেই তপস্যা করো যাতে বহু বার তপস্যা করতে না হয়। সেই জপ জপো যাতে বহুবার জপ করতে না হয়। সেই ব্রত ধরো যাতে বহুবার ব্রত ধরতে না হয়। এবং সেই মৃত্যুই মরো যাতে বহুবার মরতে না হয়।

এই পদের সঙ্গে রৈদাসের 'এসো ধ্যান ধরো বনবারী'র আশ্চর্য মিল আছে।

জ্ঞানসার অষ্টাদশ শতকের কবি। এঁর একটী পদ এখানে উদ্ধৃত করি :

সন্তো ঘরমে হোত লড়াই।
কৌন ছুড়াবৈ আই ॥
ঘরকী কহৈ মেরো ঘর নাহী।
পরকীয়া কহৈ মেরো ॥
মেরো মেরো কর কর মর্যো।
কর্যো জগৎকে চেরো ॥

হে সাধু, ঘরেই যখন লড়াই তখন কে আর এসে ছাড়াবে? ঘরনী (শুদ্ধ আত্মা) বলছে, আমার ঘর নেই, পরকীয়া (অহম্) বলছে, এ ঘর আমার। আমার আমার করেই সে মরছে। জগৎকে সে ছারখারে দিল।

কবিবর বুধজনের রচনার একটি দৃষ্টান্ত দেই। এঁর রচনা স্থক্তির মতো :

দুর্জন সজ্জন হোত নাহি রাখো তীরথ বাস।
মেলো ক্যোঁ ন কপুরমেঁ হীঁগ ন হোয় স্থবাস ॥
দুষ্ট কহী স্থনি চুপ রহো বোলৈ হৈব হৈ হান।
ভাটা মারৈ কীচমেঁ ছীট লাগৈ আন ॥

তীর্থবাসে রাখলেও দুর্জন কখনো সজ্জন হয় না। কর্পূরের সঙ্গে হীঙ্ রাখলে যেমন হয় না সুবাসিত। দুষ্ট যদি কিছু বলে তবে শুনে চুপ করে থাক। প্রত্যুত্তর দিলেই হানি। কাদায় ঢিল ছুঁড়লে ছিটে নিজের গায়ে এসে লাগবেই।

কবিবর প্রমোদরুচির জন্ম ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে। ইনি সুযোগ্য কবি ছিলেন। এঁর রচনার নমুনা :

উপশম রস জল অংগ পখালে
সংযম বস্ত্র ধরায়া রে।
ধ্যান শুক্ল মন ধ্যায়া রে ॥

উপশমরূপ জলে অঙ্গ প্রক্ষালন করে সংযম রূপ বস্ত্র ধারণ করেছি। মন শুক্লধ্যানে নিমজ্জিত হয়ে গেল।

জৈন মতে ধ্যান চার প্রকার : আর্ত, রৌদ্র, ধর্ম ও শুক্ল। শুক্ল ধ্যানই শ্রেষ্ঠ ধ্যান। শুক্লধ্যানের দ্বারাই মোক্ষপদ প্রাপ্তি হয়।

এরূপ আরও অনেক জৈন কবি রয়েছেন যাঁদের রচনা আধ্যাত্মিক ভাব-সমৃদ্ধ ও সন্ত সাহিত্যের অনুরূপ। মাত্র যোগীরাজ চিদানন্দের পরিচয় দিয়ে এই আলোচনা এখানেই শেষ করি।

চিদানন্দ যোগমার্গাবলম্বী জৈন সাধু। এঁর পূর্বাশ্রমের নাম কর্পূরচন্দ্র। কথিত হয় যে ভাবনগর হতে এক জৈন গৃহস্থের সঙ্গে ইনি গির্নার তীর্থ পরিদর্শনে যান এবং সেখান থেকে একদিন কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে যান। তারপর লোকালয়ে তাঁকে বড় বিশেষ একটা দেখা যায়নি। যদি বা কখনো লোকালয়ে আসতেন তবে যেমন সহসা আসতেন তেমনি সহসাই অন্তর্হিত হয়ে যেতেন। কিছুদিন আগেও এমন লোক বেঁচেছিলেন যাঁরা চিদানন্দকে দেখেছেন, কিন্তু এর বেশী এঁর সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। এঁর যেমন অলৌকিক শক্তি ছিল, তেমনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য। এঁর পদও খুবই সুললিত।

অব লাগী অব লাগী অব লাগী।
অব লাগী অব লাগী অব পীত পহিরী ॥

অন্তর্গত কী বাত অলী শুন
মুখথী মোপে ন জাত কহিরী।
চন্দ্র চকোর কী উপমা ইন সমে
সাঁচ কহুঁ তোঁহে জাত বহিরী॥
জলধর বুন্দ সমুদ্র সমানী
ভিন্ন করত কোউ তাস মহিরী।
দ্বৈত ভাবকী টেব অনাদি
ছিনমে তাঁকু আজ দহিরী॥
বিরহ ব্যথা ব্যাপত নহি আলী
প্রেম ধরী পিয়ু অঙ্ক গহিরী।
চিদানন্দ চুকে কেম চাতুর
ঐসো অবসর সার লহিরী॥

আমি তার প্রেমে নিমজ্জিত। হে সখি, আমার অনুভবের কথা কি বলব—মুখে তা বলা যায় না। চাঁদ ও চকোরের প্রীতির কথা বলা হয়, কিন্তু সত্যি বলতে কি আমার প্রীতির কাছে তা মনে হয় ফিকে। জলধরের জলবিন্দু সমুদ্রে মিলে গেলে কেউ কি তাকে পৃথক করতে পারে? অনাদি-কালের দ্বৈত ভাব আজ মুহূর্তেই ছিন্ন করেছি। হে সখি, আজ আমার আর বিরহ ব্যথা নেই। কারণ আমি প্রিয়তমের কোল প্রেমপূর্বক গ্রহণ করেছি। চিদানন্দ বলছেন, হে চতুর, তুমি এমন সু-অবসর হেলায় হারিয়ো না। এ হতে পরমার্থসার গ্রহণ করো।

চিদানন্দের পদের এমন এক মাধুর্য আছে যে একবার আরম্ভ করলে তা আর কিছুতেই ছাড়া যায় না। মন আরো আস্বাদন করতে চায়। সেই অনুভূতির অপূর্বতায় ডুবে যেতে চায়।

জৈন শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি

শ্রীপূরণচাঁদ সামসুখা

[শ্রীপূরণচাঁদ নাহার লিখিত 'শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের প্রাচীনতা' প্রবন্ধ শ্রমণ ১ম বর্ষ ১১ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত করা হয়। ঐ বিষয়ক অন্য একটী প্রবন্ধ শ্রীপূরণচাঁদ সামসুখা মহাশয় ২১শে আষাঢ়, ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধটীও আমরা এখানে প্রকাশিত করছি।

—সম্পাদক]

জৈনগণের মধ্যে প্রধান বিভাগ দুইটী—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। অন্যান্য যে সমস্ত বিভাগ আছে তাহা এই প্রধান বিভাগ দুইটীর যে কোনটীর শাখা বিভাগ বলা যাইতে পারে। এই উভয় সম্প্রদায়ই আপনাদেরকে সনাতন জৈনগণের— যাঁহারা প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে 'নির্গ্রন্থ' নামে অভিহিত হইয়াছেন—বংশধর বলিয়া দাবী করেন ও অন্যতরকে অর্বাচীন বলেন।

ঐতিহাসিক বিদ্বদ্গুলীর মধ্যেও এ বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। কেহ কেহ শ্বেতাম্বরকে প্রাচীন ও দিগম্বরকে অর্বাচীন; আবার অন্য কেহ দিগম্বরকে প্রাচীন ও শ্বেতাম্বরকে অর্বাচীন বলিয়া থাকেন। গত ১৩৩৫ সালের চৈত্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল মহাশয় 'জৈন শ্রাবক ও ওশওয়াল' শীর্ষক আলোচনায় শ্বেতাম্বরগণের উৎপত্তি ভগবান মহাবীরের ২০০ বৎসর পরে হইয়াছে লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কোনরূপ প্রমাণ প্রয়োগ বা সমালোচনা করেন নাই। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ আমরা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরগণ পরস্পরের উৎপত্তি সম্বন্ধে কি বলেন তাহার আলোচনা করিব। দিগম্বর আচার্য দেবসেন বিক্রম সম্বৎ ৯০৯ অব্দে 'দর্শনসার' নামক একটী ৫১ শ্লোকের ছোট গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় রচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকে নানা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বিবরণ ও সময় দেওয়া আছে। ইহাতে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোক আছে।

ছত্তিসে বরিস সএ বিক্কম-রায়স্স মরণপত্তস্স।
সোরঠ্ঠে বলহীএ উপ্পন্নো সেবড়ো সংঘো ॥১১
সিরি ভদ্দবাহুগণিনো সীসোণামেন সংতি আয়রিয়ো।
তস্সয় সীসো দুঠ্টো জিন চন্দো মন্দ চারিত্তো ॥১২

অর্থাৎ বিক্রম রাজার মৃত্যুর ১৩৬ বৎসরে সৌরাষ্ট্র দেশের বল্লভী নগরীতে শ্বেতাম্বর সংঘ উৎপন্ন হয়। শ্রীভদ্রবাহুগণির শান্তি আচার্য নামে এক শিষ্য ছিল। তৎ শিষ্য দুষ্ট ও শিথিলাচারী জিনচন্দ্র[১] হইয়াছিল। (এই জিনচন্দ্র কর্তৃক শ্বেতাম্বর সংঘের উৎপত্তি হয়।)

শ্বেতাম্বরগণ বলেন যে :

ছব্বাস সএহিং নবুত্তরেহিং সিদ্ধিং গয়স্স বীরস্স।
তো বোড়িয়ান দিঠ্ঠি রহবীরপুরে সমুপ্পন্না ॥

অর্থাৎ মহাবীর নির্বাণের ৬০৯ বৎসর পরে দিগম্বর সম্প্রদায় রথবীরপুরে উৎপন্ন হয়।

দিগম্বরগণ যে ১৩৬ বিক্রম সম্বৎ বলেন তাহার সহিত শ্বেতাম্বরগণের উক্তি মহাবীর নির্বাণাব্দ ৬০৯ প্রায় মিলিয়া যায়; কারণ ১৩৬ বিক্রম সংবতে ১৩৬+৪৭০=৬০৬ বীরাব্দ হয়। অতএব এই দুই সম্প্রদায় পরস্পরের উৎপত্তির যে সময় বলেন তাহা প্রায় মিলিয়া যাইতেছে এবং তাহা সঠিক বলিয়াই অনুমিত হয়। কিন্তু যে আচার্যগণের দ্বারা উভয় সম্প্রদায় অন্তরের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করেন তাহা কাল্পনিক বলিয়াই মনে হয়। দিগম্বরগণ বলেন যে ভদ্রবাহুর শিষ্য শান্তিচন্দ্র ও তৎশিষ্য জিনচন্দ্র শিথিলাচারী হইয়া প্রথম বস্ত্র পরিধান করিয়া শ্বেতাম্বর সংঘের উৎপত্তি করেন। ইহা সম্পূর্ণ

অসম্ভব। যে ভদ্রবাহুর শিষ্য শান্তিচন্দ্র ছিলেন তিনি পঞ্চম শ্রুত কেবলী প্রথম ভদ্রবাহু, এ রূপই তাঁহারা বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রথম ভদ্রবাহু শ্বেতাম্বর মতে বীর নির্বাণাব্দ ১৭০ বৎসরে ও দিগম্বর মতে ১৬২ বৎসরে স্বর্গগত হন; অতএব তাঁহার শিষ্যের শিষ্য ৬০৬ বীরাব্দের ব্যক্তি হইতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত প্রথম ভদ্রবাহুর শান্তিচন্দ্র বলিয়া কোন শিষ্য ছিলেন না। শান্তি-চন্দ্র ও জিনচন্দ্র নাম কাল্পনিক। খুব সম্ভব এই শ্লোকে উল্লিখিত ভদ্রবাহু প্রথম ভদ্রবাহু নহেন নিমিত্ত-শাস্ত্র-পারগ দ্বিতীয় ভদ্রবাহু। আমরা এ-বিষয়ে যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা করিব। আবার শ্বেতাম্বরগণ যে শিবভূতি নামক আচার্য কর্তৃক দিগম্বর মতের উৎপত্তি হয় বলেন, দিগম্বর বা শ্বেতাম্বর পট্টাবলীতে তাঁহার নাম এ যাবৎ দৃষ্ট হয় নাই—কাজেই ইহাও কাল্পনিক নাম বলিয়া বোধ হয়।

দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর উভয় সম্প্রদায়ের পট্টাবলীতে সুধর্ম ও জম্বু এই দুই নাম ব্যতীত এক ভদ্রবাহু ছাড়া আর কোন নামের ঐক্য নাই। আমরা এ স্থলে ভদ্রবাহু পর্যন্ত উভয় সম্প্রদায়ের পট্টাবলী প্রদান করিলাম :

শ্বেতাম্বর পট্টাবলী[২]			দিগম্বর পট্টাবলী[৩]		
(১)	সুধর্ম	২০ বৎসর	(১)	গৌতম	১২ বৎসর
(২)	জম্বু	৪৪ ,,	(২)	সুধর্ম	১২ ,,
(৩)	প্রভব	১১ ,,	(৩)	জম্বু	৩৮ ,,
(৪)	শয্যম্ভব	২৩ ,,	(৪)	বিষ্ণুধর	১৪ ,,
(৫)	যশোভদ্র	৫০ ,,	(৫)	নন্দিমিত্র	১৬ ,,
(৬)	সম্ভূতিবিজয়	৮ ,,	(৬)	অপরাজিত	২২ ,,
(৭)	ভদ্রবাহু	১৪ ,,	(৭)	গোবর্দ্ধন	১৯ ,,
			(৮)	ভদ্রবাহু	২৯ ,,
		১৭০			১৬২

মহাবীর স্বামীর নির্বাণের পর যদিও গৌতমস্বামী জীবিত ছিলেন তথাপি তিনি সঙ্ঘের অধিনায়ক হইয়াছিলেন শ্বেতাম্বরগণ এরূপ বলেন না। তাঁহাদের মতে মহাবীরের শিষ্য পঞ্চম গণধর সুধর্ম স্বামীই নেতা[৪] হইয়াছিলেন ও তাঁহারই

শিষ্য সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু দিগম্বর পট্টাবলীতে গৌতম স্বামীও ১২ বৎসর পট্ট নায়ক ছিলেন স্বীকার করা হইয়াছে। গৌতম স্বামীকে বাদ দিলে সুধর্ম হইতে উভয় সম্প্রদায়ই ভদ্রবাহুকে ৭ম পট্টধর বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ পট্টধরের বিভিন্ন নাম প্রদান করেন। ভদ্রবাহুর স্বর্গ গমনের সময়েও ৮ বৎসরের পার্থক্য রহিয়াছে। এখন এ স্থলে বিচার্য যে যদি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় মহাবীরের ২০০ বা ৬০০ বৎসর পরে উৎপন্ন হইয়া থাকেন তবে ঐ সময়ের পূর্বে তাঁহারা যে পট্টধরগণের নাম প্রদান করেন তাহাও অলীক হইবে—তবে কি প্রভব, শয্যম্ভব, যশোভদ্র, সম্ভূতি বিজয় ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন? শ্বেতাম্বরগণের 'কল্পসূত্র' নামক গ্রন্থে যে স্থবিরাবলী প্রদত্ত আছে তাহাতে প্রভবাদির গোত্রাদিসহ বিবরণ এমত ভাবে লিখিত আছে যে তাঁহাদের অস্তিত্বে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এতদ্ব্যতীত আমরা আর একটী এরূপ প্রবল প্রমাণ পাইতেছি যে চতুর্থ পট্টধর শয্যম্ভবকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে কোনরূপ সন্দেহ থাকে না। শয্যম্ভব 'কল্পসূত্র' ও অন্যান্য পট্টাবলীতে 'মনগপিয়া' 'মনকের পিতা' বলিয়া উল্লিখিত আছেন। ইঁহার গার্হস্থ্য জীবনে মনক নামে পুত্র হইয়াছিল। মনক অল্পবয়সেই পিতার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে। শয্যম্ভব মনককে অল্পায়ু জানিয়া তাহার পঠনের নিমিত্ত 'দশ-বৈকালিক সূত্র' নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই 'দশ-বৈকালিক সূত্র' অদ্যাবধি উপলব্ধ আছে ও শয্যম্ভবের অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যদি শয্যম্ভব ঐতিহাসিক ব্যক্তি হয়েন তবে প্রভবাদিকেও ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে অনুচিত হইবে না। বর্তমান জৈশলমীর নগরের উত্তর পশ্চিমে ১০ মাইল দূরে কোদ্রব নামক স্থানে একটী শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে যাহাতে ভগবান মহাবীর হইতে দেবর্দ্ধিগণি ক্ষমাশ্রমণ পর্যন্ত আচার্যগণের নামের তালিকা দেওয়া আছে।[৫] এই শিলালিপিতেও আমরা প্রভবাদিরই নাম পাইতেছি। ইহা-দিগকে দিগম্বরগণ স্বীকার করেন না—অতএব যদি ইঁহারা দিগম্বর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত না হয়েন অথচ কাল্পনিক ব্যক্তিও নহেন তবে শ্বেতাম্বর ব্যতীত আর কি হইতে পারেন? শ্রীযুক্ত অমৃত লাল শীল মহাশয়ও উল্লিখিত প্রবন্ধে শ্বেতাম্বরগণ মহাবীরের ২০০ বৎসর পরে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াছেন অথচ

প্রভবকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অতএব শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় ভদ্রবাহুর পরে উৎপন্ন হইয়াছে বলা সত্যের অপলাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। দিগম্বরগণ জম্বু স্বামীর পরে ও ভদ্রবাহুর পূর্বে বিষ্ণুধর, নন্দিমিত্র, অপরাজিত ও গোবর্দ্ধন নামীয় যে চারিজন আচার্যের নাম প্রদান করেন তাঁহাদের ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে অস্তিত্বের প্রমাণ দিগম্বর পট্টাবলীতে নামোল্লেখ ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না।

এখন দেখা যাউক ভদ্রবাহু কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তি। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায় তাঁহাকে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের বলিয়া স্বীকার করেন। ভদ্রবাহুর রচিত 'কল্পসূত্র', 'আবশ্যক নির্যুক্তি' ও অন্যান্য কয়েকটী অঙ্গ গ্রন্থের 'নির্যুক্তি' প্রভৃতি গ্রন্থ আছে, যাহা শ্বেতাম্বরগণ মানেন কিন্তু দিগম্বরগণ মানেন না। দিগম্বরগণ 'ভদ্রবাহু সংহিতা' নামক একটী পুস্তক ভদ্রবাহু স্বামীর রচিত বলিয়া মানেন। কিন্তু ঐ পুস্তক প্রকৃতপক্ষে বহু পরে এমনকি বিক্রম সপ্তদশ শতাব্দীতে কোন ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হইয়াছে। দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীযুক্ত যুগল কিশোর মুখতার মহাশয় 'গ্রন্থ পরীক্ষা' দ্বিতীয় খণ্ড নামক পুস্তকে 'ভদ্রবাহু সংহিতা'র বিশেষ সমালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে এই পুস্তক বিক্রম সংবৎ ১৬৫৭ হইতে ১৬৬৫র মধ্যে কোন সময়ে কোন জৈনেতর' ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হইয়াছে।[৩] কাজেই ভদ্রবাহু স্বামীর রচিত কোন পুস্তক দিগম্বর সম্প্রদায়ের নিকট নাই। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বরগণের মধ্যে যে কয়েকটী বিষয়ে মতভেদ আছে তাহার মধ্যে একটী এই যে শ্বেতাম্বরগণ বলেন যে ভগবান মহাবীর ব্রাহ্মণকুণ্ড গ্রামে ঋষভদত্ত ব্রাহ্মণের ভার্যা দেবানন্দা ব্রাহ্মণীর গর্ভে অবতীর্ণ হন কিন্তু সৌধর্ম নামক প্রথম দেবলোকের ইন্দ্রের আদেশে তাঁহার সৈন্যাধিপতি হরিণৈগমেষী দেবতা দেবানন্দার গর্ভ হইতে মহাবীরকে অপহরণ করিয়া ক্ষত্রিয়কুণ্ডগ্রামের সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়ের ভার্যা ত্রিশলা ক্ষত্রিয়ানীর গর্ভে সঞ্চারিত করেন। দিগম্বরগণ এই গর্ভাপহরণ স্বীকার করেন না। ভদ্রবাহু বিরচিত 'কল্পসূত্রে' গর্ভাপহরণ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

গর্ভাপহরণ মতবাদ যে বহু পুরাতন তাহার প্রমাণ আমরা মথুরার কাঁকালীটীলায় আবিষ্কৃত শিলালিপিতে প্রাপ্ত হইতেছি। এই শিলালিপি শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত 'লেখানুক্রমণী' ১ম খণ্ড, ৩৬

সংখ্যক শিলালিপি ও মিষ্টার ভিনসেণ্ট স্মিথ রচিত *'The Jaina Stupa and other Antiquities of Mathura'* নামক পুস্তকের Plate xviii, পৃ: ২৫-এ বিবৃত আছে। ইহাতে যে চিত্র উৎকীর্ণ আছে তাহা হরিণৈগমেষী কর্তৃক গর্ভাপহরণের চিত্র। ইহা প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দী খৃষ্ট পুর্বাব্দের প্রস্তুত। তীর্থংকরগণের চ্যবন (অর্থাৎ দেবলোকাদি হইতে তথাকার আয়ু পূর্ণ হইলে মনুষ্যগর্ভে অবতরণ), জন্ম, দীক্ষা, কেবলজ্ঞান ও নির্বাণ যে দিবসে ও যে স্থানে হয় সেই দিবস ও সেই স্থানকে জৈনগণ পবিত্র মনে করেন। ঐ সমস্ত দিবস ও স্থানকে 'কল্যাণক' দিবস ও ভূমি বলা হয়। কল্যাণকের চিত্র প্রস্তুত করাইয়া মন্দিরে রাখার পদ্ধতিও আছে। কঁাকালীটীলায় গর্ভাপহরণের যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা চ্যবন কল্যাণকের চিত্র। যে সময় এই চিত্রটী প্রস্তুত করান হইয়াছিল সে সময়ে ভগবান মহাবীরের দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া দেবানন্দার গর্ভে অবতরণ ও ত্রিশলার গর্ভে সংক্রমণের যে বিবরণ আমরা 'কল্পসূত্রে' পাইতেছি তাহা জৈন সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়, নতুবা গর্ভাপহরণের খোদিত চিত্র প্রস্তুত করাইয়া মন্দিরে রাখা হইত না। খৃ: পূ: প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে যখন গর্ভাপহরণ বিবরণের এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ হইয়াছিল তখন উহা যে অন্ততঃ ভদ্রবাহুর সময় পর্যন্তও প্রচলিত ছিল তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। ভদ্রবাহু যে 'কল্পসূত্র' রচনা করিয়াছিলেন তাহা নবম 'পূর্বে'র অষ্টম অধ্যয়ন হইতে সার সঙ্কলন মাত্র। অতএব ইহাতে লিখিত বিষয় সমূহ তাঁহারও পুর্ব হইতে প্রচলিত ছিল এরূপ অনুমান করিয়া লইলে অনুচিত হইবে না। এতদ্ব্যতীত প্রথম অঙ্গ আচারাঙ্গ সূত্রেও গর্ভাপহরণ বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত আছে। এরূপ স্থলে আমরা যদি গর্ভাপহরণ বিবরণকে ভদ্রবাহুরও পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল বলি তবে তাহা অসঙ্গত বিবেচিত হইবে না। গর্ভাপহরণ বিবরণ শ্বেতাম্বরগণ বিশ্বাস করেন কিন্তু দিগম্বরগণ করেন না। অতএব ভদ্রবাহুর এবং তাঁহারও পূর্ব সময়ে শ্বেতাম্বরগণের বিশ্বাসের অনুকূল মত নিগ্রর্ন্থ সম্প্রদায়ে ছিল, ইহাই প্রমাণিত হয়।

দিগম্বরগণ বলেন যে মৌর্য সম্রাট ভদ্রবাহুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া শ্রমণ-ধর্ম অবলম্বন করেন ও দ্বাদশ বৎসরের দুর্ভিক্ষের প্রাকালে ভদ্রবাহুর সহিত দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করিয়া কটবপ্র পর্বতে (শ্রবণ বেলগোলের চন্দ্রগিরি

পর্বতে) দেহত্যাগ করেন। ভগবান মহাবীরের ৬০ বৎসর পরে নন্দ বংশের রাজ্যারম্ভ হয় ও নন্দগণ[১] ১৫৫ বৎসর রাজ্য করেন। নন্দ বংশ ধ্বংস হইবার পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পাটলীপুত্রের সিংহাসনাধিরোহণ করেন। অতএব চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তি ৬০+১৫৫=২১৫ বীর নির্বাণাব্দ বা ৩১২ খৃঃ পূর্বাব্দে হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার মৃত্যু বা রাজ্যত্যাগের সময় ২৮৮ খৃঃ পূর্বাব্দ। কিন্তু ভদ্রবাহুর স্বর্গ গমন দিগম্বর মতে মহাবীরের ১৬২ বৎসর পরে বা ৩৬৫ খৃঃ পূর্বাব্দে ও শ্বেতাম্বর মতে ৩৫৭ খৃঃ পূর্বাব্দে হইয়াছিল। অতএব ভদ্রবাহু ও চন্দ্রগুপ্ত কি করিয়া সমসাময়িক হইতে পারেন? শ্রবণ বেলগোলের শিলালিপি কয়েকটীতে এবং দিগম্বর সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদিতে ভদ্রবাহু ও চন্দ্রগুপ্তের নাম এমতভাবে লিখিত আছে যে ভদ্রবাহু ও চন্দ্রগুপ্ত সমকালীন হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয় অথচ পঞ্চম শ্রুত কেবলী ভদ্রবাহু ও মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময়ে প্রায় ৮০ বৎসরের প্রভেদ রহিয়াছে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে যে-ভদ্রবাহু দাক্ষিণাত্যে চন্দ্রগুপ্তের সহিত গমন করিয়াছিলেন তিনি পঞ্চম শ্রুত কেবলী ভদ্রবাহু নহেন ও তাঁহার নিকট যে চন্দ্রগুপ্ত দীক্ষিত হইয়াছিলেন তিনি মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত নহেন। এই সিদ্ধান্ত শ্রবণ বেলগোলের প্রধান ও সর্বপ্রাচীন শিলালিপি দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। এই শিলালিপিতে[৮] উক্ত আছে যে "...ভগবৎ পরমর্ষি গৌতম গণধর সাক্ষাচ্ছিষ্য লোহার্য জম্বু বিষ্ণুদেব অপরাজিত গোবর্দ্ধন ভদ্রবাহু বিশাখ প্রোষ্টিল কৃত্তিকার্য জয়নাম সিদ্ধার্থ ধৃতষেণ বুদ্ধিলাদিগুরু পরম্পরীণ ক্রমাভ্যাগত মহাপুরুষ সন্ততি সমবদ্যোতিতান্বয় ভদ্রবাহু স্বামীনা উজ্জয়িন্যাম্ অষ্টাঙ্গ মহানিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞেন ত্রৈকাল্যদর্শিনা নিমিত্তেন দ্বাদশসম্বৎসরকাল বৈষম্যমুপলভ্য কথিতে সর্ব সঙ্ঘ উত্তরাপথাৎ দক্ষিণাপথং প্রস্থিতঃ" ইত্যাদি।

[ক্রমশঃ

১ 'দর্শনসার', নাথুরাম প্রেমী কর্তৃক সম্পাদিত, ১১-১৫ শ্লোক, পৃঃ ৭-৮।

২ *An Epitome of Jainism* by Nahar & Ghosh, pp. 658-60.

৩ *The Sacred Books of the Jainas*, Vol. II (*Tattvarthadhigama Sutra*), ed. by J. L. Jaini, Historical Introduction, p. IX.

৪ ভগবান মহাবীরের একাদশ গণধর ছিলেন। যথা: (১) ইন্দ্রভূতি গৌতম, (২) অগ্নিভূতি, (৩) বায়ুভূতি, (৪) আর্যব্যক্ত, (৫) সুধর্ম, (৬) মণ্ডিতপুত্র, (৭) মৌর্যপুত্র, (৮) অকম্পিত, (৯) অচল ভ্রাতা, (১০) মেতার্য ও (১১) প্রভাস। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও অষ্টম গণধর গৌতম গোত্রের ছিলেন কিন্তু প্রথম গণধর ইন্দ্রভূতি সর্বাপেক্ষা বেশী বিখ্যাত বলিয়া গৌতমস্বামী বলিলে ইঁহাকেই নির্দেশ করা হয়। ইন্দ্রভূতি গৌতম ও সুধর্ম ব্যতীত অন্য গণধরগণ ভগবান মহাবীরের জীবিতাবস্থাতেই নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাবীরের নির্বাণের পর প্রথম গণধর গৌতমের ও পূর্বে নির্বাণপ্রাপ্ত নয় গণধরের কোন শিষ্য জীবিত ছিলেন না, কেবল পঞ্চম গণধর সুধর্ম ও তাঁহার শিষ্যগণই ছিলেন। তজ্জন্যই মহাবীরের পর সুধর্মই সমগ্র নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের অধিনায়ক হইয়াছিলেন।—'কল্পসূত্র', স্থবিরাবলী, ২।

৫ *Jain Inscriptions*, Part II. by Nahar, Inscription No. 2574

৬ 'গ্রন্থ পরীক্ষা' (হিন্দী), ভাগ ২, লেখক যুগলকিশোর মুখতার, পৃঃ ৩৯।

৭ 'তিথোগালী পইন্নয়'।

৮ 'জৈন শিলালেখ সংগ্রহ', মানিকচন্দ দিগম্বর গ্রন্থমালার ২৮ সংখ্যক গ্রন্থ। চন্দ্রগিরি পর্বতের লেখ নং ১(১)। Inscription of Chandragiri, *EPigraphia Carnatika*, Vol. II. এই শিলালিপির সময় শকাব্দ ৫২২ (৬০০ খৃঃ অব্দ)।

পুস্তক পরিচয়

১। A Critical Study of Pauma Cariyam : লেখক ডাঃ কে. চন্দ্র : প্রকাশক Research Institute of Prakrit, Jainology and Ahimsa, বৈশালী, ১৯৭০ : পৃষ্ঠা ২৮+৬৪১ : মূল্য ২১. ৫০।

বিমল সূরীর 'পউম চরিয়' জৈন রামায়ণের প্রাচীনতম রূপ ও প্রাকৃত ভাষার প্রথম মহাকাব্য। (জৈন সাহিত্যে রামের নাম পউম বা পদ্ম।) ভাষা দৃষ্টে গ্রন্থটী খৃষ্টীয় ৫ম শতকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থাকারে বিমল সূরীর 'পউম চরিয়' Hermann Jacobi-র সম্পাদনায় ভাবনগর হইতে জৈনধর্ম প্রসারক সভা কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। Prak*rit* Text Society কর্তৃক ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে হিন্দী অনুবাদ সহ ইহা পুনরায় মুদ্রিত হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক বিভিন্ন রাম কথার সঙ্গে বিমল সূরীর রাম কথার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া তৎকালীন ভূগোল, সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছেন ও সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থের ভাষা, ব্যাকরণ, ছন্দ ও অলঙ্কার বিষয়েও আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থটী অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের গবেষণার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ শ্রাবণ ১৩৮১ ॥ চতুর্থ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :

গণেশ লালওয়ানী

ঋষভদেব, পাকবিরয়া, পুরুলিয়া

বর্দ্ধমান-মহাবীর

[জীবন চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

সেই কর্মশালার যিনি অধিকারী তিনি দীর্ঘ দিন রোগ ভোগের পর সেই সেদিনই প্রথম এসেছেন তাঁর কর্মশালায়।

তিনি কর্মশালায় প্রবেশ করতে যাবেন সহসা তাঁর চোখ গিয়ে পড়ল বর্দ্ধমানের ওপর। তিনি শ্রমণ ধর্মের অনুযায়ী ছিলেন না ; তার ওপর দীর্ঘ দিন রোগ ভোগের জন্য একটু ক্লিষ্ট ছিলেন। তাই বর্দ্ধমানকে দেখা মাত্রই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। যা ছিল তাঁর পরম সৌভাগ্যের তাকে অমঙ্গল মনে করে হাতুড়ি নিয়ে তিনি বর্দ্ধমানকে মারতে ছুটলেন।

কিন্তু বর্দ্ধমানের কাছ পর্যন্ত তিনি পৌঁছতে পারলেন না। অত্যধিক রাগের জন্যই হোক বা দুর্বলতার জন্য তিনি কাঁপতে কাঁপতে মাটীতে পড়ে গেলেন এবং সেই যে সংজ্ঞা হারালেন সেই সংজ্ঞা আর ইহ জীবনে ফিরে পেলেন না। সেইখানে সেই ভাবে তাঁর মৃত্যু হল।

সেই দুর্ঘটনার পর বর্দ্ধমান আর সেখানে অবস্থান করলেন না। সেখান হতে চলে এলেন শালীশীর্ষে। সেখানে নগরের বাইরে যে উদ্যান ছিল সেই উদ্যানে এক বৃক্ষতলে ধ্যানস্থিত হলেন।

বর্দ্ধমান যে বৃক্ষতলে ধ্যানস্থিত হলেন সেই বৃক্ষে বাস করে এক নিকৃষ্ট ধরণের অপদেবতা। নাম কটপুতনা।

সংসারে এক ধরণের জীব আছে যারা অন্যের সাফল্যে ঈর্ষ্যান্বিত হয়, তার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করে। এই কটপুতনাও সেই ধরণের। তাই সে যখন বর্দ্ধমানকে ধ্যানের গভীরতায় ডুবে যেতে দেখল তখন সে অকারণ ঈর্ষ্যায় জ্বলে উঠল ও তাঁর ধ্যান ভাঙবার জন্য পরিব্রাজিকার রূপ ধারণ করে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হল ও নানা ভাবে নানা প্রলোভনে তাঁর ধ্যান ভাঙবার

চেষ্টা করল। কিন্তু যখন সে তাতে সফলকাম হল না তখন আরো ক্রুদ্ধ হয়ে মাথার চুল জলে ভিজিয়ে সেই জলকণা তাঁর সর্বাঙ্গে ছিঁটিয়ে দিতে লাগল।

সেই শীত জলকণা বর্দ্ধমানের গায়ে গিয়ে সুঁচের মতো বিদ্ধ হল। কিন্তু বর্দ্ধমান সেই উপসর্গেও বিচলিত হলেন না। যেমন ধ্যান-সমাহিত ছিলেন, তেমনি ধ্যান-সমাহিত রইলেন। ধ্যান-সমাহিত রইলেন তাই তিনি লোকাবধিজ্ঞান লাভে সমর্থ হলেন।

লোকাবধিজ্ঞানে লোকবর্তী সমস্ত পদার্থ হস্তামলকবৎ পরিদৃষ্ট হয়।

আর কটপুতনা? কটপুতনা তখন পরাজিত ও লজ্জিত হয়ে সেই বৃক্ষ পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেল।

কটপুতনা চলে গেল কিন্তু তার পর পরই এলেন গোশালক। গোশালক একাকী পরিব্রাজন করে সুখ পান নি। তাই আবার ফিরে এসেছেন।

বর্দ্ধমান শালীশীর্ষ হতে এলেন ভদ্দিয়ায়। ভদ্দিয়ায় কঠোর যোগ সাধনায় ষষ্ঠ বর্ষাবাস ব্যতীত করলেন।

বর্ষাবাসের পর ভদ্দিয়া হতে বর্দ্ধমান গেলেন মগধভূমির দিকে। সেখানে দীর্ঘ এক বছর বিচরণ করে বর্ষাবাসের আগ দিয়ে এলেন আলংভিয়ায়। আলংভিয়ায় তিনি সপ্তম বর্ষাবাস ব্যতীত করলেন।

বর্ষাবাস ব্যতীত করে আলংভিয়া হতে বর্দ্ধমান এলেন কুণ্ডাক সন্নিবেশ। কুণ্ডাক হতে মদ্দন্ন। মদ্দন্ন হতে বহুসালগ। বহুসালগ হতে লোহর্গলা।

লোহর্গলায় তখন জীতশত্রু রাজত্ব করেন।

যদিও রাজার নাম জীতশত্রু তবু তাঁর শত্রুর অভাব ছিল না। সম্প্রতি প্রতিবেশী এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে তাঁর রাজ্যের ওপর। প্রহরীরা তাই সদা সতর্ক। অপরিচিত কাউকে নগরে প্রবেশ করতে দেয় না। প্রবেশ করবার চেষ্টা করলে বন্দী করে রাজার কাছে উপস্থিত করে।

বর্দ্ধমান ও গোশালকও তাই নগরে প্রবেশ করতে গিয়ে প্রহরীদের হাতে বন্দী হলেন। প্রহরীরা তাঁদের রাজ সভায় উপস্থিত করল।

সেই সময় রাজ সভায় উপস্থিত ছিলেন অস্থিক গ্রামের উৎপল। উৎপল

বর্দ্ধমানকে দেখা মাত্রই চিনতে পারলেন ও উঠে এসে তাঁকে প্রণাম করে জীতশত্রুকে তাঁদের মুক্ত করে দিতে বললেন। বললেন, এঁরা গুপ্তচর নন। ইনি ক্ষত্রিয় কুণ্ডপুরের রাজপুত্র ও ভাবী তীর্থংকর।

সে কথা শুনে জীতশত্রু তখনি তাঁদের মুক্ত করে দিলেন ও প্রহরীদের অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে নিলেন।

লোহর্গলা হতে বর্দ্ধমান এলেন পুরীমতাল, যে পুরীমতালে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমের নিকটবর্তী শকটমুখ উদ্যানে আদিকর ভগবান ঋষভদেব কেবল-জ্ঞান ও কেবল-দর্শন লাভ করেছিলেন।

পুরীমতাল ও শকটমুখ উদ্যান তাই বর্দ্ধমানের কাছেও তীর্থক্ষেত্র। এই শকটমুখ উদ্যানেই না তিনি মরীচি জীবনে প্রথম শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করেন। বর্দ্ধমান তাই শকটমুখ উদ্যানে গিয়ে এক বৃক্ষতলে ধ্যানস্থিত হলেন।

এই পুরীমতালে থাকেন শ্রেষ্ঠী বগ্‌গুর। বগ্‌গুর সেদিন শকটমুখ উদ্যানে ভগবান মল্লীনাথের মন্দিরে পুজো দিতে এসেছেন।

বগ্‌গুর উদ্যানে প্রবেশ করেই বর্দ্ধমানকে দেখতে পেলেন। দেখলেন তীর্থংকরদের মতোই তাঁর আয়ত চোখ, বিশাল বক্ষ, দিব্য বিভা।

বগ্‌গুর তখন একটু দ্বিধায় পড়ে গেলেন। তিনি এখন কার পুজো দেবেন? ভগবান মল্লীনাথের না জীবন্তস্বামীর?

বগ্‌গুরের মনের মধ্য হতে তখন কে যেন বলে উঠল, বগ্‌গুর, স্বয়ং তীর্থংকর যখন তোমার সামনে উপস্থিত তখন তুমি তীর্থংকর মূর্তিতে কেন পুজো দেবে?

বগ্‌গুর তখন বর্দ্ধমানের পায়ের কাছে তাঁর পূজার্ঘ নিবেদন করে ফিরে গেলেন।

বর্দ্ধমান কিছুকাল সেখানে অবস্থান করলেন। তারপর উন্নাগ ও গোভূমি হয়ে এলেন রাজগৃহ।

রাজগৃহে তিনি অষ্টম বর্ষাবাস ব্যতীত করলেন।

রাজগৃহ হতে বর্দ্ধমান আবার গেলেন অনার্য ভূমির দিকে। এখনো তাঁর অনেক ক্লিষ্ট কর্ম রয়েছে যাকে ক্ষয় করবার জন্য তাঁকে আরো অনেক

দুঃখ বহন করতে হবে আরো করতে হবে কঠিন তপশ্চর্যা। তাই তিনি চলে এলেন রাঢ় দেশের বজ্জ ও সুম্হ ভূমিতে।

সে বছর তিনি অনার্য ভূমিতেই পরিভ্রমণ করলেন। এমন কি যখন নেমে এল বর্ষা তখনো তিনি আর্য ভূমিতে ফিরে গেলেন না, সেইখানেই রয়ে গেলেন।

কিন্তু সেখানে কে দেবে তাঁকে আশ্রয়? তাই বৃক্ষতলেই যাপন করতে হল তাঁকে সেই চাতুর্মাস্য।

এ অঞ্চলে চলে প্রায় একটানা বর্ষা। কড় কড় করে পড়ে বাজ, ঝম ঝম করে জল। আকাশ আর মাটি একাকার হয়ে যায় যখন বাতাসে বৃষ্টিতে চলে প্রলয়ের তাণ্ডব। কিন্তু বর্দ্ধমান নির্বিকার। দুরন্ত শ্রাবণের ধারাপাত তাঁকে নিরুদ্যম করতে পারে না, নিরুৎসাহ করতে পারে না প্রবল ঝটিকার আবর্ত। তিনি সে সমস্তই বিশাল মহীরুহের মতো সহন করেন।

সহন করেন তাই তিনি আরো প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন।

তারপর একদিন কেটে যায় বর্ষার বাধাও' দিগন্ত ফিরে পায় তার প্রসারতা। গ্রামের সীমান্তে ঢেউ দিয়ে যায় ধান্য মঞ্জরীর সোনালী রঙ্। রমণীয় হয় পাদপের ছায়া। শিউলি ফুলের সুবাসে মন্থর হয় ভোরের বাতাস।

কিন্তু মন্থর হয় কি মানুষের মন?

হয় বৈ কি?

যদিও তারা নির্যাতন করেছে বর্দ্ধমানকে, দেয় নি থাকবার আশ্রয় তবু যখন দেখল তারা তাঁর অবিচল ধৈর্য, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন, তাদের চোখের দৃষ্টি যখন গিয়ে পড়ল বর্দ্ধমানের সৌম্য মধুর মুখের ওপর, করুণার রসে যা সিক্ত, ক্ষমার ঔদার্যে যা উদ্ভাসিত তখন তাদের ক্রূরতা যেন আপনা হতেই বিগলিত হতে চাইল। চোখ দুটো হয়ে উঠল বাষ্পসিক্ত।

বর্দ্ধমান এইজন্যই এসেছিলেন অনার্য দেশে। কর্ম নির্জরার সঙ্গে সঙ্গে জয় করলেন তিনি তাদের হৃদয়। জয় হয়েছে তাঁর। জয় হয়েছে তাঁর অসীম ক্ষমার।

বর্দ্ধমান শরৎকালও সেখানে ব্যতীত করলেন। তারপর চাতুর্মাস্য শেষ হতে ফিরে গেলেন আবার আর্য ভূমিতে।

[ক্রমশঃ

উপনিষদ ও শ্রমণ সংস্কৃতি

মুনি নথমল

ভারতীয় সাহিত্যের দুই ধারা—বৈদিক ও শ্রামণিক। জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যকে শ্রামণিক (শ্রমণ পরম্পরার অন্তর্গত) ও অবশেষ সমস্ত সাহিত্যকে বৈদিক বলা হয়। কিন্তু এই বিভাজন সম্পূর্ণ নির্দোষ নয়। কারণ প্রাচীনকালে শ্রমণদের অনেক সম্প্রদায় ছিল। যেমন: জৈন, বৌদ্ধ, আজীবিক, গৈরিক, তাপস, ইত্যাদি।[১] মূলাচারের মতে রক্তপট, চরক, তাপস পরিব্রাজক, শৈব, কাপালিক আদি সম্প্রদায়ও অবৈদিক সম্প্রদায়।[২] সাংখ্য দর্শন বৈদিক ধারার প্রবল বিরোধী ছিল। কঠ, শ্বেতাশ্বতর, প্রশ্ন, মৈত্রায়ণীর মতো প্রাচীন উপনিষদ সাংখ্য দর্শনের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত।

কালপ্রবাহে আজীবিক সম্প্রদায় আজ সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। কিন্তু তাদের সাহিত্য সম্পূর্ণ লুপ্ত নয়। সংরক্ষকের অভাবে তাদের স্বতন্ত্র সাহিত্য না থাকলেও সেই সাহিত্য বৈদিক ও অবৈদিক ধারায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গৈরিক, তাপস আদি সম্প্রদায় সম্বন্ধেও সেকথা বলা যায়। তারা বৈদিক পরম্পরায় বিলুপ্ত হলেও তাদের সাহিত্য বৈদিক সাহিত্যে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত নয়। তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আজো সেখানে পরিদৃষ্ট হয়।

স্থানাঙ্গ সূত্র হতে জানা যায় যে ভগবান মহাবীরের সময়ে সাহিত্যকে তিন ভাগে ভাগ করা হত। (১) লৌকিক, (২) বৈদিক ও (৩) সামায়িক বা শ্রামণিক।[৩] রাজনীতি, অর্থনীতি ও কামশাস্ত্র লৌকিক সাহিত্যের অন্তর্গত ছিল। বৈদিক সাহিত্যের বিষয় ছিল ঋক, যজুঃ ও সাম। জ্ঞান, দর্শন ও চারিত্রমূলক গ্রন্থ ছিল সামায়িক বা শ্রমণ সাহিত্যের অন্তর্গত।

এই বিভাজন হতে দেখা যায় যে বৈদিক সাহিত্যের মুখ্য ভাগ ছিল যজ্ঞ। সমগ্র যজুর্বেদ যজ্ঞের দ্বারাই অনুপ্রাণিত। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এই যজ্ঞ পরম্পরাই আরো বিকাশ লাভ করে।

যাকে ঔপনিষদিক ধারা বলা হয় তাকে বৈদিক না বলে শ্রমণ ধারাই বলা উচিত কারণ তা ছিল যজ্ঞ বিরোধী। তার প্রবাহ ছিল অধ্যাত্ম বিদ্যার দিকে। আমি কে? কোথা হতে এসেছি? কেন এসেছি? কোথায় যাব? এই সব প্রশ্নের বিচার।[৪] এই অধ্যাত্ম বিদ্যা শ্রমণ সাহিত্যের বিষয়।

ত্রিবর্গ বিদ্যা (ধর্ম, অর্থ ও কাম) লৌকিক সাহিত্যের অন্তর্গত।

কোন সাহিত্য কোথা হতে উদ্ভূত হয়েছে তা বিচারের আমাদের এই তিনটাই মাপকাঠি—যজ্ঞ, অধ্যাত্ম ও ত্রিবর্গ। এই তিনটী পরিদৃষ্টে আমরা বলতে পারি কোন সাহিত্য কোন পরম্পরার অন্তর্গত।

আচার্য শঙ্কর যে দশটী উপনিষদের ওপর ভাষ্য রচনা করেছেন, তাদের প্রাচীন উপনিষদ বলা হয়। সেগুলি—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক। ডাঃ ওয়েলবেলকার ও রাণাডের মতে প্রাচীন উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, কঠ, ঈশ, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, মণ্ডুক, কৌষিতকি, কেন ও প্রশ্নই মুখ্য।[৫] এই সব উপনিষদের কতকগুলিতে বেদ ও বৈদিক ধারার প্রতি যে বিরোধ দেখা যায় তা হতে মনে স্বতঃই প্রশ্ন আসে যে এই বেদ-বিরোধী উপনিষদগুলো কী বৈদিক পরম্পরার অন্তর্গত? মণ্ডুকোপনিষদে বেদকে অপরা বিদ্যা বলা হয়েছে। যে বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয় তাই পরা বিদ্যা এবং সে বিদ্যা বেদ হতে ভিন্ন।[৬]

পরা বিদ্যাই অধ্যাত্ম বা আত্মবিদ্যা।[৭] ওঁকার দ্বারা সেই আত্মার ধ্যান করা হয়।[৮] প্রশ্নোপনিষদেও এই ধরণের মনোভাব অভিব্যক্ত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঋগ্বেদের দ্বারা সাধক ভূলোক, যজুঃর্বেদের দ্বারা অন্তরীক্ষ ও সামবেদের দ্বারা তৃতীয় ব্রহ্মলোক লাভ করে। কিন্তু তাদের দ্বারা পরব্রহ্ম লাভ করা যায় না।

একমাত্র ওঁকার ধ্যানের দ্বারাই যে লোক শান্ত, অজর, অমর, অভয় ও পর অর্থাৎ যাকে পরব্রহ্ম বলা হয় তা লাভ করা যায়।[৯] নারদ চার বেদ ও অন্য অনেক বিদ্যার অধিকারী ছিলেন। তিনি সনৎকুমারকে এই কথাই বলে-ছিলেন যে—"ভগবন্, আমি মন্ত্রবিৎ, আত্মবিৎ নই।"[১০] এতে সাধকের মনে বেদের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা ভাবের উদ্রেক করে না। এই মনোভাব মহাভারত এমনকি অন্য পুরাণেও দেখা যায়। সেখানে এমন অনেক জায়গা

রয়েছে যেখানে আত্মবিদ্যা বা মোক্ষলাভের উপায় রূপে বেদের অসারতা প্রতিপাদিত করা হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্যে আচার্য শংকরও এমনি একটী প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেছেন। সেখানে ভৃগু নিজের পিতাকে বলছেন :

ত্রয়ীধর্মমধর্মার্থং কিংপাকফলসন্নিভম্।
নাস্তি তাত সুখং কিঞ্চিদত্র দুঃখশতাকুলে।
তস্মান্মোক্ষায় যততা কথং সেব্যা ময়া ত্রয়ী ॥[১১]

অর্থাৎ, ত্রয়ী ধর্ম অধর্মের হেতু। কিংপাক ফলের মতো তা আপাত-মনোহর। হে তাত, শত দুঃখপূর্ণ (কর্মকাণ্ডে) আমার কিছুই সুখ নাই। তাই যখন আমি মোক্ষের জন্য প্রযত্ন করছি তখন ত্রয়ী ধর্ম কীভাবে সেবন করতে পারি ?

গীতাতেও বলা হয়েছে ত্রয়ী ধর্মে (বৈদিক কর্ম) নিরত সকাম পুরুষ সংসারাগমন হতে মুক্ত হয় না।[১২] যজ্ঞকে যারা শ্রেয় মনে করে তারা মূঢ়।[১৩] আত্মবিদ্যার জন্য বেদের অসারতা ও যজ্ঞের বিরোধে আত্মযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা তাই কোনো অবৈদিক (শ্রমণ) ধারার প্রতিই ইঙ্গিত করে।[১৪]

উপনিষদ যে শ্রমণ ধারার অন্তর্গত তার আর একটী প্রমাণ তাদের শব্দ সাম্য। উপনিষদে এমন অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার প্রয়োগ একমাত্র শ্রমণ পরম্পরাতেই দেখা যায়। যেমন 'কষায়' শব্দটী ছান্দোগ্য উপনিষদে 'রাগ-দ্বেষ' অর্থে ব্যবহৃত।[১৫] জৈন আগম সাহিত্যে কষায় শব্দ এই বিশিষ্টার্থে হাজারো বার ব্যবহৃত হয়েছে যখন এর ব্যবহার বৈদিক সাহিত্যে প্রায় নেই বললেই চলে। মণ্ডুক উপনিষদের 'তায়ী' শব্দ ঐ ধরণের আর একটী শব্দ।[১৬] বৈদিক সাহিত্যে তার ব্যবহার নেই যখন জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে তার প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়।

প্রতিপাদ্য বিষয়ের দৃষ্টিতেও উপনিষদের অনেক সিদ্ধান্তের সঙ্গে শ্রমণ সংস্কৃতির সিদ্ধান্তের ঘনিষ্ঠ যোগ দেখা যায়। মণ্ডুক, ছান্দোগ্য আদি উপনিষদে এমন অনেক জায়গা রয়েছে যাকে শ্রমণ সংস্কৃতির বিচার সরণির সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব বলা যায়। জার্মান পণ্ডিত হার্টেল একথা প্রমাণ করেছেন যে

মণ্ডুকোপনিষদে প্রায়শঃ জৈন সিদ্ধান্তের অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় এবং সেখানে জৈন পারিভাষিক শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত।[১৭]

সেই প্রাচীনকালে বেদ ও উপনিষদের অতিরিক্ত ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক আর একটী সাহিত্য প্রচলিত ছিল যা 'শ্লোক' নামে অভিহিত হত।[১৮] জৈন দ্বাদশাঙ্গের আলোচনায় দেখা যায় যে সেখানে প্রত্যেক অঙ্গে 'শ্লোকে'র সমাবেশ আছে।[১৯] বৈদিক, জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যের অতিরিক্ত ও তৎ-পূর্ববর্ত্তী শ্রমণ সাহিত্য থাকাও অসম্ভব নয়।[২০] তাই মনে হয় যে উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কিত বিবরণ ও শ্লোক কোনো ব্রহ্মবিৎ শ্রমণ পরম্পরা হতে গৃহীত হয়ে থাকবে।

নিগ্রন্থ পরম্পরায় উদ্দালক, নারদ, বরুণ, অঙ্গঋষি (বা আঙ্গিরস), যাজ্ঞবল্ক্য আদি প্রত্যেক-বুদ্ধ হয়েছেন। উপনিষদেও এঁদের নাম পাওয়া যায়।[২১]

কোথাও কোথাও আবার ভাষা সাম্যও দেখা যায়। "যতদিন লোকৈষণা ততদিন বিত্তৈষণা। যতদিন বিত্তৈষণা ততদিন লোকৈষণা। সাধক লোকৈষণা ও বিত্তৈষণা পরিত্যাগ করে যেন গোপথে যায়, মহাপথে না যায়। অর্হৎ যজ্ঞবাল্ক্য ঋষি একথা বলেন।"[২২]

বৃহদারণ্যকে কুষীতক পুত্র কহোলকে বলছেন। "এই সেই আত্মা যাকে জেনে নেবার পর ব্রহ্মজ্ঞানী পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা পরিত্যাগ করে তার উর্দ্ধে ওঠেন। ভিক্ষায় জীবন নির্বাহ করে সন্তুষ্ট থাকেন।... যা পুত্রৈষণা তাই বিত্তৈষণা, যা বিত্তৈষণা তাই লোকৈষণা।"[২৩]

ইসিভাসিয়াইং-এর যাজ্ঞবল্ক্যও এষণা পরিত্যাগের পর বৃহদারণ্যকের যাজ্ঞবল্ক্যের মতো ভিক্ষায় সন্তুষ্ট থাকার কথা বলেছেন।[২৪] এ ভাবে কথা-শৈলীতেও উভয়ের বিচিত্র সাম্য দেখা যায়। বৈদিক বিচার ধারায় পুত্রৈষণা ত্যাগের প্রশ্নই ওঠে না কারণ ত্রয়ীধর্মানুসারে সন্তানোৎপাদন আবশ্যক কর্ম। তাই সহজেই এই প্রশ্ন করা যায় যে বৃহদারণ্যকে এই এষণা ত্যাগের কথা কোথা হতে এলো? এর প্রত্যুত্তরে এই কথাই বলা যায় যে উপনিষদের কিছু অংশ শ্রমণদের রচনা বা শ্রমণ সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত ঋষিদের রচনা যা শ্রমণ ও বৈদিক ঋষিদের সম্মিলিত প্রয়াস। আমরা যদি আরো অতীতে চলে যাই তবে বোধ হয় এ কথা বলতে

পারি যে এই ক্রম উপনিষদ রচনার প্রারম্ভিক বা বৈদিক কালেই সুরু হয়ে যায়। সেই সময় অরুণ, কেতু ও বাতরশন এই তিন প্রকারের ঋষি বর্তমান ছিলেন।[২৫] এঁদের মধ্যে বাতরশন ঋষিরা শ্রমণ ও ভগবান ঋষভের শিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।[২৬] এঁরা ঊর্দ্ধমন্থী বা ঊর্দ্ধরেতা হতেন। একবার অন্য ঋষিরা এঁদের কাছে কিছু প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের আসবার পূর্বেই তাঁরা আসছেন অবগত হয়ে অন্তর্হিত হয়ে যান ও যোগবলে 'কুষ্মাণ্ড' নামক মন্ত্র বাক্যে অনুপ্রবিষ্ট হন। আগত ঋষিরা তাঁদের দেখতে না পেয়ে চিত্তকে শান্ত করে যখন ধ্যান দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করলেন তখন তাঁদের প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেন। তাঁরা তখন বাতরশন শ্রমণদের বললেন, আপনারা কেন অন্তর্হিত হলেন? তখন তার প্রত্যুত্তরে তাঁরা বললেন, আপনাদের নমস্কার। আপনারা আমাদের এখানে এসেছেন। আপনাদের আমরা কি ভাবে পরিচর্যা করতে পারি? তখন আগত ঋষিরা বললেন, আপনারা আমাদের সেই পবিত্র শুদ্ধির স্থান নির্দেশ করুন যাতে আমরা পাপরহিত হই। বাতরশন শ্রমণেরা তখন আগত ঋষিদের শুদ্ধির স্থান সম্পর্কে উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশানুযায়ী কার্য করে আগত ঋষিরা পাপরহিত হলেন।[২৭]

এ হতে মনে হয় যে বৈদিক ঋষিরা শ্রমণদের সঙ্গে প্রায়ই মিলিত হতেন ও তাঁদের কাছ হতে আত্মধর্মের উপদেশ নিতেন।

এম্. বিণ্টরনিট্জ অর্বাচীন উপনিষদকে অবৈদিক বলেছেন।[২৮] কিন্তু উপরোক্ত আলোচনা দৃষ্টে বোধ হয় এ কথা বলা যায় যে প্রাচীন উপনিষদও সম্পূর্ণ বৈদিক নয়।

১ দশবৈকালিক নির্যুক্তি, হরিভদ্রীয় বৃত্তি, পৃঃ ৬৮।

২ মূলাচার ৫।৬২।

৩ স্থানাঙ্গ ৩.৩।১৮৫।

৪ কেনোপনিষদ ১।

৫ *History of Indian Philosophy,* Vol. II, Pp. 87-90.

৬ মণ্ডুকোপনিষদ্ ১।১।৫।

৭ ঐ ২।৫।

৮ ঐ ২।৬।

৯ প্রশ্নোপনিষদ ৫।৭।

১০ ছান্দোগ্যোপনিষদ ৭।১।২-৩।

১১ শ্বেতাশ্বতর (গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ৩য় সংস্করণ), পৃঃ ২৩।

১২ ভগবদ্গীতা ৯।২১।

১৩ মণ্ডুকোপনিষদ ১।২।৭, ১০।

১৪ ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৮ ৫।১, বৃহদারণ্যক ২ ২।৯-১০।

১৫ ছান্দোগ্য ৭।২৬।২—মৃদিত কষায়ায়। আচার্য শঙ্কর এর ভাষ্যে লিখছেন: মৃদিত কষায়ায় বাক্ষ্যাদিরিব কষায়ো রাগদ্বেষাদিদোষঃ সত্ত্বস্য রঞ্জনা রূপত্বাৎ…।

১৬ মণ্ডুকোপনিষদ্ ৯৯।

১৭ ইন্দো-ইরাণীয় মূলগ্রন্থ উর সংশোধন, ভাগ ৩।

১৮ *Indian Historical Quarterly*, Vol. III, Pp. 307-315 (Article Contributed by Umesh Chandra Bhattacharyya).

১৯ সমবায়াঙ্গ সূত্র ১৩৬-১৪৬; নন্দীসূত্র ৪৫-৫৫।

২০ "Even before there was such a thing as Buddhist or Jaina Literature, there mus have been Sramana Literature besides the Brahmanic Literature"—M. Winternitz (*The Jainas in the History of Indian Literature*, P. 5.).

২১ উদ্দালক ছান্দোগ্য ৫, নারদ ছান্দোগ্য ৭, অঙ্গিরস মুলুক ১।২, বরুণ তৈত্তিরীয় ৩।১, যাজ্ঞবাল্ক্য বৃহদারণ্যক ৩।৪।১।

২২ ইসিভাসিয়াইং ১২।

২৩ বৃহদারণ্যক ৩।৫।১।

২৪ ইসিভাসিয়াইং ১২।১-২।

২৫ বৈদিক কোশ ৪৭৩। এই শব্দ ঋগ্বেদ ১০, ১৩৬-২-য়ে মুনির জন্য ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ১. ২৩. ২; ১ ২৪৪; ২ ৭. ১-য়ে ঋষির জন্য প্রযুক্ত। নগ্ন সাধু অভিপ্রেত। এর ব্যবহার পরবর্তীকালে প্রচুর পাওয়া যায়।

২৬ শ্রীমদ্ভাগবত।

২৭ তৈত্তিরীয় আরণ্যক, প্রপাঠক ২, অনুবাক ৭, পৃঃ ১৩৭-৩৯।

২৮ *History of Ancient Indian Literature*, Pp. 190-91.

জৈন শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি

শ্রীপূরণ চাঁদ সামসুখা

[পূর্বানুবৃত্তি]

এই শিলালিপিতে গৌতম হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধিলাচার্য পর্যন্ত আচার্যগণের নাম দেওয়া হইয়াছে (যদিও প্রচলিত দিগম্বর পট্টাবলীতে প্রদত্ত নামের সহিত তাহার সম্পূর্ণ ভাবে ঐক্য নাই) ও তাঁহাদের পরম্পরাক্রমে আগত মহাপুরুষ সন্ততি ভদ্রবাহু স্বামী দ্বাদশ বৎসর দুর্ভিক্ষ হইবে জানিতে পারিয়া সর্বসঙ্ঘসহ উত্তরাপথ হইতে দক্ষিণাপথে প্রস্থান করেন উক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে এই ভদ্রবাহু পঞ্চম শ্রুত-কেবলী ভদ্রবাহু নহেন পরন্তু বুদ্ধিলাদি আচার্যের বহু পরে আবির্ভূত নিমিত্ত-শাস্ত্রক অন্য কোনো ভদ্রবাহু। শিলালিপিতে গৌতমাদির নামের সহিত প্রথম ভদ্রবাহুর নাম যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে ও তৎপরে বুদ্ধিলাচার্য পর্যন্ত দিগম্বর আচার্যগণের নাম দিয়া 'আদি' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে ও তাঁহাদের পরম্পরাক্রমে আগত যে ভদ্রবাহু স্বামী হইয়াছিলেন তিনি দক্ষিণাপথে গিয়াছিলেন কথিত হইয়াছে। অতএব এই ভদ্রবাহু স্বামী প্রথম ভদ্রবাহু হইতে পারেন না। দিগম্বর পট্টাবলীতে বুদ্ধিলাচার্যকে সপ্তদশম ও দ্বিতীয় ভদ্রবাহুকে সপ্তবিংশতিতম[৯] আচার্য রূপে পাইতেছি। এই দ্বিতীয় ভদ্রবাহুই যে উজ্জয়িনী পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন তাহার আর সন্দেহ থাকে না। প্রথম ভদ্রবাহু হইলে তাঁহার পরবর্তী আচার্যগণের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের পরম্পরাক্রমে আগত বলা হইত না। দিগম্বরগণ বলেন যে ভদ্রবাহু স্বামীর সহিত বিশাখাচার্যও দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিলেন ও ভদ্রবাহু কটবপ্রপর্বতে সমাধি মরণের জন্য থাকিয়া গেলে বিশাখাচার্য অন্য সাধুগণকে লইয়া আরও দক্ষিণে চোল পাণ্ড্যদেশে[১০] গমন করেন। আমরা দ্বিতীয় ভদ্রবাহুর পট্টে গুপ্তিগুপ্ত[১১] আচার্যকে পাইতেছি। এই গুপ্তিগুপ্ত আচার্যের

অর্হদ্বলী[১২] ও বিশাখাচার্য আরও দুইটী নাম ছিল। অতএব ভদ্রবাহুর সহিত যে বিশাখাচার্য দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিলেন তিনি এই অর্হদ্বলী আচার্য। প্রকৃতপক্ষে দিগম্বর জৈনগণের ইতিহাস এই দ্বিতীয় ভদ্রবাহু ও অর্হদ্বলী আচার্য হইতেই আরম্ভ। অর্হদ্বলী আচার্যের সময় হইতেই দিগম্বর সম্প্রদায় নন্দীগণ, সেনগণ, সিংহগণ ও দেবগণ এই চারি সঙ্ঘ বা বিভাগে বিভক্ত হন।[১৩] দ্বিতীয় ভদ্রবাহুর পূর্বে যে সমস্ত আচার্যের নাম প্রদত্ত আছে তাঁহাদিগকে পৌরাণিক ব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। পঞ্চম শ্রুত-কেবলী প্রথম ভদ্রবাহু স্বামীর সময়ে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহা শ্বেতাম্বরগণও বলেন। তাঁহাদের মতে এই দুর্ভিক্ষের সময়ে ভদ্রবাহু স্বামী হিমালয় প্রদেশে গমন করেন ও আর কখনও পাটলীপুত্রে ফিরিয়া আসেন নাই। দুর্ভিক্ষান্তে স্থূলভদ্র তাঁহার নিকট যাইয়া 'পূর্ব' শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ভদ্রবাহু বীরাব্দ ১৭০ বৎসরে দেবলোক প্রাপ্ত হন, তখন নন্দবংশীয়গণের শাসনকাল। অতএব এই দুর্ভিক্ষ নন্দবংশীয়গণের শাসনকালের মধ্যে হইয়া-ছিল। প্রবল প্রতাপ মৌর্যগণের বহু বিস্তৃত রাজ্য ছিল, যদি রাজধানীর চতুঃপার্শ্বে দুর্ভিক্ষ হইত তবে তাঁহারা অন্য স্থান হইতে শস্যাদি আনয়ন করিয়া অল্প দিনেই দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে পারিতেন। ১২ বৎসর যাবৎ দুর্ভিক্ষ থাকিতে পারিত না। কিন্তু নন্দ বংশীয়গণের রাজ্যের শেষ সময়ে তাঁহারা হীনবল হইয়াছিলেন। অন্য রাজ্য হইতে শস্য আনিয়া ঘোর দুর্ভিক্ষ নিবারণের ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না, কাজেই দুর্ভিক্ষ দীর্ঘকালব্যাপী হইয়া পড়িয়াছিল ও তাহার ফলে তাঁহারা আরও হীনবল হইয়া পড়িলেন এবং মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য যে সামান্য চেষ্টাতেই নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিয়া-ছিলেন ইহা তাহার প্রধান কারণ সমূহের মধ্যে একটী বলিয়াই অনুমিত হয়। অতএব দিগম্বরগণ দুর্ভিক্ষের যে বিবরণ প্রদান করেন তাহা সঠিক নহে। এই দুর্ভিক্ষ নন্দ বংশীয় কোন রাজার সময়ে হইয়াছিল, মৌর্যগণের সময়ে হয় নাই। আমরা ইতিপূর্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, প্রথম ভদ্রবাহু দক্ষিণাপথে গমন করেন নাই; কিন্তু দ্বিতীয় ভদ্রবাহু গিয়াছিলেন। দিগম্বর শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভদ্রবাহুর সময়ে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহা উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী স্থানে মধ্যপ্রদেশে[১৪] উৎকট ভাবে হইয়াছিল। অতএব

ইহা নিশ্চিত রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে এই দুর্ভিক্ষ পাটলিপুত্রের প্রথম দুর্ভিক্ষ নহে পরন্তু পরবর্তীকালের মধ্যপ্রদেশে ভাবী কোন দুর্ভিক্ষ ও তজ্জন্য দ্বিতীয় ভদ্রবাহুই[১৫] সাধু সঙ্ঘসহ দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করিয়াছিলেন ও চন্দ্রগুপ্ত নামক কোন রাজা শ্রমণ ধর্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত প্রস্থান করেন। এই দুর্ভিক্ষ ও দক্ষিণাপথে সাধু সঙ্ঘের প্রস্থানের সহিত জৈন সমাজের বিভাগের ইতিহাস জড়িত রহিয়াছে। কারণ যাঁহারা দক্ষিণাপথে গিয়াছিলেন তাঁহারা কয়েকটা বিষয়ে মূল নিগ্রন্থ সম্প্রদায় হইতে পৃথক মত ধারণ করিয়া নিজেদেরকে এক পৃথক সম্প্রদায়ে পরিণত করেন।

উড়িষ্যার অন্তর্গত উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি হস্তীগুম্ফা নামক গুহায় কলিঙ্গাধিপতি জৈন সম্রাট খারবেলর শিলালিপির যে পাঠোদ্ধার হইয়াছে তাহাতে জানা যায় মহারাজ খারবেল জৈন সাধুগণকে পট্ট বস্ত্র ও শ্বেত বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। খারবেলর সময় প্রায় ১৭০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে অতএব খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে বস্ত্রধারী জৈন সাধু ছিলেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না।[১৬] খারবেলর অভ্যুদয় বিক্রম সংবত প্রতিষ্ঠার শতাধিক বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। কাজেই ১৩৬ বিক্রমাব্দে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে বলা অসত্যের প্রতিপাদন করা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

উপরে যাহা আলোচিত হইল তাহাতে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে :

(ক) শ্বেতাম্বরগণ প্রথম ভদ্রবাহুর পূর্বে যে সমস্ত আচার্যগণের নাম প্রদান করেন তাঁহাদের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ছিল।

(খ) পঞ্চম শ্রুত-কেবলী প্রথম ভদ্রবাহু গর্ভাপহরণে বিশ্বাসকারী শ্বেতাম্বরগণেরই পূর্ব পুরুষ। তিনি চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য ত্যাগ বা মৃত্যুর প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে স্বর্গগত হন।

(গ) বার বৎসরব্যাপী প্রথম ঘোর দুর্ভিক্ষ নন্দ বংশীয় কোন রাজার সময়ে হইয়াছিল।

(ঘ) দ্বিতীয় ভদ্রবাহুই উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী স্থানের দুর্ভিক্ষের প্রাক্কালে তাঁহার অধীনস্থ সাধু সঙ্ঘসহ দক্ষিণাপথে গমন করিয়াছিলেন।

(ঙ) এবং দ্বিতীয় শতাব্দী খৃষ্ট পূর্বাব্দে শ্বেতবস্ত্রধারী জৈন সাধুগণের অস্তিত্ব ছিল।

দিগম্বর সম্প্রদায়ের জৈন সিদ্ধান্ত ভাস্কর নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থের ১ম ভাগ, ১ম কিরণে আদি পুরাণ ও উত্তর পুরাণের কর্তা জিনসেনাচার্য (২য় ?) ও গুণভদ্রাচার্যের পরিচয় পট্টাবলী মূল ও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পট্টাবলীতে গৌতম স্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া 'সেনগণে'র আচার্যগণের নাম ও কতক কতক সময় দেওয়া হইয়াছে। এই তালিকা হইতে জানা যায় যে সপ্তবিংশতি পট্টে দ্বিতীয় ভদ্রবাহু হইয়াছিলেন ও তাঁহার পর লোহাচার্য ও তৎপট্টে জিনসেনাচার্য (১ম ?) মহাবীরের ৬১১ বৎসর পরে স্বর্গগত হয়েন। লোহাচার্য ও জিনসেনাচার্যের সময় বাদ দিয়া আমরা দ্বিতীয় ভদ্রবাহুর সময় বীরাব্দ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধরিয়া লইতে পারি। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর বিভাগ বীরাব্দ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে হইয়াছিল। অতএব দ্বিতীয় ভদ্রবাহুর দক্ষিণাপথ গমনের এক শতাব্দীর মধ্যেই উভয় সম্প্রদায় সম্পূর্ণ রূপে পৃথক হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ভদ্রবাহু কটবপ্রপর্বতে স্বর্গগত হন ও তাঁহার সাহিত যে সমস্ত সাধুগণ দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন তাঁহারা দাক্ষিণাত্যেই থাকিয়া জৈনধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে বৃদ্ধ সাধুগণের মৃত্যুর পর অল্প বয়স্কগণ ও নব-দীক্ষিতগণকে অঙ্গ সমূহের জ্ঞান শিক্ষা দিবার উপযুক্ত শিক্ষক ঐ সাধু সঙ্ঘে কমিয়া আসিতে লাগিল ও অল্প সময়েই তাঁহাদের মধ্যে অঙ্গ শাস্ত্রের জ্ঞান লুপ্ত হইল। তজ্জন্যই দিগম্বরগণ অঙ্গ সমূহের জ্ঞান সম্পূর্ণ ভাবে লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া থাকেন। মূল স্থান আর্যাবর্ত্ত হইতে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাঁহাদের আচার, ব্যবহার ও মান্যতায় পরিবর্তন সংঘটিত হইল। বীরাব্দ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর অন্তে কি সপ্তম শতাব্দীর প্রথমেই কতক সাধু আর্যাবর্তে প্রত্যাগমন করিয়া নিজেদের আচার ব্যবহারের সহিত আর্যাবর্তে স্থিত সাধুগণের আচার ব্যবহারের পার্থক্য দেখিয়া নিজেদের আচার সংশোধন না করিয়া লইয়া এক পৃথক সম্প্রদায় গঠন করিয়া লইলেন। আর্যাবর্তের সাধুগণের নিকট অঙ্গ শাস্ত্রের যে জ্ঞান ছিল তাহা তাঁহারা স্বীকার না করিয়া অঙ্গ শাস্ত্র সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইলেন,

সাধুগণকে জিনকল্পী সাধুর অনুকরণে সম্পূর্ণ নগ্ন থাকিতে হইবে, স্ত্রীলোকের মুক্তি হইতে পারে না, কেবল-জ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শরীর ধারণ করিয়াও আহার করেন না প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ে পৃথক মত অবলম্বন করিয়া ক্রমে এক সম্পূর্ণ নূতন সম্প্রদায় গঠন করিয়া মূল নিগ্রর্ন্থ সম্প্রদায় হইতে পৃথক হইয়া গেলেন। এই ঘটনা ভগবান মহাবীর নির্বাণের ৬০০ বৎসর পরে আরম্ভ হয় ও সম্পূর্ণ হইতে আরও সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। অথচ শ্বেতাম্বরগণ সময়ে সময়ে সাধুগণকে একত্রিত করিয়া অঙ্গাদি শাস্ত্র সমূহের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। উত্তর ভারতে পাটলীপুত্র নগরে, মথুরায় ও পরিশেষে সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত বল্লভী নগরীতে শ্বেতাম্বর সাধু সঙ্ঘ একত্রিত হইয়া অঙ্গাদি শাস্ত্রের উদ্ধার করেন। কলিঙ্গ দেশে রাজ চক্রবর্ত্তী খারবেলও সাধু সঙ্ঘকে একত্রিত করিয়া অঙ্গ সতিকং তুরিয়ং[১৭] অর্থাৎ একাদশ অঙ্গ সঙ্কলিত করাইয়াছিলেন। এই সমস্ত অঙ্গ শাস্ত্র মৌর্য শাসন সময়ে কলিঙ্গ দেশে বিলুপ্ত হইয়াছিল তাহা তাঁহার হস্তীগুম্ফার শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে। কাজেই শ্বেতাম্বরগণের নিকট অঙ্গাদি প্রাচীন শাস্ত্র এখনও উপলব্ধ আছে।

এইরূপে যে সম্প্রদায় মূল নিগ্রর্ন্থ সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন তাহারা আরও পরবর্ত্তীকালে নগ্নত্ব নিবন্ধন 'দিগম্বর' নামে আখ্যাত হইলেন ও মূল নিগ্রর্ন্থ সম্প্রদায় শ্বেত বস্ত্র ধারণ করিবার জন্য দিগম্বর শব্দের বিপরীত শব্দ 'শ্বেতাম্বর' নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। 'দিগম্বর' ও 'শ্বেতাম্বর' এই উভয় শব্দই পরবর্ত্তীকালে জৈন সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে।

দিগম্বরগণ অঙ্গ শাস্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া তাহার অধ্যয়ন না করায় নূতন শাস্ত্র প্রণয়নের আবশ্যকতা অনুভব করিলেন এবং আরও ৭০।৮০ বৎসর পরে ধরসেন আচার্য কর্তৃক শিক্ষিত হইয়া পুষ্পদন্ত ও ভূতবলী নামক আচার্যদ্বয় বীরাব্দ ৬৮৩ অব্দে প্রথম দিগম্বর শাস্ত্র রচনা[১৮] করেন। ইহার পূর্বের কোন গ্রন্থ দিগম্বর সম্প্রদায়ের নাই। দ্বিতীয় ভদ্রবাহু স্বামীর দক্ষিণাপথে গমনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পুষ্পদন্ত ও ভূতবলী কর্তৃক প্রথম শাস্ত্র প্রণয়ন কালের মধ্যে প্রায় দেড়শত বৎসর অতীত হইল ও এই সময়ের মধ্যে আমরা সাধুগণের দক্ষিণাপথ গমন, মূল নিগ্রর্ন্থ সমাজ হইতে পৃথক হওন ও প্রথম শাস্ত্র প্রণয়ন পর্যায় ক্রমে ঘটিয়াছিল দেখিতে পাই। এই সময়ের পূর্বের কোন

প্রতিমা বা কোন শিলালেখ বা কোন গ্রন্থ দিগম্বর সম্প্রদায়ের নাই। মথুরায় আবিষ্কৃত জৈন মূর্তিসমূহ মূল নিগ্রন্থ (যাহা পরে 'শ্বেতাম্বর' নামে অভিহিত হয়) সম্প্রদায়ের। ঐ মূর্তিসমূহের মধ্যে 'উদ্দেহগণ', 'কেড়িয়গণ'[১৯] 'উচ্চনাগরী শাখা' প্রভৃতি শ্বেতাম্বরগণের সাধু সম্প্রদায়ের 'গণ' ও 'শাখা'-র নাম, ভগবান মহাবীরের গর্ভাপহরণের চিত্র পাওয়া যায়, যাহা দিগম্বর সম্প্রদায়ের হইতেই পারে না।

শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরগণের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে মতানৈক্য আছে তাহার মধ্যে প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করা হইয়াছে—এই সকল গুলির মধ্যেও আবার বস্ত্র পরিধান সম্বন্ধীয় মতানৈক্যই সর্বপ্রধান। আমরা প্রাচীন জৈন সাহিত্যেও এই অনৈক্যের আভাস প্রাপ্ত হই। উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের 'কেসি গোয়মিয়ং' শীর্ষক ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যয়নে ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থংকর ভগবান পার্শ্বনাথের শিষ্যানুশিষ্য কেশীকুমারের সহিত ভগবান মহাবীরের প্রথম গণধর গৌতম স্বামীর (ইন্দ্রভূতি গৌতম) আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। কেশীকুমার চতুর্যাম ধর্মের পরিবর্তে পঞ্চযাম ধর্ম ও সচেলকত্বর স্থলে অচেলকত্বের প্রচলনের জন্য সন্দেহ উত্থাপন করিলে গৌতম তাহার সমাধান করেন। এই আলোচনা হইতে জানা যায় যে পার্শ্বনাথের সাধুগণ বস্ত্র পরিধান করিতেন কিন্তু মহাবীরের সাধুগণের মধ্যে বস্ত্ররহিতও ছিলেন। ভগবান মহাবীর নিজে সংসার ত্যাগ করিবার পর তের মাস পর্যন্ত বস্ত্রধারী ছিলেন—পরে অচেলক[২০] হইয়াছিলেন। ইনি ঘোর তপস্বী ও অসাধারণ সহনশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সংসার ত্যাগ করিবার পর হইতে কেবল-জ্ঞান হইবার পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ বার বৎসর কাল পর্যন্ত যে ভয়ঙ্কর কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে রোমাঞ্চ উৎপন্ন হয়। এরূপ ঘোর তপস্বী ও কষ্টসহিষ্ণু ব্যক্তি যে সাধুগণের জন্য কঠোর নিয়ম প্রবর্তন করিবেন তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। পার্শ্বনাথের সাধুগণ বস্ত্র পরিধান করিতেন মাত্র নহে কিন্তু যে কোন প্রকারের বস্ত্র পরিতে পারিতেন। তাঁহারা মৈথুন-বিরমন রূপ চতুর্থ ব্রতকে পরিগ্রহ পরিত্যাগ রূপ পঞ্চম ব্রতের অন্তর্ভুক্ত মনে করিতেন ও তজ্জন্য চতুর্থ মহাব্রত পালন করিতেন। সেস্থলে মহাবীর মৈথুন-বিরমনকে পৃথক করিয়া এক পৃথক মহাব্রত করিলেন ও বস্ত্রপরিধানের কঠোর নিয়ম প্রচার করিলেন। কিন্তু

সমস্ত সাধুগণকেই উলঙ্গ থাকিতে হইত না। সাধু সম্প্রদায়ের ন্যায় মহাবীরের সাধ্বী সম্প্রদায়ও বৃহৎ ছিল। আমরা কল্পসূত্রে দেখিতে পাই যে আর্যা চন্দনা প্রমুখ ৩৬০০০ সাধ্বী ভগবান মহাবীরের শাসনাধীনে ছিলেন। সাধ্বীগণ বস্ত্র পরিধান করিতেন ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধুগণ যে এত সাধ্বীগণের সম্মুখে নগ্ন বিচরণ করিতেন ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু নগ্ন সাধুও যে ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই নগ্ন সাধুগণকে 'জিনকল্পী' সাধু বলা হইত আর যাঁহারা বস্ত্র পরিধান করিতেন তাঁহারা 'স্থবিরকল্পী' বলিয়া কথিত হইয়াছেন। 'কল্প' শব্দের অর্থ আচরণ। অতএব যে সাধুগণ জিন বা তীর্থংকরের ন্যায় আচরণ করিতেন তাঁহারা জিনকল্পী ও যাঁহারা স্থবিরগণের ন্যায় আচরণ করিতেন তাঁহারা স্থবিরকল্পী। জিনকল্পী সাধুগণ বস্ত্র পরিধান করিতেন না। আহার বা পানের জন্য কোনো প্রকার পাত্র রাখিতেন না (করপাত্র) ও লোকালয়ে থাকিতেন না। বনে থাকিয়া কঠোর তপস্যা করিতেন। আহারের প্রয়োজন হইলে ভিক্ষার জন্য লোকালয়ে আগমন করিতেন মাত্র। কিন্তু স্থবিরকল্পীগণ বস্ত্র পরিধান করিতেন ও লোকালয়ে থাকিতেন। কেশীকুমারের সহিত ইন্দ্রভূতি গৌতমের আলোচনার ও কেশীকুমারের মহাবীরের শাসনাধীনে আসার পর জিনকল্প ও স্থবিরকল্প এই দুইপ্রকারের আচারের প্রবর্তন হইয়াছিল কি তাহারও পূর্ব হইতেই এই দুই প্রকার আচারের প্রচলন ছিল তাহার পরিষ্কার উল্লেখ পাওয়া যায় না কিন্তু এই আলোচনার পর বস্ত্রধারী পার্শ্বনাথ সম্প্রদায়ের সমস্ত সাধু যে মহাবীরের সম্প্রদায়ে আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রথম অঙ্গ আচারাঙ্গ সূত্রে সাধুগণের আচার ও ভগবান মহাবীরের জীবনী সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। এই অঙ্গে আমরা দেখিতে পাই যে সাধুগণের জন্য বস্ত্র পরিধানের ব্যবস্থা আছে। আচারাঙ্গ প্রথম স্কন্ধ বিমোক্ষাধ্যয়ন নামক সপ্তম অধ্যয়নের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ উদ্দেশকে শীতকালের জন্য তিন, দুই বা এক বস্ত্রের ব্যবস্থা আছে কিন্তু গ্রীষ্মকালে এক বস্ত্র পরিধান করিতে বা নগ্ন থাকিতে বলা হইয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে বস্ত্র পরিধান করা ও নগ্ন থাকা উভয় প্রকার ব্যবস্থাই দেওয়া আছে। সাধুগণ নিজ নিজ রুচি ও সামর্থ অনুসারে একটী বা অপরটী পালন করিতেন। আচারাঙ্গ সূত্রের দ্বিতীয় স্কন্ধ

পঞ্চম অধ্যয়ন, প্রথম উদ্দেশকে বস্ত্রভিক্ষা ও গ্রহণ করিবার বিস্তারিত নিয়ম দেওয়া হইয়াছে ও তজ্জন্য এই উদ্দেশকের নামও বস্ত্রেষণা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে বস্ত্রগ্রহণ ও ধারণ করিবার বিধি বিস্তারিত বর্ণিত আছে। আমরা এস্থলে মূল পাঠ উদ্ধৃত করিতেছি :

"সে ভিক্‌খূ অভিকংখিজ্জা বত্থং এসিওয়ে, সে জং পুণ বত্থং জানিজ্জা তং জহাজংগিয়ং বা ভংগিয়ং বা সানিয়ং বা পোত্তগং বা খোমিয়ং বা তুলকুড়ং বা তহপ্পগারং বত্থং বা জে নিগ্‌গন্থে তরুণে জুগবং বলবং অপ্পায়ংকে থিরসংঘয়ণে সে এগং বত্থং ধারিজ্জা নোবীয়ং জা নির্গংথী সা চত্তারি সংঘড়িয়ো ধারিজ্জা এগং দুহত্থ বিত্থারং দো তিহত্থবিত্থারাও এগং চউহত্থ বিত্থারং তহপ্পগারেহিং বত্থেহিং অসংধিজ্জমানেহিং অহপচ্ছা এগমেগং সংসিবিজ্জা। —২য় স্কন্ধ, ৫ম অধ্যয়ন, ১৪১।

অর্থাৎ, সাধুর যখন বস্ত্রের প্রয়োজন হয় তখন তিনি লোমনির্মিত বস্ত্র বা রেশমী বস্ত্র, বা তাল প্রভৃতির পাতার নির্মিত বস্ত্র বা কার্পাস নির্মিত বস্ত্র বা এইরূপ অন্য কোনো প্রকার বস্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু যে নির্গ্রন্থ সাধু তরুণ, বলবান, নিরোগী ও দৃঢ় শরীর বিশিষ্ট তিনি কেবলমাত্র একবস্ত্র ধারণ করিবেন, দ্বিতীয় বস্ত্র লইবেন না। সাধ্বী চারি বস্ত্র ধারণ করিবেন। দ্বিহস্ত বিস্তৃত একটি, তিন হস্ত বিস্তৃত দুইটী ও চারি হস্ত বিস্তৃত একটী ইত্যাদি।

আচারাঙ্গ একাদশ অঙ্গের প্রধান। কোন কোন পাশ্চাত্য বিদ্বানের মতে প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্গ অন্যান্য অঙ্গ সমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। অতএব এই সুপ্রাচীন গ্রন্থে বস্ত্র পরিধান করিবার বিধি প্রদত্ত থাকায় ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে বস্ত্র পরিধান করিবার আচার বহু পুরাতন ও পূর্বে আমরাও দেখাইয়াছি যে ভগবান মহাবীরের সময়েও বস্ত্রধারী ও বস্ত্ররহিত উভয় প্রকারের সাধু বিদ্যমান ছিলেন ও আপন আপন রুচি ও সামর্থ অনুসারে জিনকল্প বা স্থবিরকল্প মার্গ অবলম্বন করিতেন। কিন্তু বস্ত্র লইয়া পরস্পরের মধ্যে কোনপ্রকার বৈমনস্য হয় নাই ও জিনকল্পী ও স্থবিরকল্পী একই স্থবিরের শাসনাধীনে থাকিতেন। পরে কোন সময়ে এই কলহের সূত্রপাত হয় ও পূর্বে আমরা যেরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছি মহাবীরের নির্বাণের পর সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে

যে সমস্ত সাধু দক্ষিণাপথে গিয়াছিলেন তাঁহাদেরই মধ্যে প্রত্যাগত সাধুগণ কর্তৃক মূল নির্গ্রন্থ সম্প্রদায় হইতে পৃথক হওন ও পৃথক সম্প্রদায় স্থাপন হয় কাজেই শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় ভগবান মহাবীরের পর বস্ত্র পরিধান করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে বলা সত্যের বিরোধ করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বরং উপরে আমরা যেরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছি তাহাতে দিগম্বর সম্প্রদায়ই মূল নির্গ্রন্থ সম্প্রদায় হইতে কেবলমাত্র বস্ত্র রহিত হইয়াই থাকিতে হইবে বলিয়া পৃথক হইয়া গিয়াছিলেন।

শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায় পরস্পর পৃথক হইবার পরও বহু বৎসর যাবৎ তাঁহাদের প্রতিমার পার্থক্য হয় নাই। মথুরার কংকালী টীলায় আবিষ্কৃত প্রতিমা সমূহের মধ্যে যে সমস্ত প্রতিমা পদ্মাসনে উপবিষ্ট সে সমস্ত প্রতিমার পুরুষাঙ্গ উৎকীর্ণ নাই কিন্তু কায়োৎসর্গে দণ্ডায়মান প্রতিমার পুরুষাঙ্গ উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই সমস্ত প্রতিমা শ্বেতাম্বরগণেরই পূর্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত তাহা ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে—অথচ আধুনিক কালের শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের প্রতিমাতে যে বস্ত্রের চিহ্ন থাকে তাহা সেগুলিতে নাই। আবার দিগম্বরগণ অধুনা উপবিষ্ট প্রতিমাতেও যে পুরুষ চিহ্ন উৎকীর্ণ করেন তাহাও নাই। উভয় সম্প্রদায়ে প্রতিমার পার্থক্য বহু পরবর্তীকালে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে হইয়াছে। এই পার্থক্য হইবার বিবরণ আমরা রত্নমন্দির গণির রচিত উপদেশ তরঙ্গিনী নামক পুস্তকে প্রাপ্ত হই।[২১] শ্বেতাম্বর আচার্য বপ্পভট্ট সূরি ও গোপগিরির (Gwalior) অধিপতি আম নৃপতির সময়ে গির্ণার (Girnar) পর্বতে উভয় সম্প্রদায়ে প্রথমতঃ যুদ্ধ ও পরে ঘোর বিতর্ক হয়। এই বিবাদের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিমার পার্থক্য অবধারণের জন্য দিগম্বরগণ সমস্ত প্রতিমার পুরুষাঙ্গ উৎকীর্ণ করা ও শ্বেতাম্বরগণ বস্ত্রচিহ্ন প্রদান করা আরম্ভ করেন। বপ্প ভট্ট সূরির সময় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ;[২২] অতএব উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিমার পার্থক্য এই সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার পূর্বেকার প্রতিমায় উভয় সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক চিহ্ন থাকিত না।

উপরে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইল তাহা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ই উভয়ের মধ্যে প্রাচীনতম সম্প্রদায় যদিচ

'শ্বেতাম্বর' শব্দ বহু পরবর্তীকাল হইতে ব্যবহৃত হইতেছে ও দিগম্বরগণ মূল জৈন সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন।

৯ *Tattvarthadhigama Sutra* by J. L. Jaini, Historical Introduction, Page IX.

১০ জৈন-সিদ্ধান্ত-ভাস্কর, কিরণ ১, পৃঃ ১২-১৩।

১১ *Tattvarthadhigama Sutra* by J. L. Jaini, Historical Introduction, Page IX.

১২ জৈন-সিদ্ধান্ত-ভাস্কর, কিরণ ৪, পৃঃ ৬৯।

১৩ ঐ, কিরণ ৪, পৃঃ ৬৬-৭০।

১৪ ভদ্রবাহু চরিত্র, ২য় পরিচ্ছেদ, শ্লোক ৬১।৬৪।৭১ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

১৫ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ও দুই ভদ্রবাহু যে পৃথক ছিলেন তাহাই স্বীকার করিয়াছেন: "A Comparison of these two lists makes it clear that the Bhadrabahus of the two lists are not identical. The scene of action of the Sruta-kevalin Bhadrabahu of the Svetambaras was Pataliputra and he is said to have retired to Nepal. (Hemacandra, *Parisista Parvan*, Ch. IX, Pp. 55-103) whereas the scene of action of the Sruta-kevalin Bhadrabahu of the Digambaras was Ujiayini and he is said to have retired to the South." (*Archaeological Survey of India Journal*, 1925-26, P. 178).

১৬ 'শ্রীখারবেলপ্রশস্তি ঔর জৈন ধর্মকী প্রাচীনতা', শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়সবাল লিখিত, নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা, ভাগ ১০, অঙ্ক ৩, পৃঃ ৪৯৯-৫০২।

১৭ হস্তীগুম্ফার খারবেল প্রশস্তি—১৬ পংক্তি। "মুরিয়কাল বোছিনং চ চোয়ঠি অঙ্গসতিকং তুরিয়ং উপাদয়তি" ইত্যাদি।

১৮ জৈন-সিদ্ধান্ত-ভাস্কর, কিরণ ১, পৃঃ ৫৭-৫৮।

১৯ The inscriptions now prove the actual existence of twenty of the subdivisions mentioned in the sthaviravali of the *Kalpa Sutra*. '(Further Proofs of the Authenticity of the Jaina Tradition' by G. Buhler, *Vienna Oriental Journal*, Vol. IV, P. 315)

২০ সমণে ভগবং মহাবীরে সংবচ্ছরং সাহিয়ং মাসং জাব চীবরধারী হোত্থা, তেণ পরং অচেলএ পাণি পড়িগ্গহিএ—কল্পসূত্র।

২১ উপদেশতরঙ্গিনী, চতুর্থ তরঙ্গ।

২২ প্রভাবক চরিত, edited by Sharma, P. 171

জৈনধর্ম

ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন

[ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থে জৈনধর্ম সম্পর্কে যে বিশদ আলোচনা করেছেন পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তা এখানে পুনর্মুদ্রিত করা হচ্ছে। তথ্য সম্পর্কে যেখানে যেখানে মত দ্বৈধতা বা দৃষ্টি ভঙ্গীর পার্থক্য আছে তা পাদটীকায় সন্নিবেশিত করা হল। পাদটীকা সম্পূর্ণ-ই 'শ্রমণ' সম্পাদকের।]

বুদ্ধদেবের পূর্বে পার্শ্বনাথ-শিষ্য[১] শেষ তীর্থংকর বর্দ্ধমান মহাবীর জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব ও মহাবীর উভয়েরই কর্মক্ষেত্র ছিল বৃহৎ বঙ্গে—মগধ ও পাটনায়। জৈন ইতিহাস অনুসারে মহাবীর বহুকাল রাঢ় দেশে স্বকীয় ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। বৈশালীর লিচ্ছবি-রাজবংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল।[২] যৌবন কালেই তিনি সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করেন এবং ৪০ বৎসর বয়সে[৩] বিদেহ, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি স্থানে ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন: মিথিলার রাজ পরিবারের[৪] সঙ্গে তাঁহার মাতৃকুলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল এবং এই সূত্রে তিনি বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর রাজ সভায় স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। ৫২৭ খৃঃ পূর্বে তাঁহার নির্বাণ ঘটিয়াছিল বলিয়া লোকের বিশ্বাস। কিন্তু ঐ সময় অজাতশত্রুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার ও খারবেলের প্রস্তর লিপির কথিত বৃত্তান্তের সহিত তাঁহার জীবনের সামঞ্জস্য কতকটা কষ্ট কল্পনা করিয়া করিতে হয়। এজন্য অধ্যাপক জেকবি ৪৭৭ খৃঃ পূঃ বীর

---

১ মহাবীর পিতা সিদ্ধার্থ পার্শ্বনাথ সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের কাল ব্যবধান ২০০ বৎসর।

২ ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুরের জ্ঞাতৃবংশে।

৩ মহাবীর ৩০ বৎসর বয়সে সংসার পরিত্যাগ করেন ও ৪২ বৎসর বয়সে কেবল-জ্ঞান লাভ করিয়া ধর্ম প্রচারে নিরত হন।

৪ বৈশালী গণতন্ত্রের সর্বাধিনায়ক হৈহয় বংশীয় চেটকের ভগ্নী ত্রিশলা মহাবীরের মা ছিলেন। চেটকের এক কন্যা চেলনার সহিত মগধাধিপতি শ্রেণিক বিম্বিসারের বিবাহ হয়।

নির্বাণের সময় ধরিয়া লইয়াছেন, তাহা হইলে ৫৪৭ খৃঃ পূঃ[৫] তাঁহার জন্মকাল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধ ৫৬৩ খৃঃ পূঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং ৪৮৩ খৃঃ পূঃ অব্দে অশীতি বৎসর বয়সে তাঁহার নির্বাণ লাভ হয়। জৈন ধর্ম প্রবর্তক মহাবীর তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত স্থির হইলে জেকবি, ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রভৃতি পণ্ডিতদের কথিত জন্ম তারিখ অগ্রাহ্য করিতে হয়।

বুদ্ধের মত ও মহাবীর প্রচারিত মতের অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। উভয়েই জীব হত্যার বিরোধী ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতিবাদী[৬] ছিলেন। উভয়েই হিন্দুর বর্ণাশ্রম কতকাংশে মানিয়া লইয়াছিলেন এবং হিন্দু দেবতা স্বীকার করিতেন[৭]। এই জন্য কেহ কেহ জৈন ধর্মকে বৌদ্ধ ধর্মের শাখা স্বরূপ অনুমান করিতেন। কিন্তু এখনকার গবেষণায় উভয় ধর্মের পার্থক্য বিশেষ ভাবে ধরা পড়িয়াছে এবং জৈনধর্ম যে বুদ্ধের পূর্বে প্রচারিতও হইয়াছিল তাহারও অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম একই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া একই সূত্র প্রচার করিয়াছে। মহাবীরও বুদ্ধের ন্যায় নিজে রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যতি ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। জৈন ধর্ম সংযম ও কঠোরতায় বৌদ্ধ ধর্মকে বরং ছাপাইয়া গিয়াছে। তথাপি বৌদ্ধ ধর্মের এত প্রচার হইল কেন? কি কারণে উহা জগতের এক-তৃতীয় অংশ গ্রাস করিয়া এখনও প্রচার কার্যে সচেষ্ট এবং জৈন ধর্ম ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ থাকিয়া শুধু নিজের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত রহিয়াছে?

ঐতিহাসিকেরা বলেন জৈনধর্ম হিন্দু ধর্মোক্ত দেব-দেবতার উপর বেশী শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া ভারতের সঙ্গে অধিকতর অন্তরঙ্গ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ও বিদেশীর প্রবেশ পথ কতকটা অন্তরায় পূর্ণ করিয়াছে। জৈনেরা বিশ্বাস করেন, প্রত্যেক তরুলতারও আত্মা আছে। তাঁহারা জীবের দুঃখ কষ্টের

৫ মহাবীর ৭২ বৎসর বয়সে নির্বাণলাভ করেন।

৬ জৈন ধর্ম যজ্ঞানুষ্ঠানের বিরোধী ছিল ঠিকই তবে তাহার প্রতিবাদের জন্য উদ্ভূত তাহা নহে।

৭ জৈনধর্ম বর্ণাশ্রম বা হিন্দুদেবতা স্বীকার করে না। জৈন ধর্মের দেবতা মানুষের মতো এক ধরণের জীব মাত্র ও জন্ম মৃত্যুর অধীন।

প্রতি এত মমতাশীল ও সদয়, যে একটী গাছের পত্র পল্লব ছিঁড়িতেও কষ্ট বোধ করেন, পাছে তাহাদের আত্মা কষ্ট পায়। তাঁহাদের একদল শিরে ময়ূরপুচ্ছ লইয়া রাজপথের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব সরাইয়া পথ পর্যটন করেন, পাছে কোন জীব পদ পীড়নে বিনষ্ট হয়। তাঁহারা নিজের শরীরের রক্ত দ্বারা মশক ও ছারপোকার ক্ষুন্নিবৃত্তি করা ধর্মের অঙ্গীয় মনে করেন এবং পিপীলিকাকেও কোন কোন জৈন ধর্মাবলম্বী নিত্য শর্করা প্রদান করিয়া 'জীবে দয়া' সূত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।[৮] সাধারণতঃ কাব্য নাটকে ইহারা 'নিগ্রর্ন্থ' নামে পরিচিত।

এই ভাবের দয়ার অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা আতিশয্য আছে, যাহাতে হিন্দুস্থানের গণ্ডী পার হইয়া এই ধর্ম দেশান্তরে গৃহীত হইতে পারে নাই। তাহা ছাড়া বৌদ্ধদের সঙ্ঘ একটা মস্ত বড় অস্ত্র। এই অস্ত্র দ্বারা বৌদ্ধগণ জগজ্জয় করিয়াছিলেন, এই সঙ্ঘের উন্মুক্ত তোরণে দেশান্তর হইতে সমাগত লোকেরা আসিয়া ভগবান বুদ্ধের চরণে আশ্রয় লইতে পারিয়াছিলেন। বিশ্বের সঙ্গে এই ভাবের ঘনিষ্ঠ যোগ রাখার দরুণ বৌদ্ধ ধর্মের প্রবেশ দ্বার অবারিত হইয়াছিল। জৈনধর্ম নানারূপ কঠোরতা ও বিধি ব্যবস্থার জালে আবদ্ধ হইয়া হিন্দুস্থানে প্রসার লাভ করিয়াছিল, কিন্তু বাহিরের আগন্তুকগণকে তাঁহাদের পঙ্‌ক্তিতে আনিতে পারে নাই। এইজন্য বৌদ্ধ ধর্ম যখন হিন্দুস্থান হইতে ক্রমশঃ দূরে যাইয়া দেশ দেশান্তরে অভিযান করিতেছিল, তখন জৈন ধর্ম স্বীয় জন্মস্থানকে অধিকতর জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজের কুক্ষীগত হইয়াছিল।

'সামান্য ফল সুত্তে'(শ্রমণ্য-ফল সূত্রে) দেখা যায় যে বুদ্ধদেবের সময়েই উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে আধ্যাত্মিক নানারূপ মতবাদের দরুণ ধর্মনীতি অতি জটিল ভাব ধারণ করিয়াছিল। অজাতশত্রু তৎকালের সুপ্রসিদ্ধ অনেক সাধু সন্ন্যাসীর নিকট গিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহাদের সূক্ষ্ম বিচার ও গবেষণামূলক চিন্তার আড়ম্বর তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই; বুদ্ধদেবের উপদেশে তিনি

ভিন্নধর্মীয়দের মধ্যে প্রচলিত লোককথা মাত্র। দিগম্বর জৈন সাধু ময়ূরপুচ্ছ শিরে ধারণ করেন না, পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র প্রাণী নিকটে আসিলে তাহাকে দূরে সরাইবার জন্য ব্যবহার করেন মাত্র।

শান্তি পাইয়াছিলেন। অজাতশত্রুর সময়েই আমরা নিগ্রন্থ জ্ঞাতপুত্রের কথা পাইয়াছি, ইনি একজন জৈন তীর্থংকর। বস্তুতঃ বুদ্ধের পূর্বেই জৈন ধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। জৈনগণ কহিয়া থাকেন, ঋষভদেবই তাঁহাদের প্রথম তীর্থংকর। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, ইনি রাজবৈভব ত্যাগ করিয়া নগ্ন সন্ন্যাসীরূপে বনে যাইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। ঋষভদেব কোশলরাজ নাভি ও রাজ্ঞী মরুদেবীর পুত্র।[৯] তৎকালে প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি স্বীয় যমজ ভগিনী সুমঙ্গলাকে বিবাহ করেন।[১০] ঋষভদেবকে কেহ কেহ 'আদিনাথ' নামে অভিহিত করেন।

প্রথম তীর্থংকর হইতে পার্শ্বনাথ ২৩শ স্থানীয় এবং মহাবীর ২৪শ তীর্থংকর। জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু শাস্ত্রে এই সম্প্রদায় নানা নামে পরিচিত। ইঁহারা সংসারের বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত এজন্য 'নিগ্রন্থ', ইঁহারা ইন্দ্রিয় বিজয়ী এজন্য 'অরিহন্তা' (অর্হৎ)।[১১] ইঁহারা পৃথিবীর সমস্ত লোভ ও আকর্ষণ তপোবলে জয় করিয়াছেন, এজন্য ইঁহারা 'জিন' (জয়ী) ; ইঁহাদের সন্ন্যাসীরা 'শ্রাবক' ও সন্ন্যাসিনীরা 'শ্রাবিকা' নামে অভিহিত।[১২] জৈনগণ দাবী করেন বৌদ্ধধর্ম জৈন ধর্মের শাখামাত্র ("It is very likely that future researches will throw a flood of light on the theory that Buddhism is ratther a branch of Jainism"—*An Epitome of Jainism* by Puran Chand Naher & S. Ghosh, Introduction p. 3)। বস্তুতঃ জৈন ধর্মের ধর্মমতের সহিত বৌদ্ধ মতের একটি স্থানে বিশেষ ঐক্য দৃষ্ট হয়, উভয় ধর্মই নিরীশ্বরবাদী। জৈনদিগের ধর্মশাস্ত্র ও ন্যায়

৯ ঋষভদেবের পিতা নাভি 'কুলকর' ছিলেন। বস্তুতঃ ঋষভদেবই কোশল রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ও রাজা। অযোধ্যার তখন নাম ছিল বিনিতা।

১০ কিম্বদন্তী অনুসারে সেকালে পিতা-মাতা পরিণত বয়সে যমজ পুত্র-কন্যার জন্ম দিতেন এবং তাহারাও অনুরূপভাবে পরিণত বয়সে আবার যমজ পুত্র কন্যার জন্ম দিত। এইজন্য এই সভ্যতাকে 'যুগলীয়' বলা হইত। দুর্ঘটনায় এক যমজপুত্রের মৃত্যু হওয়ায় সেই কন্যাকে ঋষভদেব বিবাহ করেন, তাহার নাম সুনন্দা। এভাবে বিবাহ প্রথা প্রচলিত হয়।

১১ অর্হৎ অর্থাৎ পূজ্য।

১২ জৈন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীকে শ্রমণ ও শ্রমণী বা সাধু ও সাধ্বী বলা হয়। জৈন গৃহী পুরুষকে শ্রাবক ও স্ত্রীকে শ্রাবিকা বলা হয়।

এরূপ বিপুল ও সুসমৃদ্ধিপূর্ণ তত্ত্বপূর্ণ যে সারা জীবনের আলোচনায়ও তাহার কিনারা করা যাইতে পারে না। জৈনেরা অর্থশালী ও প্রভাবাপন্ন সম্প্রদায়, তাঁহারা এককালে মঠ-মন্দিরাদির জন্য যেরূপ মুক্ত হস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন, সেই কাহিনী ভারতীয় প্রাচীন কীর্তিশালার একটি বিশেষ অধ্যায় অধিকার করিয়া আছে। অথচ দুঃখের বিষয় তাঁহাদের প্রাচীন শাস্ত্র ও ইতিহাসের উদ্ধার কল্পে তাঁহারা বিশেষ কিছুই করেন নাই।

মথুরার স্তূপ জৈনকীর্তির প্রায় দুই সহস্র বৎসরের সাক্ষ্য দিতেছে; কেহ কেহ বলেন, বেদে জৈনদের যে উল্লেখ দৃষ্ট হয়—তদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে জৈন-মত বেদের সমসাময়িক কিংবা তদপেক্ষাও প্রাচীন।

যাহা হউক ২৩শ সংখ্যক তীর্থংকর পার্শ্বনাথ ও তৎপরবর্তী মহাবীরের সময় হইতেই জৈন ধর্ম এদেশে বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ ভিন্ন জৈন ধর্মাবলম্বী অন্য কোন দেশে আছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। কিন্তু এদেশে—রাজপুতানা, গুজরাট, পাঞ্জাব এবং দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে—ইঁহারা সংখ্যায় প্রবল। ইঁহাদের অর্থসম্পদ ও বাণিজ্যে কৃতিত্ব ভারতবর্ষে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত।

এই বাঙলাদেশে ইঁহাদের প্রভাব খুবই বেশী ছিল। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে বৌদ্ধধর্মের ন্যায় জৈন ধর্মও বিলুপ্ত হইয়াছিল; তথাপি সেদিন পর্যন্তও জগৎ শেঠ ভ্রাতারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনশালী ছিলেন। খাস বাঙালীদের মধ্যে জৈন ধর্ম অল্পই আছে। যখন ভক্তির বন্যায় দেশ ভাসিয়া গেল, সেই সঙ্গে এদেশ-বাসীরা নিরীশ্বরবাদের কলঙ্ক এ স্থান হইতে একবারে মুছিয়া ফেলিলেন। আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি, হাতীর পায়ের নীচে নিষ্পেশিত হইলেও জৈন মন্দিরে প্রবেশ করিবে না—এরূপ নিষেধ বিধি জনসাধারণের মধ্যে এক সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু মৃত্তিকা-নিম্নে এ দেশের নানা-স্থানে এত অধিক পরিমাণে তীর্থংকর মূর্তি আবিষ্কৃত হইতেছে যে এক সময়ে এই ধর্মের প্রভাব যে খুব বেশী ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। যে সকল মন্দিরে ভগবানের স্থানে মানুষকে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছে—এবং তাঁহার জন্য আরতি জ্বলে না, ভোগ প্রস্তুত হয় না, প্রেম ভক্তির আতিশয্যের দিনে হিন্দুগণ সেই সকল মন্দির অস্পৃশ্য মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু যেরূপ জৈন

তীর্থংকরদিগের বহু প্রাচীন মূর্তি দ্বারা এককালে এই ধর্মের প্রভাব প্রমাণিত হয়, তেমনই অনুমান ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঘটিত কূট তর্কে আমাদের নব্যন্যায় যে এক সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন ন্যায়ের চিন্তাশীলতা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাহাও সহজেই অনুমেয়। অনুমানকে হিন্দুগণ বিশেষরূপে আশ্রয় করিয়াই একমাত্র প্রত্যক্ষবাদের শ্রেষ্ঠত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। এদেশের মহাস্থানে[১৩] এক সময়ে জৈন ধর্মনেতা ভদ্রবাহু জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। ইনি অশোকের পিতামহ সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু ছিলেন। এক সময় মগধ, অঙ্গ ও কোশল রাজ্যে জৈন ধর্ম প্রবল হইয়া তাহা রাষ্ট্র কেন্দ্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। আমাদের দেশে ধারাবাহিক ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে, আমরা যাহা এখন দেখিতে পাই না, তাহা কোন কালেই ছিল না, বলিয়া মনে করিয়া থাকি এবং যাহা আছে—তাহা সৃষ্টিকাল হইতেই বিদ্যমান, এরূপ সংস্কার পোষণ করি।

এদেশে এককালে জৈন ধর্মের প্রাধান্যের প্রধান প্রমাণ, এই যে নেমিনাথ ও পার্শ্বনাথ প্রভৃতি তীর্থংকরদের এই অঞ্চলটি এক সময়ে প্রধান ধর্মক্ষেত্র ছিল। পার্শ্বনাথ পাহাড় (সমেৎ শিখর) এখনও জৈনদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

পার্শ্বনাথ খৃঃ পূঃ ৮৭৭ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া খৃঃ পূঃ ৭৭৭ অব্দে বঙ্গদেশের তন্নামে অভিহিত পাহাড়ে মোক্ষপ্রাপ্ত হন। পরবর্তী তীর্থংকর বর্দ্ধমান মহাবীর সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। বৈশালী নগরের নিকট কুণ্ডগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। বৈশালীর রাজা চেতকের ভগিনী ত্রিশলাদেবী ইঁহার মাতা। চেতক রাজার কন্যা চেলেনা বিম্বিসার রাজার রাজ্ঞী; সুতরাং ঐ সকল রাজাদের দরবারে এক সময় তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। পিতা ও মাতার মৃত্যুর পর মহাবীর ৩১ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসের ১২ বৎসর পর্যন্ত ইনি জৈন ধর্ম প্রচার করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ৪১ বৎসর বয়সে জীবন্মুক্ত হইয়া ৭২ বৎসরে তিরোহিত

১৩ এ বিষয়ে সকলে একমত নহেন। ভিন্ন মতে তিনি মগধের অধিবাসী ছিলেন। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের গুরু ছিলেন কিনা সে সম্পর্কেও মতদ্বৈধতা বর্তমান।

হন ; পোয়াপুরী পাহাড়ে[১৪] তাঁহার লীলাবসান হয়। ঐ স্থান বর্তমান বিহারের অতি নিকটবর্তী, তাঁহার তিরোধান খৃঃ পূঃ ৫২৭ অব্দে ঘটিয়াছিল।

রাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। এই সময়ে মগধের জৈন সঙ্ঘের অধ্যক্ষ, রাজগুরু ভদ্রবাহু তাঁহার শিষ্যদিগকে লইয়া কর্ণাটে গমন করেন। তথায় তিনি দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, বিদেশে অবস্থানকালে তৎস্থলে অভিষিক্ত মগধের জৈন ধর্মাধ্যক্ষ স্থূলভদ্র পূর্বা-চরিত জৈন ধর্মের অনেক পরিবর্তন সাধন করেন। জৈন ভিক্ষুমাত্রই সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকিবেন এই ছিল নিয়ম। কিন্তু স্থূলভদ্রের দল শ্বেতাম্বর পরিধানের পক্ষপাতী হইলেন। ভদ্রবাহু দ্বাদশ বৎসর পর ফিরিয়া আসিয়া নব প্রবর্তিত নিয়ম অনুমোদন করেন নাই। তাঁহার মত ছিল, নির্গ্রন্থগণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কার বর্জিত হইবেন। যাঁহারা পার্থিব সংস্কারের বশবর্তী হইয়া জৈনদের সনাতন উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে তিনি ও তাঁহার দল পঙ্‌ক্তি রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। দুই দলের মধ্যে অনেক দিন ধরিয়া তর্ক যুদ্ধ চলিল। অবশেষে ৭৮ খৃঃ অব্দে ইঁহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। দিগম্বরেরা বলেন—দেহ এবং দেহের সংস্কার যে রক্ষা করিবে সে আবার নির্গ্রন্থ হইবে কেমন করিয়া? শ্বেতাম্বরী লোক সমাজে চলা-ফেরার সময়ে শ্বেতবস্ত্র পরিয়া বাহির হইবার পক্ষপাতী হইলেন।[১৫]

কিন্তু কি বৈষ্ণব ধর্ম, কি সহজিয়া ধর্ম, কি ত্যাগ ধর্ম বাঙালীরা যাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আদর্শের ঈষন্মাত্র ক্ষুণ্ণতা তাঁহারা অনুমোদন করেন

১৪ পাবাপুরী ; পাহাড় নয়, গ্রাম। বর্তমান বিহার সরিফ হইতে ১৭ মাইল দূরে অবস্থিত। তাঁহার নির্বাণ স্থানে গাঁও মন্দির ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া স্থানে জল মন্দির নির্মিত হইয়াছে।

১৫ ভগবান মহাবীরের সময়ও বস্ত্রহীন ও বস্ত্রধারী সাধু বর্তমান ছিলেন। তাই জৈন ভিক্ষু-মাত্রই উলঙ্গ থাকিবেন এই ছিল নিয়ম তাহা ঠিক নহে বা স্থূলভদ্র বস্ত্র পরিধানের কোনো নিয়মও প্রবর্তন করেন নাই। যে ভদ্রবাহু দাক্ষিণাত্যে গমন করেন তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসেন নাই। শ্রবণ বেলগোলে তাঁহার দেহাবসান হয়। সুতরাং দ্বাদশবর্ষ পর ফিরিয়া আসিয়া নব প্রবর্তিত নিয়ম অনুমোদন করেন নাই—এই প্রশ্নই ওঠে না। শ্বেতাম্বরীরা লোক সমাজে চলা-ফেরার সময়ে শ্বেতবস্ত্র পরিধানের পক্ষপাতী তাহাও ঠিক নহে। যাঁহারা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন তাঁহারা সর্বদাই শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন। এখানে আরো মনে রাখা উচিত যে ভগবান মহাবীরের আর্যা চান্দনার অধীনে এক বিশাল শ্রমণী সংঘ ছিল।

নাই। পার্থিবতার অনুরোধ বা সমাজ বিধি তাঁহাকে ভূমা হইতে একটু মাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সুতরাং কপটাচারী ভ্রাতার হস্তে খড়্গ দিয়া কালু ডোম নিজ গ্রীবা বাড়াইয়া দিলেন; কল্পতরু সাজিয়া রাজা প্রতাপাদিত্য তাঁহার রাজ্ঞীকে পর্যন্ত দান করিয়া ফেলিলেন; কর্ণ এক ফোটা চোখের জল না ফেলিয়া স্বীয় পুত্র বৃষকেতুর মস্তক নিজে ছেদন করিলেন; এই সকল প্রবাদ ঐতিহাসিক ভিত্তিহীন হইলেও বঙ্গের চিন্তা ধারার যে উচ্চাঙ্গ প্রদর্শন করে—তদ্দারা বাঙালীর এই বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন হয় যে এ-জাতি তাঁহাদের চিন্তা বা কর্মে কিছুতেই অল্পে সন্তুষ্ট হইবার নহে, যাহা কিছু বাঙালী করিবে—তাহার চূড়ান্ত অভিনয় না করিয়া ছাড়িবে না। দৈহিক সংস্কার ত্যাগ করিয়া যিনি নিগ্রর্ন্থ হইবেন—তাঁহার আবার বস্ত্রের উপর লোভ অথবা নগ্ন হওয়ার ভীতি কেন? বাঙালী ভদ্রবাহু দিগম্বরত্বের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। এইরূপ দিগম্বর সন্ন্যাসীর মূর্তি বাঙালী চিত্রকরেরা অনেক আঁকিয়াছেন। সহজিয়ারা প্রচার করিলেন স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলেও তাহার প্রতি ভালবাসা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে, "প্রণয় করিয়া ভাঙয়ে যে, সাধন অঙ্গ পায় না সে" (চণ্ডীদাস); পরের স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা স্বকীয় হইতে শ্রেষ্ঠ। এই সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ মূলক সতীত্বের রাজ্যে নির্ভীক ভাবে বৈষ্ণব কবি গাহিলেন:

"ননদিনী বল গিয়া নগরে
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী
কৃষ্ণ প্রেম কলঙ্ক-সাগরে।"

এইরূপ সমাজবিধি, শাস্ত্রবিধির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সাধারণের অনধিগম্য ভাবের রাজ্যে শেষ পর্যন্ত ডঙ্কা বাজাইয়া স্বীয় মত প্রচার করার দুঃসাহস বোধ হয় বাঙালীর মত অন্য কোন জাতি খুব কমই দেখাইয়াছে।

সুতরাং লোক সমাজে চলিতেও নিগ্রর্ন্থদিগকে উলঙ্গ হইয়া চলিতে হইবে,—আদর্শকে একটুমাত্র খর্ব করিতে দেওয়া হইবে না, এই মতে বাঙালী ভদ্রবাহু ও তাঁহার দল দৃঢ় হইয়া রহিলেন। এদিকে পার্শ্বনাথ প্রভৃতি তীর্থংকর-

গণের সঙ্গে বাঙলার দীর্ঘকাল ব্যাপী অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের ফলে জৈন ধর্ম যে এই দেশে কতকটা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। বঙ্গদেশের সঙ্গে জৈন ধর্মের যে ঘনিষ্ঠ সংশ্রব হইয়াছিল—সে ইতিহাস উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা আমাদের উচিত।

[ক্রমশঃ

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
দ্বিতীয় বর্ষ ॥ ভাদ্র ১৩৮১ ॥ পঞ্চম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :
গণেশ লালওয়ানী

পার্শ্বনাথ, কাঁটাবেনিয়া, সুন্দরবন

বর্দ্ধমান-মহাবীর

[জীবন চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

বর্দ্ধমান চলেছেন সিদ্ধার্থপুর হয়ে কূর্মগ্রামের দিকে।

পথের মধ্যে এক তিল গাছকে মাথা গজিয়ে উঠতে দেখে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন গোশালক। ভগবন্, এই গাছে কী শুঁটি ধরবে? তিল হবে?

বর্দ্ধমান বললেন, হাঁ গোশালক, এই গাছে সাতটী পুষ্প জীব রয়েছে। এতে একটী শুঁটি হবে। তাতে সাতটী তিল বীজ।

সেকথা শুনে গোশালক সেই গাছটী তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। মনের ভাব, দেখি এতে কি করে সাতটী তিল বীজ হয়!

যদি না হয় তবে নিয়তিবাদ অসত্য। বর্দ্ধমান সর্বজ্ঞ নন।

বর্দ্ধমান সেদিকে চেয়ে একটু হাসলেন, কিছু বললেন না।

তারপর তাঁরা এলেন কূর্মগ্রামে। বেলা তখন দ্বিপ্রহর।

সেই দ্বিপ্রহরের রোদে কূর্মগ্রামের বাইরে এক আধাবয়সী যুবক বৃক্ষের ডাল হতে ঝুলে নিম্নমুখ ও ঊর্দ্ধপদ হয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে তপস্যা করছিল। তার আলুলায়িত জটা হতে রোদের তাপে ব্যাকুল হয়ে উকুন থেকে থেকে মাটীতে ঝরে পড়ছিল আর সে তাদের তুলে তুলে আবার মাথায় রাখছিল।

সেদিকে চেয়ে গোশালকের বিস্ময়ের সীমা 'নেই। মনে মনে ভাবছেন এই উকুন পোষা সন্ন্যাসী মানুষ না পিশাচ?

মানুষই, পিশাচ নয়। এই তরুণ সন্ন্যাসীর নাম বৈশ্যায়ন।

বৈশ্যায়নের প্রথম জীবনের ইতিহাস যেমন করুণ তেমনি বৈচিত্রপূর্ণ।

বৈশ্যায়নের বয়স যখন দুই, তখন তাদের বাড়ীতে একবার ডাকাত পড়ে। ডাকাতেরা তার বাবাকে হত্যা করে তাদের ঘরে যা কিছু ছিল তা লুট

করে নিয়ে যায় ও সেই সঙ্গে তার মাকেও ধরে নিয়ে যায়। এবং তাকে তার মার কোল হতে ছিনিয়ে এক গাছের তলায় ফেলে দিয়ে যায়।

বৈশ্যায়নের হয়ত সেইখানে সেই ভাবেই মৃত্যু হত। কিন্তু তার আয়ু ছিল। তাই তাদের চলে যাবার পর পরই সে পথ দিয়ে এল গোবর গ্রামের আভীর গোশংখী। গোশংখী অসহায় বালককে গাছের তলায় পড়ে থাকতে দেখে তুলে ঘরে নিয়ে গেল ও নিজের সন্তানের মতো প্রতিপালন করতে লাগল।

বৈশ্যায়ন ক্রমে বড় হয়ে উঠল।

বৈশ্যায়নের যখন বোঝবার মতো বয়স হল তখন গোশংখী তাকে সমস্ত কথা খুলে বলল। তারপর তার হাতের কবচে আঁকা মার মুখের ছবি দেখিয়ে বলল এই তোমার সত্যিকার মা। কিন্তু বৈশ্যায়নের নিজের মার কথা তেমন মনে পড়ে না।

বৈশ্যায়ন আরো বড় হয়ে উঠল। তারপর কোনো কার্যোপলক্ষে একবার চম্পা নগরীতে এল। সেখানে সে বয়স্যদের সঙ্গে পড়ে এক গণিকালয়ে গেল।

গণিকালয়ে যে তার পরিচর্যা করতে এল, বৈশ্যায়ন দেখল তার মুখের সঙ্গে কবচে আঁকা মায়ের মুখের হুবহু মিল।

বৈশ্যায়ন তখন তাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু সে তাকে তার কি পরিচয় দেবে! শেষে বৈশ্যায়নের আগ্রহাতিশয্যে ডাকাতেরা যে ভাবে তার স্বামীকে হত্যা করে তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সেকথা খুলে বলল। শেষে চম্পানগরীর এক গণিকার কাছে তারা তাকে বিক্রয় করে দেয়। সেই হতে সে এখানে আছে।

সে কথা শুনে বৈশ্যায়ন তাকে নিজের পরিচয় দিল।

বৈশ্যায়নের মা তখন লজ্জায় দুঃখে আত্মহত্যা করতে গেলেন। কিন্তু বৈশ্যায়ন তাঁকে আত্মহত্যা হতে নিবৃত্ত করে সেই গণিকার কাছ হতে পুনরায় ক্রয় করে নিল ও সদ্‌গুরুর কাছে নিয়ে গিয়ে প্রণাম দীক্ষা দেওয়াল। বৈশ্যায়ন নিজেও এই ঘটনায় সংসার বিরক্ত হয়ে প্রাণায়াম দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেল।

গোশালকের বাক-সংযম কোনো কালেই ছিল না। তাই বৈশ্যায়নকে দেখিয়ে দেখিয়ে সে বর্দ্ধমানকে বলতে লাগল, দেবার্য, এ মানুষ না পিশাচ?

সে কথা বৈশ্যায়নের কানে গেল।

বৈশ্যায়ন প্রথমে তা উপেক্ষার ভাবে গ্রহণ করল কিন্তু শেষে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। ক্রুদ্ধ হয়ে সে তার তপস্যালব্ধ তেজোলেশ্যা গোশালকের ওপর প্রয়োগ করল।

তেজোলেশ্যায় প্রথমে দাহ হয় তারপর মৃত্যু।

বর্দ্ধমান সঙ্গে সঙ্গে শীত লেশ্যার প্রয়োগ করে সেই তেজোলেশ্যাকে ব্যর্থ করে দিলেন।

বৈশ্যায়ন তখন বর্দ্ধমানকে উদ্দেশ করে বলল, এ যাত্রা ও খুব বেঁচে গেল। ও আপনার শিষ্য তা জানতাম না।

গোশালক প্রথমে ও কথার তাৎপর্যই বুঝতে পারলেন না। তারপর যখন বুঝতে পারলেন তখন এই তেজোলেশ্যা তাঁকেও পেতে হবে সে কথা তাঁর মনে এল। তিনি তখন বর্দ্ধমানকে কি করে এই তেজোলেশ্যা লাভ করা যায় সেকথা জিজ্ঞাসা করলেন।

বর্দ্ধমান বললেন, গোশালক, কেউ যদি ছ'মাস এক মুঠো কলাই ও এক আঁজলা গরম জল খেয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে তপস্যা করে তবে সে এই তেজোলেশ্যা লাভ করবে।

মাস খানেক পরে কূর্মগ্রাম হয়ে আবার সিদ্ধার্থপুরীর দিকেই ফিরছেন বর্দ্ধমান।

গোশালক যেখানে গাছটী তুলে ফেলে দিয়েছিলেন সেখানে আসতেই তাঁর সেকথা মনে পড়ে গেল। তিনি তখন বর্দ্ধমানের দিকে চেয়ে বললেন, ভগবন্‌, নিয়তিবাদের সিদ্ধান্ত তা হলে ঠিক নয় আর আপনিও সর্বদর্শী নন?

বর্দ্ধমান বললেন, কেন গোশালক?

কেন আর কেন? আপনি যে গাছে একটী শুঁটি ও সাতটি তিল বীজ হবে বলে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তা মিথ্যা হয়ে গেছে।

বর্দ্ধমান বললেন, না গোশালক, তুমি যে গাছটা তুলে ফেলে দিয়ে ছিলে সে ওই গাছ। ওই গাছে একটাই শুঁটি হয়েছে ও সাতটা তিল বীজ। বলে তাঁকে অদূরের একটা গাছ দেখিয়ে দিলেন।

গোশালক নিকটে গিয়ে দেখলেন ঠিক তাই। গাছটা একটু কাত হয়ে উঠেছে।

বর্দ্ধমান বললেন, গোশালক, আমরা চলে যাবার পর পরই এখানে এক পশলা বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিতে মাটি কাদা কাদা হয়ে যায়। সেই মাটীতে গরুর পায়ের খুরের চাপে তুমি যে গাছটা তুলে ফেলে দিয়ে ছিলে তার শেঁকড় বসে যায়। তাই গাছটা ঠিক সোজা না উঠে একটু কাৎ হয়ে উঠেছে।

গোশালকের নিয়তিবাদ সম্পর্কে আর কোনো সংশয় নেই। নিয়তি বশেই মানুষ জন্মগ্রহণ করে, নিয়তি বশেই মৃত্যুবরণ। নিয়তি বশেই মানুষ সংসার পরিভ্রমণ করে। মোক্ষের জন্য তবে বৃথাই কৃচ্ছ্রসাধন। মুক্তি যদি তিনি লাভ করেন তবে তা নিয়তি বশেই লাভ করবেন।

গোশালকের তখন মনে হল তিনি যদি ওই তেজোলেশ্যা লাভ করতে পারেন আর ভবিষ্যৎবাণী করবার জন্য সামান্য জ্যোতিষ তবে তিনি এক নূতন ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা করতে পারেন ও লোক সমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করে সুখে বিচরণ করতে পারেন।

গোশালক তখন বর্দ্ধমানের সঙ্গ ত্যাগ করে শ্রাবস্তীতে এসে উপস্থিত হলেন ও সেখানে হালাহলার ভাণ্ডশালায় অবস্থান করে বর্দ্ধমান নির্দিষ্ট উপায়ে তেজোলেশ্যা অধিগত করলেন। তারপর পরপর শোণ, কলিন্দ, কর্ণিকার, অচ্ছিদ্র, অগ্নিবেশান ও অর্জুনের কাছে জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা করে সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করবার ক্ষমতা অর্জন করলেন। এভাবে সিদ্ধবাক হয়ে গোশালক আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করলেন ও নিজেকে তীর্থংকর বলে ঘোষণা করে দিলেন। তাঁর প্রধান উপাসিকা ও সহায়িকা হলেন হালাহলা।

বর্দ্ধমান তাঁর তপস্যা ও যোগানুষ্ঠানে তেজোলেশ্যা অধিগত করেছেন ও শীতলেশ্যা; লোকাবধিজ্ঞানে তিনি সমস্ত বস্তুই প্রত্যক্ষ দেখতে পান। তাই ভবিষ্যৎবাণী করা তাঁর পক্ষে কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু তিনি ত খ্যাতি-

প্রতিপত্তি, বিষয়-বৈভব এসব কিছু চান না। তাই তাদের প্রয়োগের কথা ভাবতেই পারেন না। তিনি চান অনুপম শান্তি, অনুপম মুক্তি, অনুপম জ্ঞান, অনুপম চারিত্র। বর্দ্ধমান তাই গোশালক চলে যাবার পর দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এলেন বৈশালী। বৈশালী হতে বাণিজ্যগ্রাম, বাণিজ্য-গ্রাম হতে শ্রাবস্তী। শ্রাবস্তীতে তিনি দশম চাতুর্মাস্য ব্যতীত করলেন।

চাতুর্মাস্য শেষ হতে তিনি শ্রাবস্তী পরিত্যাগ করে এলেন সানুলঠ্ঠিয়। সেখানে তিনি ভদ্র, মহাভদ্র ও সর্বতোভদ্র প্রতিমার আরাধনা করে ধ্যানমগ্ন রইলেন।

ভদ্র প্রতিমা আরাধনা অর্থ পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চার দিকে চার প্রহর কায়োৎসর্গ করা। এর পরিমাণ দুই অহোরাত্র।

মহাভদ্র প্রতিমা আরাধনা অর্থ পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চার দিকে এক অহোরাত্র কায়োৎসর্গ করা। এর পরিমাণ চার অহোরাত্র।

সর্বতোভদ্র প্রতিমার আরাধনা অর্থ শুধু পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এই চার দিকেই নয়; ঈশান, অগ্নি, নৈঋত, বায়ু, উর্দ্ধ, অধঃ সহ দশ দিকে দশ অহোরাত্র কায়োৎসর্গ করা। এর পরিমাণ দশ অহোরাত্র।

ষোল দিন তাই বর্দ্ধমান নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে মগ্ন রইলেন।

সানুলঠ্ঠিয় হতে বর্দ্ধমান গেলেন দৃঢ়ভূমির দিকে। সেখানে পোঢাল গ্রামে পোঢাল উদ্যানে পোলাস চৈত্যে মহাপ্রতিমার আরাধনা করলেন।

মহাপ্রতিমার আরাধনায় তিন দিন উপবাসের পর শিলাখণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে শরীরকে সামনের দিকে ঈষৎ আনমিত করে হাত দুটী সামনে প্রসারিত করতে হয়। তারপর কোনো রুক্ষ পদার্থে সমগ্র দৃষ্টি কেন্দ্রিত করে সমস্ত রাত্রি ধ্যান করতে হয়।

বর্দ্ধমানের এই উৎকৃষ্ট ধ্যানে স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্র বর্দ্ধমানের প্রশংসা করে বললেন, বর্দ্ধমানের মতো ধ্যানী সংসারে আর দ্বিতীয় নেই। তিনি যে ধ্যানাবস্থা লাভ করেছেন দেবতারাও তা হতে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

সেকথা সংগমক নামক এক দেবতার বিশ্বাস হল না। তিনি তাই

বর্দ্ধমানকে পরীক্ষা করবার জন্য স্বর্গ হতে বর্দ্ধমান যেখানে ধ্যানমগ্ন ছিলেন সেখানে নেমে এলেন। এসে প্রলয়কালীন ধূলোবৃষ্টি করলেন। সেই ধূলো বর্দ্ধমানের চোখ, কান ও নাকের ভেতর দিয়ে শরীরের ভেতর প্রবেশ করল। কিন্তু তাতে বর্দ্ধমানের ধ্যান ভঙ্গ হল না।

ধূলোবৃষ্টি শান্ত হতেই বজ্রের মতো তীক্ষ্ণ মুখবিশিষ্ট পিঁপড়ের সৃষ্টি করলেন। সেই পিঁপড়ে তাঁর শরীরের সমস্ত মাংস খুঁটে খুঁটে খেল।

তারপর তিনি মশকের সৃষ্টি করলেন। তারা বর্দ্ধমানের শরীরে দংশন করে রক্তপান করল। সেই সময় তাঁর শরীর হতে দুগ্ধ ধারার মতো যে রক্তধারা প্রবাহিত হল তাতে তাঁকে মনে হল যেন প্রস্রবণযুক্ত এক গিরিরাজ ধ্যান সমাহিত রয়েছেন।

মশকের উৎপাত শান্ত হতে না হতেই তিনি সহস্র উই-এর সৃষ্টি করলেন। তারা তাঁর গায়ে সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে দংশন করল। দেখে মনে হল, কে যেন তাঁর গায়ে কদম্ব কেশরের মতো কেশর ফুটিয়ে দিয়ে গেছে।

তারপর তিনি ভয়ঙ্কর বিছের সৃষ্টি করলেন যার বিষ মত্ত মাতঙ্গেরও প্রাণ হরণ করে। তারা বর্দ্ধমানের সর্বাঙ্গে দংশন করে ফিরল।

বর্দ্ধমানের যখন তাতেও ধ্যানভঙ্গ হল না। তখন সংগমক নেউলের সৃষ্টি করলেন। তারা বিকট চীৎকার করতে করতে তাঁর দিকে ছুটে গেল ও তাঁর দেহ হতে মাংস খণ্ড টেনে টেনে ছিঁড়তে লাগল।

নেউলের পর তিনি সাপের সৃষ্টি করলেন তারা তাঁর দেহ বেষ্টন করে দংশন করল। ততক্ষণ দংশন করল যতক্ষণ না নির্বিষ হয়ে তারা তাঁর দেহ হতে বিশ্লিষ্ট হয়ে মাটীতে পড়ে গেল।

তারপর তিনি তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা মূষিকের সৃষ্টি করলেন। তারা তাঁর দেহকে জীর্ণ চীবরের মতো ছিন্নভিন্ন করল।

মূষিকেরা নিরস্ত হলে তিনি দীর্ঘদন্ত হস্তীদের সৃষ্টি করলেন। তারা তাঁর আয়ত বুকে সেই দন্ত দিয়ে আঘাত করল। সেই আঘাতে তাঁর বক্ষাস্থি হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হল কিন্তু তবু তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হল না।

সংগমক তখন হস্তিনীদের সৃষ্টি করলেন। তারা তাঁর দেহ নিয়ে কন্দুকের মতো লোফালুফি করল।

তাতেও যখন বর্দ্ধমানের ধ্যানভঙ্গ হল না তখন সংগমক নিজে পিশাচ রূপ ধারণ করে বর্শা দিয়ে তাঁকে বিদ্ধ করল।

ব্যাঘ্র হয়ে নখর দিয়ে তাঁর শরীর বিদীর্ণ করল।

তাতেও যখন তাঁকে ধ্যানচ্যুত করতে পারলেন না তখন তিনি ত্রিশলা ও সিদ্ধার্থের রূপ পরিগ্রহ করে তাঁর সামনে এসে বিলাপ করে বলতে লাগলেন, বর্দ্ধমান, তুমি আমাদের বৃদ্ধাবস্থায় কোথায় ফেলে চলে গেলে? ভেবেছিলাম তুমি আমাদের সেবা করবে, যত্ন নেবে। তোমাকে নিয়ে আমাদের কত আশা ছিল, কত সাধ। সব আশা নির্মূল হয়ে গেল।

বর্দ্ধমান সেই উপসর্গেও অবিচলিত রইলেন।

সংগমক তখন সেখানে এক স্কন্ধাবারের সৃষ্টি করলেন। স্কন্ধাবারের সূপকারেরা বর্দ্ধমানের পা দুটোকে উনুন করে অগ্নি প্রজ্বালিত করলো। সেই অগ্নি বর্দ্ধমানের সমস্ত শরীর দগ্ধ করল। দগ্ধ হয়েও বর্দ্ধমান পুড়ে গেলেন না। অনলদগ্ধ স্বর্ণের মতো তাঁর শরীর আরো কান্তিমান হয়ে উঠল। সেই অনলে বর্দ্ধমানের কর্মরূপী কাষ্ঠসমূহ দগ্ধ হয়ে গেল।

সংগমক তাঁকে ধ্যানচ্যুত করতে বারবার অসমর্থ হয়ে নিজের কাছে লজ্জিত হলেন কিন্তু অহমিকা বশে নিজের পরাজয় স্বীকার করে নিতে পারলেন না। তাই তিনি নিরস্ত না হয়ে তাঁকে আরো উৎপীড়ন করতে লাগলেন। চণ্ডাল হয়ে তাঁর দেহকে দণ্ডের মতো ব্যবহার করে শৃঙ্খলাবদ্ধ নানা ধরণের পাখী তাঁর গায়ে ঝুলিয়ে দিলেন। তারা চঞ্চু ও নখর দিয়ে তাঁর দেহকে বিক্ষত করল।

তারপর তিনি এক প্রবল বাত্যার সৃষ্টি করলেন। বাত্যায় বৃক্ষমূল উৎপাটিত হল, সৌধশ্রেণী ভগ্ন হল। বর্দ্ধমানও কয়েকবার আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ভূতলে পতিত হলেন তবু বর্দ্ধমানের ধ্যান ভঙ্গ হল না।

সংগমক তখন বাত্যাবর্তের সৃষ্টি করলেন। বাত্যাবর্তে বর্দ্ধমান চক্রের মতো ঘুরতে লাগলেন।

তাতেও যখন বর্দ্ধমানের ধ্যান ভঙ্গ হল না তখন সংগমক ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ওপর কালচক্র নিক্ষেপ করলেন। কালচক্রের আঘাতে হাঁটু অবধি বর্দ্ধমানের শরীর মাটীতে প্রোথিত হল। তবু তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হল না।

প্রতিকূল উপসর্গে সংগমক যখন তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে সমর্থ হলেন না তখন তিনি অনুকূল উপসর্গের সৃষ্টি করলেন। বৈমানিক দেবতা হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, বর্দ্ধমান, তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট হয়েছি। বল তোমার কি চাই? —ধন, জন, সুখ, আয়ু এমন কি স্বর্গীয় বৈভবও আমি তোমায় দিতে পারি।

বর্দ্ধমান যখন তাতেও সাড়া দিলেন না তখন তিনি বসন্ত ঋতুর সৃষ্টি করলেন। বসন্ত ঋতুর আবির্ভাবে মহূর্তেই উদ্দাম হয়ে উঠল কিংশুক বন। মাধবীলতার পরাগে গন্ধবিধুর হল দিগন্ত। অশোকের শাখায় শাখায় শিউরে উঠল রক্ত পল্লবের আলোলগুচ্ছ। বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ল আম্রমঞ্জরীর মকরন্দ। মনে হল আকাশে আকাশে কে যেন ছড়িয়ে দিয়ে গেল অনুরাগের বর্ণ, হাওয়ায় হাওয়ায় জাগিয়ে দিয়ে গেল আদিম প্রাণের উন্মাদনা।

শুধু তাই নয়, সেই বসন্তের সমাগমে সেই সুন্দর বনভূমে নেমে এল অপ্সরী ও কিন্নরার দল যাদের কটাক্ষে অতিনীল পদ্মবনের সৃষ্টি, ভ্রূলতায় পুষ্পধনুর বক্রতা, অধরের হাস্যরাগে চৈত্রদিনের প্রসূনতা, নিঃশ্বাসে মলয় পাহাড়ের দক্ষিণ বাতাস। তাদের দিকে চেয়ে কে নিজেকে সংবরণ করে নিতে পারে? কিন্তু সেই নব বসন্তের সমাগমে মধুকণ্ঠী দিব্যাঙ্গনাদের গীতস্বরেও বর্দ্ধমানের ধ্যান ভঙ্গ হল না। নিবাত দীপশিখার মতো তিনি আরো প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

সূর্যের আলো তখন ফুটতে আরম্ভ করেছে পূব আকাশে। সেই আলো ক্রমে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বর্দ্ধমান তখন মহাপ্রতিমার ধ্যানে সিদ্ধ হয়ে ধ্যান ভঙ্গ করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর চলে গেলেন বালুকার দিকে।

[ক্রমশঃ

মহাবীর

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

(অ. কৃ. ব.)

[অ. কৃ. ব'র নাম বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত। অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য তাঁর আত্ম-চরিতের অংশ বিশেষ এখানে প্রকাশিত করবার অনুমতি দিয়ে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন। —সম্পাদক]

জৈনধর্মের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটেছিল ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে। তখন আমার বয়স বারো বছর, এবং ঢাকা শহরের (বর্তমান বাংলা দেশের রাজধানী) কলেজিয়েট স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র আমি। আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইংরেজ জাতি তখন মহাগৌরবের শিখরে অধিষ্ঠিত, সারা ভারতে ইংরেজ শাসন তখন পূর্ণ গৌরবে সমাসীন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল ছিল সরকারী স্কুল, পূর্ব বাংলার সেরা স্কুল।

সেই স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী—আমার জীবনে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে চিরস্মরণীয় খান বাহাদুর তসদ্দুক আহমেদ। 'ইসলাম' শব্দটির সঙ্গে আত্ম-সমর্পণ এবং শান্তি, এই দুটি ধারণা জড়িত। এই দুটি ভাবের খাঁটি ভাবুক ছিলেন আমাদের পরম প্রিয় হেডমাষ্টার আহমেদ সাহেব। প্রকৃত নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন তিনি, স্বধর্মে নিষ্ঠা তাঁর মনে পরধর্মের প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা বা বিরূপতা ঘটায়নি। এক কথায় ধর্মীয় উৎকট গোঁড়ামি তাঁর ছিল না। আমাদের স্কুলে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য যে সব পাঠ্য গ্রন্থ (টেক্সট-বুক) নির্বাচিত হতো, তাদের নির্বাচনে তাঁরও বিশেষ অংশ ছিল। পাঠক্রম (সিলেবাস) নির্ধারণেও। আধা শতাব্দী পরে আজ আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি, সেই নীচু ক্লাসেই ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্য এবং ইতিহাস যা ক্লাসে পড়ানো হত তা থেকে বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে একটা মোটামুটি রকমের ধারণা হয়ে

গিয়েছিল, পরবর্তী জীবনে যা বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে তুলনাত্মক অনুশীলনের পক্ষে সহায়ক হয়েছে, কারণ এই অনুশীলনের আগ্রহ এবং মানসিকতা স্কুলের নীচু ক্লাসে সেই অল্প বয়সেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল।

(এখানে—একটু অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হলেও বলে রাখি—যাঁরা বলেন ইংরেজ আমাদের ভালো শিক্ষা দেয় নি, তারা তাদের শাসনকালে ভারতে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিল যা শুধু গোলাম এবং কেরানীরই সৃষ্টি করে, আমি তাঁদের সঙ্গে, একমত নাই। আমার মত তাঁদের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি আমার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তা করেই একথা বলছি।)

আমাদের ভিটে বাড়ি ছিল ঢাকা সহরের একপ্রান্তে গেণ্ডারিয়া নামক গ্রাম্য পরিবেশ যুক্ত অঞ্চলে। আমাদের বাড়ির অনতি দূরেই ছিল বিখ্যাত সাধক মহাপুরুষ আচার্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রম। আমার ৺পিতামহ ৺মাতামহ, ৺পিতৃদেব এবং মাতৃদেবী গোস্বামীজীর কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছিলেন। আমার জন্মের বহু পূর্বেই গোস্বামীজির তিরোধান ঘটেছিল, তখন আমার মাতৃদেবীই ছিলেন শিশু। সুতরাং বলাই বাহুল্য এই মহাসাধক পুরুষকে সাক্ষাৎ দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু কিছু মাত্র অতিরঞ্জন না করেই বলতে পারি বাল্যকালে গোস্বামীজির গেণ্ডারিয়া আশ্রমের পুণ্যতীর্থে অনির্বচনীয় আধ্যাত্মিক পরিবেশে আমি সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের আত্মিক উপস্থিতি অনুভব করেছি। আশ্রমটিকে কোন প্রাচীন ঋষির তপোবন বলেই মনে হত। আশ্রমের পুষ্করিণীর তীরে মন্দির, তাতে প্রতি সন্ধ্যায় বেজে উঠত আরতির ঘণ্টা। গোস্বামীজি ছিলেন প্রেম আর অহিংসার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তাঁর পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত সারা আশ্রম জুড়ে ছিল প্রেম আর অহিংসার অপরূপ আধ্যাত্মিক পরিবেশ। পুষ্করিণী তীরবর্তী মন্দিরের পাশে কুঞ্জবন। সেই কুঞ্জবনে মাটির দেয়াল এবং মেঝে যুক্ত একটী পর্ণ কুটীর। গোস্বামী প্রভুর সাধন কুটীর ছিল এটি। এই কুটীরে একটি আসনে বসে তিনি নাম জপ করতেন, সমাধিস্থ হতেন। গোস্বামী প্রভু তাঁর এই সাধন কুটীরের দেয়ালের বুকে নিজের হাতে কয়েকটী উপদেশ বাণী লিখে রেখে-ছিলেন; এই বাণীগুলি তাঁর শিষ্য পরিষদবৃন্দ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণে রেখে তারই

আলোয় নিজ নিজ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করতেন এবং করেন। সেই বাণী সমূহের মধ্যে দুটী ছিল :

অহিংসা পরম ধর্ম।
সর্ব জীবে দয়া কর।

জৈন ধর্মের এই দুটী অনুশাসন গোস্বামী প্রভুর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই অহিংসা এবং সর্ব জীবে দয়া ছিল তাঁর সাধনার দুটি প্রধান নীতি। পিতৃদেবের মুখে শুনেছি অহিংসার মাহাত্ম্য এবং শক্তি সম্পর্কে গোস্বামীজির একটী গল্প। সেটী সংক্ষেপে বলি। একজন ইংরেজ শিকারী বন্দুক নিয়ে এক বনের ভেতর বড় জানোয়ার শিকারে গিয়েছিলেন। একবার হঠাৎ এক বিরাট সিংহের মুখোমুখি পড়ে গিয়ে প্রাণ সংশয় অবস্থা, বন্দুকের গুলি চালাবার সুযোগ বা অবকাশ নেই। সিংহ আক্রমণোদ্যত, এমন সময় শিকারী সাহেব শুনতে পেলেন গম্ভীর কণ্ঠে কে যেন আদেশ করলেন, "বেটা, মত মারো। বৈঠ যাও।"

সঙ্গে সঙ্গে পশুরাজ তার উদ্যত থাবা নামিয়ে নিল। সেই গুরু গম্ভীর কণ্ঠের অধিকারী এক সৌম্যমূর্তি সন্ন্যাসী এগিয়ে আসতেই সে পোষা কুকুরের মতো যেন ভক্তি ভরেই তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ল।

ইংরেজ শিকারী এই আশ্চর্য কাণ্ড দেখে অভিভূত। কোন মন্ত্র বলে এই সন্ন্যাসী বনের এই হিংস্র পশুকে এমনভাবে বশ করেছেন যে, তাঁর একটী মাত্র আদেশে সে তার সংহার মূর্তি ভুলে এমন শান্ত হয়ে গেল।

শিকারীকে সন্ন্যাসী আদেশ করলেন—"তোমার ওই হিংসার অস্ত্র পরিত্যাগ কর। মন থেকেও হিংসা দূর কর। বনের এই পশুরা তো তোমার প্রতি কোনো অন্যায় করেনি। কেন তুমি তাদের হনন করতে চাও? আমি বনের পশুদের ঈশ্বরের জীব বলে ভালবাসি, মনে তাদের হিংসা অর্থাৎ ক্ষতি করার ইচ্ছা পোষণ করি না। তাই অবাধে এই বনে ভ্রমণ করি, কোনও পশু আমার কোন ক্ষতি করে না।"

সন্ন্যাসীর আদেশে মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেই শ্বেতাঙ্গ শিকারী তাঁর হাতের বন্দুক দূরে নিক্ষেপ করলেন। সন্ন্যাসীর অহিংসা মন্ত্রের অসাধারণ ক্ষমতা

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটেছিল তাঁর চিত্তে। সন্ন্যাসী তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নিরাপদে বনের বাইরে পৌঁছে দিলেন।

মানবেতর প্রাণীর ওপর অহিংসার অত্যাশ্চর্য প্রভাব গোস্বামীজির সাধক জীবনেও পরিস্ফুট হয়েছিল। পিতৃদেবের মুখে শুনেছি গোস্বামীজি যখন তাঁর সাধন কুটীরে বসে ধ্যানস্থ হতেন, তখন প্রায়ই একটা সাপ এসে তাঁর গা বেয়ে উঠে তাঁর মাথার উপর ফণা ধরে থাকে, তারপর আপনা থেকেই নেমে পাশের ঝোপে তার গর্তের ভেতর চলে যেত। তাঁর ভক্ত শিষ্যবৃন্দ ঐ সাপটি সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করতে তিনি বলেছিলেন, "ওকে তোমরা কিছু বোলো না, ওর যাতায়াতে কোনো রকম বাধা দিও না। ও আমার বা অন্য কারও কোনো ক্ষতি করবে না।"

শ্রদ্ধেয় গুরুজির আশ্বাসে ভক্তরা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, কারণ তাঁর কথা তাঁরা বেদবাক্যের মতো বিশ্বাস করতেন। বলাবাহুল্য সাপটি গোস্বামী প্রভুর বা অন্য কারও কিছুমাত্র ক্ষতি করে নি।

বাল্যকালে ৺গোস্বামীজির আশ্রমে তাঁর সেই পুণ্য সাধন কুটীর দেখেছি, পুণ্য স্থানের অনির্বচনীয় সাত্বিক প্রভাব অনুভব করেছি, অহিংসা আর জীবে দয়ার নীতিকে শুষ্ক কর্ত্তব্যবোধে নয় তার অন্তর্নিহিত আনন্দরসে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনধারার সঙ্গে একাত্ম করে নিয়েছি।

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে তখন আমাদের ইতিহাস পড়াতেন নিবারণবাবু। প্রাচীন ভারতের ধর্ম এবং সংস্কৃতির আলোচনা করতে করতে তিনি একদিন জৈনধর্ম সম্বন্ধে বললেন। আমার মনের ভেতর ক্ষেত্র আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল, তাই তিনি যে বীজ আমার মনের ভেতর ছড়িয়ে দিলেন, তা আমার মনের উর্বর ভূমিতে অতি সহজেই অঙ্কুরিত হয়ে উঠল। তিনি বোঝালেন 'জিন' (অর্থাৎ জয়ী) শব্দ থেকেই 'জৈন' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। বিভিন্ন রিপুকে যিনি জয় করেছেন তিনিই জিন, অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়। প্রকৃত জৈন যিনি, তিনি কাউকে আঘাত তো করবেনই না, আঘাতের ক্ষীণতম ইচ্ছাও মনে পোষণ করবেন না। মানুষ থেকে সুরু করে ক্ষুদ্রতম কীট পতঙ্গের জীবনও তাঁর কাছে মূল্যবান, একটি পিপীলিকার জীবনও তিনি নষ্ট করেন না।

নিবারণবাবু সেদিন বলেছিলেন জৈনধর্মের প্রচারক তীর্থংকরদের কথা। চব্বিশজন তীর্থংকরদের প্রথম ঋষভদেব, সর্বশেষ মহাবীর। এই সর্বশেষ তীর্থংকরের নামটিই সেই সুদূর পঞ্চাশ বছর আগে মনে অদ্ভুত সাড়া জাগিয়েছিল। অহিংসার সঙ্গে মহাবীর নাম যুক্ত হতে পারে, অর্থাৎ কোনো নিরুপদ্রব অহিংস মানুষ মহাবীর হতে পারেন, এ ছিল আমার ধারণার বাইরে। এর আগে মহাবীর বলে জেনে এসেছি আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেট, জুলিয়াস সীজার, নেপোলিয়ন প্রমুখ দিগ্বিজয়ীদের; দিগ্বিজয়ের অভিযানে যাঁরা লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরেছেন, হাজার হাজার গ্রাম ও নগর ধ্বংস করেছেন, যাঁরা হিংসার প্রতিমূর্তি।

এ ছাড়া শ্রীরামভক্ত হনুমানকেও আমরা জানতাম 'মহাবীর' বলে। আমাদের ডন-কুস্তির আখড়ায় শোভা পেত 'মহাবীর' মহাবলী হনুমানের বলিষ্ঠ দেহের ছবি, তাই দেখে আমরা প্রেরণা পেতাম ডন-কুস্তি করে বলী হবার সাধনায়—আর জানতাম বল মানেই অন্যকে আঘাত করবার ক্ষমতা। পরকে আঘাত করব না, দেহে মনে কোনো ক্ষেত্রেই পরকে ব্যথা বা দুঃখ দেব না, বরং নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হব, তবু পরকে ক্ষতিগ্রস্ত করব না, এর ভেতর মহাবীরত্ব কোথায়? বরং এর ভেতর রয়েছে মহাদুর্বলতা, ভীরুতা, কোমলতা। অর্থাৎ বলবানতা নয়, বলহীনতা। এই ধারণাই পোষণ করতাম মনে মনে।

মনে আছে অহিংসা ব্রতের প্রবক্তার 'মহাবীর' নামটি বেমানান, কানা ছেলের 'পদ্মলোচন' নামের মতোই, এই ধরণের মনোভাব প্রকাশ করে ফেলেছিলাম। শুনে আদর্শ শিক্ষক নিবারণবাবু আমার ভুল শুধরে দিয়ে বলেছিলেন, "না মোটেই বেমানান নাম নয়, ঐ নামটিই পুরোপুরি উপযুক্ত। মহাবীর ছিলেন প্রকৃত মহাবীর।" তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ইতিহাস-লেখকেরা মিথ্যা করে পাইকারী হত্যার নেতা আলেকজাণ্ডার, সীজার, নেপোলিয়ন প্রমুখ দিগ্বিজয়ীদের মহাবীর রূপে বর্ণনা করে মহা অন্যায় এবং মহা ক্ষতি করেছেন। অগণিত মানুষের মৃত্যুর এবং অন্যান্য নানাবিধ দুঃখের যাঁরা কারণ হন, তাঁদের প্রশংসা না করে ধিক্কার দেওয়া উচিত; তাঁদের প্রাপ্য অভিনন্দন নয়—নিন্দা, তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয় নয়—বর্জনীয়;

তাঁরা 'মহাবীর' আখ্যার কোন প্রকারেই যোগ্য নন। অহিংসা কাপুরুষতা নয়, দুর্বলতার নমুনা নয়, খাঁটি অহিংসাতেই আছে মহান বীরত্ব।

জৈনধর্ম আত্মসংযম এবং আত্ম-শুদ্ধির মাধ্যমে আত্ম-উপলব্ধির, সর্বজীবে প্রেম ও অহিংসার, সর্বপ্রকার কামনা বাসনার দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের ধর্ম। এই ধর্মের শেষ তীর্থংকর মহাবীরের নামটি আমার কাছে শুধু একটি নাম মাত্র নয়, একটি মহান প্রতীক।

জৈন দার্শনিক তত্ত্বের কয়েকটি কথা

শ্রীহরি সিং শ্রীমাল

জৈন দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলব। শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে পৃথিবীর সর্বত্রই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা অনেক বেড়েছে। লোকে আর নিজ নিজ ধর্মতত্ত্ব জেনেই সন্তুষ্ট নয়; অন্যান্য ধর্মমত সম্বন্ধেও আগ্রহশীল। জৈন তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক না হলেও নানান ভাষায় কিছু কিছু বই বেরিয়েছে। বাংলা ভাষাতেও শ্রদ্ধেয় শ্রীপুরণ চাঁদ সামসুখা মহাশয়ের তিনটি বই: (১) জৈন দর্শনের রূপরেখা, (২) জৈন ধর্মের পরিচয় ও (৩) জৈন তীর্থংকর মহাবীর মূল্যবান অবদান। এমন অনেক সুধী জিজ্ঞাসু আছেন যাঁদের হাতে এ বইগুলো পড়েনি বা যাঁরা এই ধরণের বই নানা কারণে পড়ে উঠতে পারেন নি। তাঁদের জন্য কয়েকটি কথায় জৈন তত্ত্বের সামান্যতম পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। এইরকম বিষয় খুব সরলভাষায় বলা যায় না। তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

ঈশ্বর: ঈশ্বর বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায়—সৃষ্টিকর্তা, সর্বনিয়ন্তা, পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কারদাতা ইত্যাদি, সেরকম কোনো ঈশ্বরের স্বীকৃতি জৈন তত্ত্বে নেই। ফলতঃ দুটি প্রশ্ন এখানে ওঠে। (১) জৈনদের শত সহস্র মন্দির আছে। সেখানে ভগবানের মূর্তিও আছে এবং এখানে পূজাও হয়। এইসব মন্দিরে কার পূজা হয়? (২) এ জগৎ সংসার কে সৃষ্টি করেছে, কার বিধানে এটা চলছে, পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার দেয় কে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর শক্ত নয়। মন্দিরে মন্দিরে যে সব মূর্তি পূজিত হয় সে সব হচ্ছে জৈন তীর্থংকরদের বিগ্রহ। তীর্থংকরেরা জৈনদের বিশিষ্ট গুরু। তাঁরা অন্যান্য মানুষের মতই জন্মগ্রহণ করেন, নিজ সাধনা প্রভাবে সর্বকালের সম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হন, যাকে 'কেবল-জ্ঞান' বলে এবং ধর্মকে দেশ-কালের উপযোগী রূপ দেন। এই সব সময়োপযোগী ধর্মপথ প্রদর্শক গুরুদের তীর্থংকর

বলে। এই রকম চব্বিশজন তীর্থংকর আমাদের মধ্যে আবিভূ'ত হয়েছেন এবং আয়ুশেষে মুক্তি বা নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন।

স্মৃতিপূজা: এই তীর্থংকরদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবশতঃ এবং যাতে তাঁদের শিক্ষা, তাঁদের আদর্শ, তাঁদের বাণী আমাদের সামনে রাখতে পারি তার জন্যেই তাঁদের বিগ্রহ মন্দিরে মন্দিরে স্থাপন। এইসব তীর্থংকরেরা সর্বকালের জন্য সংসার থেকে মুক্তি প্রাপ্ত; সংসারের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্বন্ধ আর নেই, কাজেই জগৎ নিয়ন্ত্রণ বা পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তা যদি হয়—তা হলে কে জগতের সৃষ্টি করল; কার নির্দেশে এটা চলে, কেই বা পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার দেয়?

আমরা ঘুরে ফিরে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নে এসে গেছি। আপনাদের মনে আছে আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধেও দু'টো প্রশ্ন করেছিলাম। এই প্রশ্নের উত্তরেই আমরা জৈন দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছাব।

শাশ্বত জগৎ: সৃষ্টিকর্তার কোন স্বীকৃতি জৈন মতে নেই; কোন জগৎ সৃষ্টির কথাই আদৌ স্বীকার করা হয় না। কাজেই সৃষ্টিকর্তার প্রশ্নই ওঠে না। এ জগৎ শাশ্বত। এ জগতের প্রতি দ্রব্য কোনরূপে অনাদিকাল বর্তমান। জগতের কোন সর্বনিয়ন্তা বিধাতার কথাও জৈন মতে বলা হয়নি। সমস্ত বিশ্বসংসার নিজের নিয়মেই চলে।

এ জগৎ—জগতের প্রতিটি দ্রব্য শাশ্বত এবং জগৎ একটি নিয়মে নিজেই চলে। এই দু'টি সত্যের স্বপক্ষে জৈন ছাড়াও অন্যান্য মতেও নানা যুক্তি দেখান হয়েছে এবং সেগুলি বলতে গেলে প্রায় অকাট্য।

প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে মানুষ এবং অন্যান্য জীব অনেক রকম ভালমন্দ কাজ করে এবং অনেক রকম ফলভোগ করতেও তাদের দেখা যায়; অনেক সময়েই কাজের এবং ফলের কোন আপাত সম্বন্ধ দেখা যায় না; এই সব ভালমন্দ কাজ জীব কেন করে? কাজের ফল কী? কেমন করেই বা তা ফলীভূত হয়? এর উত্তরই হচ্ছে জৈন তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু যার উল্লেখ আমরা আগে করেছি।

আত্মা: প্রতিটি জীব বা আত্মা নিজ নিজ কাজের 'কর্তা' এবং কর্মফলের 'ভোক্তা'।

এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলবার আগে এ জগৎসংসার কি নিয়ে তৈরী তা দেখে নিলে সুবিধে হবে। সমস্ত সংসার প্রধানতঃ দুটি দ্রব্যে বিভক্ত—'জীব' ও 'অজীব'।

জীব শাশ্বত, শুদ্ধ চৈতন্যময়, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন, অনন্ত বীর্য বা অপরিমিত আনন্দের অধিকারী। এখানে বলা দরকার যে প্রতিটি জীব পৃথকভাবে এই সব গুণের অধিকারী, বলা যেতে পারে 'সচ্চিদানন্দময়'। যে সব আত্মা নিজ নিজ সাধনার দ্বারা নিজস্ব এই সচ্চিদানন্দময় রূপ প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের বলা হয় 'মুক্ত জীব'। তাঁদের বিনাশ নেই ; জন্ম, জরা, মরণ নেই ; তাঁদের সুখ দুঃখ নেই। তাঁরা শাশ্বত সচ্চিদানন্দরূপে সংসারের উর্দ্ধে সিদ্ধ-শীলায় বর্তমান। এই অবস্থার নামই 'মোক্ষ', 'মুক্তি' বা 'নির্বাণ', পরম-কাম্য 'চরমোৎকর্ষ'।

এর অপরপক্ষে হচ্ছে 'সংসারী জীব', যে সব জীবের এখনো মুক্তি হয়নি। এদের মধ্যে আছে দেবগতি ও নরকগতি প্রাপ্ত জীব, মনুষ্য এবং অন্যান্য পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ, মাটি, জল, বাতাস আর অগ্নির জীব। এদের মধ্যে অনেকে কালক্রমে নিজ নিজ সাধনা প্রভাবে মুক্তিলাভ করবে, অন্যান্যরা শাশ্বতকাল সংসারচক্রে ঘুরতে থাকবে, এই সংসারগতির শেষ নেই।

অজীব : জীবের পর অজীব তত্ত্ব। অজীব প্রধানতঃ পাঁচ রকম—'পুদ্গল', 'আকাশ'', 'কাল', 'ধর্ম', আর 'অধর্ম'। এর মধ্যে পুদ্গলটাই আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে, অন্যান্যগুলি আগে দেখে পরে সেটার আলোচনা হবে।

আকাশ : যা জীব, পুদ্গল আদি অন্যান্য সমস্ত জিনিষকে অবকাশ দেয়—থাকবার স্থান দেয় তা আকাশ।

কাল : কাল ঠিক কোন দ্রব্য নয়। অন্যান্য দ্রব্যে সব সময় কিছু না কিছু পরিবর্তন হচ্ছে ; পরিবর্তনগুলি একের পর এক হয়ে যাচ্ছে। এই এই পরিবর্তনকে দ্রব্যের পর্যায় বলে। এই অবস্থান্তর আর তার পরম্পরা বোঝাবার জন্যে কাল দ্রব্যের কল্পনা।

ধর্ম : ধর্ম জীব এবং পুদ্গলের গতি সহায়ক এক রকম দ্রব্য ; যার

অভাবে কোনরকম চলাফেরা, স্থান পরিবর্তন সম্ভব হত না, তাকে ধর্ম বা ধর্মাস্তিকায় বলে।

অধর্ম : অধর্ম বা অধর্মাস্তিকায় ধর্মের ঠিক উল্টো, যা জীব ও পুদ্‌গলকে স্থিরভাবে থাকতে সাহায্য করে।

এই দুটি পরিভাষার সঙ্গে সাধারণ অর্থে প্রচলিত ধর্ম ও অধর্ম শব্দের কোন সম্বন্ধ নেই।

পুদ্‌গল : পুদ্‌গল সেই দ্রব্য যার দ্বারা জীব ছাড়া জগতের সমস্ত বস্তু তৈরী (পুদ্‌গল শব্দটি একটি জৈন পরিভাষা)। পুদ্‌গল রূপী দ্রব্য এবং এর স্পর্শ, রস, ঘ্রাণও আছে। আলাদা আলাদা ভাবে পুদ্‌গল অতি সূক্ষ্ম সেইজন্যে তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, কিন্তু পুদ্‌গলের সমষ্টি যখন বিশেষ বিশেষ পরিমাণে যুক্ত হয়ে কোন বস্তুতে পরিণত হয় তখন তা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। পুদ্‌গলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ পরমাণু নামে খ্যাত। বস্তু হিসেবে পুদ্‌গল সদা পরিবর্তনশীল কিন্তু অস্তিত্ব আদি গুণে তা শাশ্বত।

কর্ম : পুদ্‌গল আট রকমের। সবগুলো আমাদের আজকের আলোচনায় দরকারী নয়। এর মধ্যে একরকম হল 'কার্মণ পুদ্‌গল'। কার্মণ এসেছে 'কর্ম' শব্দ থেকে। এই কর্ম শব্দ জৈন পরিভাষায় একটি বিশেষ মানে রাখে এবং তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা আগে দেখেছি যে সচ্চিদানন্দ জীবের বা আত্মার নিজস্ব স্বভাব। তা যদি হয় তাহলে এই ভাবেই আমরা সব জীবকে দেখি না কেন? কারণ হচ্ছে এই কর্ম পুদ্‌গল বা কর্ম। এই কর্ম আমার সঙ্গে অনাদিকাল লিপ্ত থেকে আত্মার সচ্চিদানন্দ গুণ ঢেকে রেখেছে।

এই কর্ম সবচেয়ে সূক্ষ্ম একরকম পুদ্‌গল ; সারা সংসারে ব্যাপ্ত। সংসারী জীবের নানা রকম কাজের জন্য, নানারকম ভাবের জন্য, নানারকম অধ্যবসায়ের জন্য, আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়। এইগুলির প্রত্যেকের বিশেষ ফল দেবার নিজস্ব ক্ষমতা আছে। আমরা বলতে পারি এই ফলদায়ী কর্ম পুদ্‌গলগুলি জীবের দ্বারা কৃতকার্যের জন্য আত্মার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার সঙ্গে লিপ্ত হয় এবং যথাসময়ে ফল দিয়ে ঝরে যায়, ক্ষরিত হয়। কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে ; শুভ কর্মকে বলে পুণ্য, তার ফল সুখ, সাংসারিক সুখ আর অশুভ কর্ম

হলে পাপ, যার ফল হল দুঃখ। কর্মের হাত থেকে নিস্তার নেই ; কোন কর্ম বন্ধের অব্যবহিত পরেও ফল দিতে পারে অথবা তিন জন্ম পর্যন্ত যে কোন সময়ে ফল দিতে পারে।

এখন কথা হচ্ছে যে কর্মফল ভোগ তো আমরা সব সময় করছি, এই রকম ফল দিতে দিতে সমস্ত কর্মই তো ক্ষয় হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু তা হয় না। কারণ একদিকে যেমন ক্ষয় হচ্ছে আর একদিকে তেমনি আমাদের নানারকম জানিত ও অজানিত কাজের জন্য ও মনোভাবের জন্য সবসময় নতুন নতুন কর্ম বন্ধন হচ্ছে। কাজেই কোন সময়েই আত্মা কর্মমুক্ত হতে পারছে না। যদি নতুন কর্মের বন্ধন কোন রকম করে আটকান যায় তাহলে লিপ্তকর্ম ক্ষয় হতে হতে শেষ হবেই ; তাহলেই আত্মা কর্মমুক্ত হবে—নির্বাণ লাভ করবে। এই দুটো কাজ ঠিকভাবে কেমন করে করা যায় তারই নির্দেশ দেয় জৈন ধর্ম।

আশ্রব, বন্ধ, সংবর ও নির্জরা : কোন কিছু করার আগে আত্মার মনে কিছু অস্ফুট ভাব জাগে, প্রায় মনের অজ্ঞাতেই সেই মনোভাব অনুসারে কিছু কর্ম আত্মার দিকে আকৃষ্ট হয়। এই প্রক্রিয়াকে পরিভাষায় 'আশ্রব' বলা হয়। এর পর যখন মানসিক বৃত্তি স্ফুট হয় অথবা তা কোন কাজে পরিণত হয়, তখন সেই আগত কর্মগুলি আত্মার সঙ্গে লিপ্ত হয়ে যায়। একে বলা হয় 'বন্ধ'। যখন সাধনা ও মনোবলের দ্বারা এই বন্ধকে আটকানো হয় তখন তাকে বলি 'সংবর' এবং যখন স্বাভাবিক ফলোদয়ে তপস্যার প্রভাবে সঞ্চিত কর্ম ক্ষয় করা হয় তখন হয় 'নির্জরা'। এই রকমভাবে সকল কর্মক্ষয়ে সচ্চিদানন্দময় মুক্তি।

এরপর দুটি প্রশ্ন ওঠে, কি কারণে আশ্রব ও বন্ধ হয় এবং সংবর ও নির্জরা কেমন করে সম্ভব ?

কর্মবন্ধের কারণগুলি পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) মিথ্যাত্ব, (২) অবিরতি, (৩) প্রমাদ, (৪) যোগ ও (৫) কষায়।

মিথ্যাত্ব—জগৎ এবং তার নিয়ম সম্বন্ধে প্রকৃত সত্যজ্ঞান না থাকাকে 'মিথ্যাত্ব' বলে। সাধারণ ভাবে অজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান।

অবিরতি—সংযমের অভাবকে 'অবিরতি' বলে।

প্রমাদ—জ্ঞান, শুদ্ধাচার, কর্তব্য প্রভৃতির প্রতি তাচ্ছিল্য, তা ভুলে যাওয়া এবং তার প্রতি অবহেলা, এই হল 'প্রমাদ'।

যোগ—মন, বচন, ও শরীরের যে কোন প্রবৃত্তিকে 'যোগ' বলে। প্রবৃত্তির ভালো, মন্দ অনুসারে শুভ কর্ম বা অশুভ কর্ম বন্ধ হয়।

কষায়—মনের বিকৃত, দুষিত ভাবকে 'কষায়' বলে। কষায় চারটি—'ক্রোধ', 'মান', 'মায়া' ও 'লোভ'। ক্রোধের অর্থ পরিষ্কার। মান হল অভিমান, অহংকার ইত্যাদি। মায়া বলতে আমরা বুঝি ভ্রম, কপটতা ইত্যাদি। লোভের অর্থও পরিষ্কার। এই চার কষায় ষড়রিপুর সঙ্গে তুলনীয়।

অষ্টকর্ম: কর্মবন্ধের কারণ দেখা গেল এইবার কর্মের প্রকারভেদগুলি মোটামুটিভাবে দেখব। কর্মের প্রধান আটভেদ। (১) জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, (৩) মোহনীয়, (৪) অন্তরায়, (৫) বেদনীয়, (৬) নাম, (৭) গোত্র ও (৮) আয়ু।

জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়—আগে বলা হয়েছে যে আত্মার নিজস্ব শাশ্বত গুণগুলির মধ্যে অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত দর্শন অন্যতম। যে দুটি কর্ম আত্মার এই গুণ দুইটি আবৃত করে রাখে, প্রকাশিত হতে দেয়না তাদের 'জ্ঞানাবরণীয়' ও 'দর্শনাবরণীয়' বলে।

মোহনীয়—সাধারণ সংসারী জীবের নিজ নিজ আত্মা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই; তারা শরীরাত্মক, তারা শরীরকেই 'আমি' বলে মনে করে। 'মোহনীয়' কর্মের জন্যেই এই মোহ উৎপন্ন হয়।

অন্তরায়—যে কর্ম জীবকে মুক্ত হতে বাধা দেয়, তার শাশ্বত সচ্চিদানন্দময় অবস্থার পথে অন্তরায়, তাকেই 'অন্তরায়' কর্ম বলে। এই কর্ম অন্যান্য সৎকর্মেও জীবকে বাধা দেয়।

বেদনীয়—সংসারী জীব সব সময় দৈহিক ও মানসিক সুখ-দুঃখ, আনন্দ ও কষ্ট পায় তা হচ্ছে 'বেদনীয়' কর্মের ফল।

আয়ু—'আয়ুকর্ম' জন্মে জন্মে সংসারী জীবের আয়ু নির্দিষ্ট করে দেয়।

গোত্র—সংসারী জীব আমরা দেখেছি অনেক রকম হয়। এই নানা প্রকার গতি ও উচ্চকুল ইত্যাদি নিরূপিত হয় 'গোত্র' কর্মের দ্বারা।

নাম—আত্মার অরূপী-ত্ব গুণকে আবৃত করে তাকে নানারকম, ভালমন্দ দেহ ধারণ করায় 'নাম' কর্ম।

খুবই সংক্ষেপে কর্মের এই প্রকৃতি বিভাগ সারা হল, কিছুটা ধারণা এর থেকে হবে। কর্ম ও তার নানারূপ প্রক্রিয়ার আলোচনা আমরা করলাম, এইবার কর্ম থেকে কীভাবে মুক্ত হওয়া যায় তা দেখতে হবে।

আমরা আগে আলোচনায় দেখেছি যে কর্ম থেকে মুক্ত হওয়া যায় সংবর আর নির্জরার সাহায্যে। আপনাদের মনে আছে যে নতুন কর্ম যাতে আত্মার সঙ্গে বদ্ধ না হতে পারে তার প্রচেষ্টাই হল সংবর। কর্মবন্ধের পাঁচ কারণ বলা হয়েছে—মিথ্যাত্ব, অবিরতি, প্রমাদ, যোগ ও কষায়। এইগুলি কেমন করে আটকান যায় ?

মিথ্যাত্ব আটকান যায় অজ্ঞানতা দূর করার চেষ্টায়, সত্যজ্ঞানের অনুশীলনে। সত্যজ্ঞানের অনুশীলন বিনা আর সব বৃথা। জৈনধর্মের এটা একটা খুব বড় কথা, এর আরও একটু আলোচনা আমরা পরে করব।

অবিরতি দূর হয় সংযমের অভ্যাসে। মন, বচন আর শরীর যত সংযত হয় ততই কদাগ্রহ দূর হয়, আর কদাগ্রহের সঙ্গে কর্মবন্ধের কারণও স্বভাবতঃই দূর হতে থাকে।

প্রমাদের প্রতিবন্ধক হচ্ছে সাবধানতা, নিয়মানুবর্তিতা, ধর্মে শ্রদ্ধা ও সৎকর্মে তৎপরতা, আলস্যহীনতা।

যোগ সংবরিত হয় মন, বচন ও শরীরের অনাবশ্যক কাজগুলিকে কমিয়ে আনলে বা সেরকম কাজ বন্ধ করতে পারলে। মুক্তির জন্য যা প্রয়োজনীয় নয় তাকেই এখানে অনাবশ্যক বলি।

কষায় আত্মার সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করে ; প্রায় যত রকম খারাপ কাজ জীব করে, সবই ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ এই চার রকম কষায়ের বশবর্তী হয়ে। এই সব দুষ্কার্যের মধ্যে পাঁচটী প্রধান, সেইজন্যে তাদের বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। এগুলি হচ্ছে (১) জীবহিংসা, (২) মিথ্যাবচন, (৩) চুরি, (৪) মৈথুন বা কাম প্রবৃত্তি, (৫) পরিগ্রহ বা সঞ্চয় প্রবৃত্তি।

পঞ্চব্রত : উপরোক্ত এই পাঁচ দোষের কথা সকলেই জানেন। পৃথিবীর

প্রায় সব ধর্মেই এগুলির বিশেষ উল্লেখ করা হয়। তবে জৈন ধর্মে এর ওপর যত জোর দেওয়া হয়েছে এর যত বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এত বোধহয় আর কোথাও হয়নি। এই পাঁচ দোষের ত্যাগকে ব্রতরূপে গ্রহণ করা হয়েছে, সাধুদের 'পঞ্চ মহাব্রত' এবং গৃহীদের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ 'পঞ্চ অণুব্রত'। এর মধ্যে—

অহিংসা—সর্বজীবের প্রতি অহিংসাকে জৈনধর্মে একটা মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

"অহিংসা পরমো ধর্ম।"

অহিংসার অর্থ এবং প্রয়োগ খুব ব্যাপকভাবে করা হয়েছে। শরীর এবং বচনের দ্বারা জগতের প্রাণীর কিছুমাত্র ক্ষতি করা তো নয়ই এমন কি মনেও কোন জীবের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করা।

আমি মন বচন ও শরীরে কোন জীবের কোন ক্ষতি করব না এবং অন্য কেউ এই তিন রকমে হিংসায় প্রবৃত্ত হলে আমি তা কখনই অনুমোদন করব না। এই হচ্ছে জৈন 'অহিংসা'র আদর্শ।

অপরিগ্রহ—আর একটা হচ্ছে পরিগ্রহ। একে মোটামুটি সঞ্চয় প্রবৃত্তিও বলা যেতে পারে। এই সঞ্চয় প্রবৃত্তি ত্যাগ করে ধনসম্পদ, ভোগ-উপভোগের উপকরণ ইত্যাদি একটি সীমার মধ্যে রাখার সংকল্প ও প্রচেষ্টাকে 'অপরিগ্রহ' ব্রত বলে। এই সীমাকেও ক্রমে ক্রমে কম করে আনতে হয়, তবেই অপরিগ্রহ ব্রতের ঠিক পালন হয়।

একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে অহিংসা ও অপরিগ্রহ ব্রত পালন করলে মন শুদ্ধ হয়, শান্ত হয়, কাম ক্রোধ কমে আসে। কেবল মানুষের নিজস্ব জীবনেই নয় আজ সমস্ত পৃথিবীর দিকে দেখলেও এই কথাই মনে হয় না কী, যে জাতীয় জীবনে ও সমস্ত পৃথিবীতে এই দুটি ব্রতের আজ বড়ই দরকার।

পুণ্যপাপ : সংবর সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা শেষ করার আগে পুণ্য ও পাপ সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলে নিতে চাই। পুণ্য হল শুভ কর্ম। যথা—দয়া, পরোপকার, তীর্থদর্শনাদি আর পাপ হল অশুভ কর্ম যার ফলে সংসারে বন্ধন ও সব রকম দুঃখ। জৈন তত্ত্বের দৃষ্টিতে কিন্তু দুইই সমান, সাধনার

উচ্চস্তরে দুইই ত্যাগ করতে হয়। পুণ্যের দ্বারা দেবত্ব পাওয়া যায়, মনুষ্য জন্মে সব রকম সুখ পাওয়া যায় কিন্তু মুক্তি পাওয়া যায় না। তবে সাধারণ ব্যবহারিক স্তরে, পুণ্য আচরণের উপদেশ দেওয়া হয়, কারণ শুভ কর্ম করতে থাকলে অশুভ কাজ থেকে মন সরে আসে এবং ধর্মের দিকে মন যায়।

নির্জরা: আশ্রবের কথা এখানে শেষ করে এবার নির্জরার আলোচনা করি। নির্জরা, আমরা জেনেছি, সঞ্চিত কর্মক্ষয়। কর্ম নিজের ফল দিয়ে স্বভাবতঃই ক্ষয় হয়ে যায়। আবার জীব নিজের চেষ্টায় অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়িও তা ক্ষয় করতে পারে। এই উপায়কেই তপ বা তপস্যা বলা হয়। অল্প ভক্ষণ, উপবাস, শীত-গ্রীষ্ম সহ্য করা ইত্যাদি নানাপ্রকার শারীরিক কষ্ট নিজের চেষ্টায় গ্রহণ করাই হল তপস্যা। এই তপস্যা হওয়া উচিত নীরবে, অম্লান বদনে, মনে যেন কোন বিকার না আসে, সম্পূর্ণ নিরভিমান ভাবে এবং তা পালন করতে হয় নিজের মনের ও শরীরের শক্তি ও সামর্থ বুঝে। তা না হলে তপস্যা হবে বিকৃত, তাতে একদিকে যেমন কর্মক্ষয় হবে অন্যদিকে তেমনি তপস্যাজনিত মনোবিকারের জন্যে নতুন কর্ম-বন্ধন হবে। সেই জন্যে তপস্যা খুব সাবধানে, নিজ নিজ অধিকার, শক্তি সামর্থ বুঝে করা উচিত।

স্বাভাবিক ভাবে যে কর্মক্ষয় হয় তার সম্বন্ধেও ধার্মিককে সচেতন, সাবধান হতে হয়। অশুভ কর্মের উদয়ে, যখন কোন কষ্ট আসে তখন তার কোন উপলক্ষ থাকে। জীব সাধারণতঃ এই উপলক্ষকেই তার কষ্টের জন্যে দায়ী করে, ফলে তার মনে ভয়, শোক, ঈর্ষা, ক্রোধ ইত্যাদি নানারকম বিকার আসে এবং এই সব বিকারের জন্য সে নানারকম অসদাচরণ, পাপকর্ম করে, নতুন কর্ম বন্ধ করে, কর্ম তার ক্ষয় হতে হতেও হয় না। অনেক কাল বা অনন্তকাল সে সংসার চক্রে ঘুরতে থাকে। অপর পক্ষে সে যখন শুভকর্ম বা পুণ্যের প্রভাবে সাংসারিক সুখ পায় তখন তার মন চঞ্চল হয়। সে উল্লসিত হয়, তার মনে লোভ হয়, অহংকার হয়। এইভাবে তার মন বিকৃত হয় এবং নতুন কর্ম বন্ধ হয়। সুখ দুঃখের এই দুই অবস্থাতেই খুব সাবধান, সচেতন থাকতে হবে। কর্মের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সব সময়ে মনে রাখতে হবে। আমিই আমার কর্মের একমাত্র কর্তা, আমিই তার ভোক্তা।

জগতে কেউই আমার সুখ দুঃখের জন্যে বিন্দু মাত্র দায়ী নয়। তবেই নির্জরা সম্ভব।

জ্ঞান: জৈনধর্মকে জ্ঞান মার্গ বলা হয়েছে, কারণ এই ধর্মে সম্পূর্ণ জ্ঞান বিনা মুক্তি সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এতে জ্ঞান এবং আচরণ বা চারিত্র দুটোর উপরই সমান জোর দেওয়া হয়েছে। তবে এতে জ্ঞানের অর্থ যত ব্যাপক ও তার সাধনা যত সর্বাঙ্গীন এমন আর কোথাও নেই। সেইজন্যে একে জ্ঞানমার্গ বলা হয়েছে। এখানে দর্শন বিনা জ্ঞান সম্পূর্ণ নয়। কোন কিছু জানাটাই জ্ঞান, সেটা দেখে শুনে বা পড়েও হতে পারে, কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়, তার অন্তর্নিহিত কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ জানতে হবে, সেটাকেই বলে দর্শন।

জ্ঞান দু'রকমের, প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ। কোন কিছু শুনে বা পড়ে যে জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বা বুদ্ধির দ্বারা যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাকে পরোক্ষ জ্ঞান বলে। এর অপর পক্ষে ইন্দ্রিয়, মন বা অন্য কোন কিছুর অপেক্ষা না রেখে, আত্মা-প্রত্যক্ষ যে জ্ঞান, তা প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এই হিসাবে আমাদের এবং অন্যান্য সাধারণ সংসারী জীবের যে জ্ঞান তা সবই পরোক্ষ। এবং মুক্তির পূর্বে জ্ঞানাবরণ কর্মরহিত যে সম্পূর্ণ জ্ঞান বা দর্শনের অধিকারী হয় তাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ, তাকে কেবল জ্ঞান বলে।

দর্শন: দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে, যাতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে বিন্দুমাত্র ভুল-ত্রুটি না হয়। দর্শনের এই পন্থা দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত: 'স্যাদ্বাদ' আর 'নয়বাদ'। 'স্যাৎ' শব্দের অর্থ 'কোন অপেক্ষায়' বা 'কোন দৃষ্টি ভঙ্গীতে'। কোন জিনিষের কার্য কারণ সম্বন্ধ দেশ-কাল-পাত্র ভেদে অনেক রকম হতে পারে। এই স্বাপেক্ষিক সম্বন্ধগুলির আংশিক সত্যতা নির্ণয় করা ও স্বীকার করা স্যাদ্বাদের কাজ এবং এই সব আংশিক সত্যগুলিকে একে একে বিচার করা ও তার থেকে চরম নির্ণয় বের করা নয়বাদের কাজ। স্যাদ্বাদ আর নয়বাদ সম্বন্ধে অনেক বই আছে। এটা সহজে বোঝা বা দু'কথায় বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, আমার পক্ষে তো নয়ই। তবু এই স্যাদ্বাদ আর নয়বাদ-জৈন দর্শনের বিশিষ্ট আর অবিচ্ছেদ্য অংশ তাই তার উল্লেখ প্রয়োজনীয়।

ত্রিরত্ন : এই রকমে জ্ঞান, দর্শন আর চারিত্র এই ত্রিরত্নের সমন্বয়ে জৈনধর্ম। সেই কথাই বলেছেন বাচক উমাস্বাতি তাঁর জৈন সূত্র গ্রন্থ 'তত্বার্থাভিগম সূত্রে'র প্রথমেই—

সম্যগ্ জ্ঞানদর্শন চারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ।

জৈন ধর্মের মহান অভয় বাণী উচ্চারণ করে আমার বক্তব্য শেষ করি :

"আমি শাশ্বত। আমার কর্মের আমিই একমাত্র কর্তা, আমিই একমাত্র ভোক্তা। আমার কর্মফল আমাকে ভোগ করতেই হবে। জগতের কোন শক্তি আমার কর্মফলের এক বিন্দু কমাতে পারে না। কেউই আমাকে কিছু দিতে পারে না, কেউই আমার কিছু নিতে পারে না। আমি আমার একমাত্র সর্বময় কর্তা। আমি শাশ্বত সচ্চিদানন্দময়।"

জৈন ধর্ম

ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন

[পূর্বানুবৃত্তি]

ভদ্রবাহু প্রমুখ দিগম্বরের দল মেয়েদিগের জন্য তাঁহাদের আশ্রমে একটুমাত্র স্থান রাখিলেন না। সকলেই অবগত আছেন ১৯শ তীর্থংকর (তীর্থংকরীই) মল্লীকুমারী চিরকুমারী ছিলেন। কিন্তু দিগম্বর জৈনেরা তাঁহার স্ত্রীত্ব স্বীকার করিলেন না। তাঁহারা তাঁহাকে পরিকল্পনা করিয়া তীর্থংকর তালিকার অন্তর্গত করিয়া লইলেন এবং তিনি 'মল্লীনাথ' হইলেন।

নিম্নে আমরা ২৪ জন তীর্থংকরের সংক্ষিপ্ত বিররণী দিতেছি :

(১) আদিনাথ (ঋষভদেব)। (২) অজিতনাথ—রাজা জিতশত্রু ও রাজ্ঞী বিজয়ার পুত্র। ইনি বঙ্গদেশের পার্শ্বনাথ পাহাড়ে (সমেৎ শিখর) তিরোধান করেন। ইঁহার বর্ণ ছিল স্বর্ণের ন্যায় এবং ইঁহার চিহ্ন (লাঞ্ছন) ছিল হস্তী। (৩) সম্ভবনাথ—রাজা জিতারি এবং রাজ্ঞী সেনার পুত্র। স্বর্ণ-বর্ণ, অশ্বলাঞ্ছন। (৪) অভিনন্দন—রাজা সম্ভব ও রাজ্ঞী সিদ্ধার্থার পুত্র। বঙ্গদেশের সমেৎ শিখরে তিরোধান,—স্বর্ণবর্ণ, কপিলাঞ্ছন। (৫) সুমতিনাথ—রাজা মেঘ এবং রাজ্ঞী মঙ্গলার পুত্র। স্বর্ণবর্ণ, ক্রৌঞ্চলাঞ্ছন। (৬) পদ্মপ্রভ—রাজা শ্রীধর ও রাজ্ঞী সুষিমার পুত্র। বঙ্গদেশের সমেৎ শিখরে তিরোধান। রক্তবর্ণ, পদ্মলাঞ্ছন। (৭) সুপার্শ্বনাথ—রাজা প্রতিষ্ঠ ও রাজ্ঞী পৃথ্বীর পুত্র, সমেৎ শিখরে তিরোধান। সবুজবর্ণ, স্বস্তিকলাঞ্ছন। (৮) চন্দ্রপ্রভ—পিতা রাজা মহাসেন, মাতা রাজ্ঞী লক্ষ্মণা। এই দেশের সমেৎ শিখরে তিরোধান। শ্বেতবর্ণ, চন্দ্রলাঞ্ছন। (৯) সুবুদ্ধিনাথ—রাজা সুগ্রীব এবং রাজ্ঞী রমার পুত্র। এই দেশের সমেৎ শিখরে তিরোধান। শ্বেতবর্ণ, মকরলাঞ্ছন। (১০) শীতলনাথ—রাজা দৃঢ়রথ ও সুনন্দার পুত্র। এই দেশের সমেৎ শিখরে তিরোধান। স্বর্ণবর্ণ, শ্রীবৎসলাঞ্ছন। (১১) শ্রেয়াংশনাথ—রাজা বিষ্ণু

এবং রাজ্ঞী বিষ্ণার পুত্র। বাঙলার সমেৎ শিখরে তিরোধান। ইঁহার বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় এবং গরুড়লাঞ্ছন[১৬]। (১২) বসুপুজ্য—বাসুপুজ্য রাজা এবং রাজ্ঞী জয়ার পুত্র—ভাগলপুরে জন্ম ও নির্বাণ। রক্তবর্ণ ও মহিষলাঞ্ছন। (১৩) বিমলনাথ—রাজা কৃতবর্মা ও রাজ্ঞী শ্যামার পুত্র—বাঙলার সমেৎ শিখরে নির্বাণ। স্বর্ণবর্ণ, বরাহলাঞ্ছন। (১৪) অনাথনাথ[১৭]—রাজা সিংহসেন ও রাজ্ঞী সুযশার[১৮] পুত্র। বাঙলার সমেৎ শিখরে তিরোধান। স্বর্ণবর্ণ, শ্যেনলাঞ্ছন। (১৫) ধর্মনাথ—রাজা ভানু এবং রাজ্ঞী সুহৃতার[১৯] পুত্র। বাঙলার সমেৎ শিখরে তিরোধান। স্বর্ণবর্ণ, বজ্রলাঞ্ছন। (১৬) শান্তিনাথ—রাজা বিশ্বসেন এবং রাজ্ঞী অচিরার পুত্র। সমেৎ শিখরে নির্বাণ। পিঙ্গলবর্ণ, মৃগলাঞ্ছন। (১৭) কুন্থনাথ—রাজা সুর[২০] রাজ্ঞী শ্রীর পুত্র—সমেৎ শিখরে তিরোধান, ছাগলাঞ্ছন। (১৮) অরনাথ—পিতা রাজা সুদর্শন ও মাতা রাজ্ঞী দেবী[২১]। সমেৎ শিখরে মহাপ্রয়াণ। স্বর্ণবর্ণ, নন্দ্যাবর্ত। (১৯) মল্লীনাথ—রাজা কুম্ভ ও রাজ্ঞী প্রভাবতীর কন্যা—সমেৎ শিখরে তিরোধান। নীলবর্ণ, কুম্ভলাঞ্ছন। (২০) মুনি সুব্রত—রাজা সুমিত্র এবং রাজ্ঞী পদ্মাবতীর পুত্র—সমেৎ শিখরে মহাপ্রয়াণ। কৃষ্ণবর্ণ, কূর্মলাঞ্ছন। (২১) নেমিনাথ[২২]—রাজা বিজয় এবং রাজ্ঞী বিপ্রার পুত্র। পিঙ্গলবর্ণ, নীলোৎপললাঞ্ছন। সমেৎ শিখরে মহাপ্রয়াণ। (২২) নেমিনাথ (২য়)[২৩]। হরিবংশোদ্ভূত রাজা সমুদ্রবিজয় এবং রাজ্ঞী শিবার পুত্র। কৃষ্ণবর্ণ, শঙ্খলাঞ্ছন। ইঁহার পিতা সমুদ্রবিজয়, কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের ভ্রাতা ছিলেন। (২৩) পার্শ্বনাথ—রাজা অশ্বসেন ও রাজ্ঞী বামাদেবীর পুত্র—জন্ম ৮৭৭ খৃঃ পূঃ। ৭৭০ খৃঃ পূর্বে সমেৎ শিখরে মহাপ্রয়াণ। ইনি ২৪শ তীর্থংকর মহাবীরের প্রায় ২৫৯ বৎসরের পূর্ববর্তী। সমেৎ শিখরে তিরোধান। নীলবর্ণ, সর্পলাঞ্ছন। (২৪) মহাবীর (বর্দ্ধমান)—রাজা সিদ্ধার্থ ও রাজ্ঞী ত্রিশলার পুত্র, পাবা পুরীতে নির্বাণ (৪২৭ খৃঃ পূঃ) পিঙ্গলবর্ণ, সিংহলাঞ্ছন।

এই তালিকা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—২১ জন তীর্থংকর ব্যতীত ইঁহাদের সকলেই বৃহৎ বঙ্গের সমেৎ শিখরে মহাপ্রয়াণ করেন, সুতরাং বাঙ্‌লা দেশ যে জৈনধর্মের একটী প্রধান লীলাক্ষেত্র ও তীর্থ স্থান ছিল, তাহাতে কোন

---

১৬ গরুড় নয়, গণ্ডার লাঞ্ছন। ১৭ অনন্তনাথ। ১৮ সুপক্ষা। ১৯ সুব্রত। ২০ বসু। ২১ মহাদেবী। ২২ নমিনাথ। ২৩ ২য় বলার প্রয়োজন করে না।

সন্দেহ নাই। এই তীর্থংকরেরা সকলেই রাজকুলোদ্ভূত ; এবং দুইজন ব্যতীত সকলেই ইক্ষ্বাকু-বংশ অলংকৃত করিয়াছিলেন। মিঃ পূরণ চাঁদ নাহার তাঁহার *Epitome of Jainism* পুস্তকে (৬৮৫ পৃঃ) লিখিয়াছেন : "পার্শ্বনাথ পাহাড় বঙ্গ দেশের হাজারীবাগ জেলায় অবস্থিত, ইহা জৈনদিগের সর্ব প্রধান তীর্থ। ২৪ জন তীর্থংকরের মধ্যে ২০ জনই এই স্থানে নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। এখানে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈনদিগের অসংখ্য মঠ, মন্দির আছে। তীর্থংকরদিগের পদাঙ্কের পূজা হইয়া থাকে, কিন্তু পার্শ্বনাথের মন্দিরে পার্শ্বনাথের একটী প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।"

আদিনাথের একটি মূর্তি ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত কুলপী থানার অধীন ঘণ্টেশ্বরী গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটিও একটু অল্প নীল রঙের বালি পাথরের উপর ক্ষোদিত (পঞ্চপুষ্প, 'সুন্দরবনে আবিষ্কৃত জৈন মূর্তি', প্রবন্ধ, ১৩৩৯ আষাঢ়, ১৩৪ পৃঃ)। মহাবীর (বর্দ্ধমান স্বামী) ৫২৭ খৃঃ পূঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জৈনদিগের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ আয়ারঙ্গ সূত্রে লিখিত আছে তিনি ১২ বৎসরকাল বঙ্গদেশের অন্তর্গত রাঢ় দেশে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন।

পার্শ্বনাথের একটী প্রস্তর মূর্তি (এই সংখ্যার ১৩০ পৃঃ দ্রষ্টব্য) সুন্দরবনের অন্তর্গত কাঁটাবেনিয়া গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। সুন্দরবনের ২৪নং লাটে এইরূপ আর একখানি মূর্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে উদীয়মান ঐতিহাসিক ডায়মণ্ডহারবারের অধীন জয়নগর-মজিলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের গবেষণামূলক ইংরেজী ও বাঙলা প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জৈনশাস্ত্র ও সাহিত্য অতি বিরাট, এ পর্যন্ত তাহাদের বিশেষ সন্ধান হয় নাই। ইঁহাদের বহু গ্রন্থ সংস্কৃতে লিখিত হইয়াছে—বহু সংখ্যক প্রাকৃতে এবং অবশিষ্টগুলি প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত। ইঁহাদের ব্যবহৃত প্রাকৃত অর্দ্ধমাগধী, সুতরাং এক সময়ে এদেশে যে প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, ইঁহারা তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন। বাঙালী ভদ্রবাহু—ইঁহাদের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও মুখ্য লেখকগণের অন্যতম। ইঁহার রচিত কল্পসূত্র (দশাশ্রুতি স্কন্ধ নামক পুস্তকের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে ৮ম অধ্যায়) জৈনদিগের প্রধান গ্রন্থ। চাতুর্মাস্য উৎসবের সময় ইহা জৈন মন্দিরে ভক্তির সহিত পঠিত হইয়া থাকে। ভদ্রবাহু

চন্দ্রগুপ্তের সময় নিখিল জৈন সঙ্ঘের অধ্যক্ষ ছিলেন। জৈন (প্রাকৃতে লিখিত) পদ্মচরিত (পউম চরিয়ম্) একখানি প্রাচীনতম প্রাকৃত কাব্য। জৈনদিগের আখ্যায়িকা গ্রন্থও বিস্তর; ন্যায়, দর্শন সম্বন্ধে ইঁহারা এক সময়ে ভারতীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর অগ্রণী ছিলেন। তীর্থংকর ও প্রধান জৈনসাধুদের জীবনচরিতও বহু বিদ্যমান। প্রফেসর হারতাল (Hertal) বলেন, ইঁহাদের বর্ণনাত্মক রচনা—শুধু ভারতীয় সাহিত্যে নহে—সমগ্র মনুষ্য জাতির সাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠার দাবী রাখে। ("With respect to its narrative part, it holds a prominent position not only in Indian literature but in the literature of mankind.")

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি ২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
দ্বিতীয় বর্ষ ॥ আশ্বিন ১৩৮১ ॥ ষষ্ঠ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :
গণেশ লালওয়ানী

তীর্থংকর শান্তিনাথ

পাকভিয়া, খৃষ্টীয় ১১ শতক

বর্দ্ধমান-মহাবীর

[জীবন চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

সংগমক পরাভূত হয়েছেন, সম্পূর্ণরূপে পরাভূত। মরুর মতো বর্দ্ধমানের ধৈর্য, সাগরের মতো বর্দ্ধমানের গম্ভীরতা। কিন্তু পরাভূত হয়ে সংগমক এখন কোন মুখে স্বর্গে ফিরে যাবেন? ফিরে যাবার সেই লজ্জাই যেন তাঁকে বর্দ্ধমানের প্রতি আরো অকরুণ করে তুলেছে। বর্দ্ধমানকে অপদস্থ করবার জন্য তিনি তাই বদ্ধপরিকর হলেন।

বর্দ্ধমান বালুকা হয়ে এসেছেন সুযোগ, তারপর সুচ্ছেত্তা, মলয়, হস্তীশীর্ষ আদি স্থান হয়ে তোসলি গ্রাম। তোসলি গ্রামে তিনি যখন এক বৃক্ষমূলে ধ্যানারূঢ় হয়েছেন তখন সংগমক গ্রামে গিয়ে গ্রামীণের ঘরে সিঁধ দিতে আরম্ভ করলেন।

সংগমক লোক দেখিয়েই সিঁধ দিতে গিয়েছিলেন তাই সহজেই ধরা পড়ে গেলেন। ধরা পড়ে যখন মার খেতে আরম্ভ করলেন তখন তিনি তাদের বললেন, তোমরা কেন অনর্থক আমাকে মারছ। আমি আমার গুরুর আদেশে সিঁধ দিতে এসেছিলাম। এতে আমার কী দোষ?

লোকেরা তখন তাঁর [illegible] মতো বর্দ্ধমানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল ও তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিল চড় লাথি ঘুষি যখন নিঃশেষ হল তখন তাঁকে বেঁধে আরক্ষালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা হল। এমন সময় সেখানে এসে পড়লেন ঐন্দ্রজালিক মহাভূতিল। মহাভূতিল বর্দ্ধমানকে দেখামাত্রই বলে উঠলেন, এঁকে কেন তোমরা বাঁধছ। এঁর সমস্ত গায়ে রাজচক্রবর্তীত্বের লক্ষণ। তাই মনে হয় ইনি ধর্মচক্রবর্তী। ইনি কখনো চোর নন্।

সেকথা শুনে তারা লজ্জিত হয়ে সংগমকের সন্ধান করতে লাগল। কিন্তু সংগমক তৎক্ষণে অন্তর্দ্ধান করেছেন।

বর্দ্ধমান তোসলি হতে এলেন মোসলি। মোসলিতেও বর্দ্ধমান যখন ধ্যানমগ্ন হয়েছেন তখন সংগমক তাঁর পাশে সিঁধ কাটবার যন্ত্রাদি রেখে সরে পড়লেন।

আরক্ষকেরা তাঁর কাছে সিঁধ কাটবার যন্ত্রাদি পেয়ে তাঁকে ধৃত করে রাজ সভায় উপস্থিত করল।

সেই সময় রাজ সভায় সুমাগধ নামে এক রাষ্ট্রীয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাজা সিদ্ধার্থের মিত্র ছিলেন। বর্দ্ধমানকে দেখা মাত্রই তাই তিনি তাঁকে চিনতে পারলেন ও রাজাকে তাঁর পরিচয় দিয়ে তাঁকে বন্ধন মুক্ত করিয়ে দিলেন।

বর্দ্ধমান মোসলি হতে আবার এলেন তোসলি। তোসলিতে এবার সংগমকের চক্রান্তে আরক্ষকদের হাতে ধৃত হলেন। তারা তাঁকে ক্ষত্রিয়ের কাছে প্রেরণ করল। ক্ষত্রিয় যখন নানা ভাবে প্রশ্ন করেও কোনো প্রত্যুত্তর পেলেন না তখন তাঁকে চোর ভেবে ফাঁসীর সাজা দিলেন।

বর্দ্ধমানকে ফাঁসীর মঞ্চে তুলে দেওয়া হল। কিন্তু যতবারই তাঁর গলায় ফাঁস পরান হয় ততবারই তা ছিঁড়ে যায়। এ ভাবে এক আধবার নয়, সাত সাত বার। রাজপুরুষেরা সেকথা ক্ষত্রিয়কে গিয়ে নিবেদন করল। ক্ষত্রিয় তখন তাঁর মুক্তির আদেশ দিলেন।

তোসলি হতে বর্দ্ধমান গেলেন সিদ্ধার্থপুর। সেখানেও তিনি চোর অপবাদে ধৃত হলেন কিন্তু অশ্ববণিক কৌশিক তাঁর পরিচয় দিয়ে তাঁকে মুক্ত করিয়ে নিল।

সংগমক যখন এভাবে তাঁকে পর্যুদস্ত করতে পারলেন না তখন ভিন্ন পথ নিলেন। বর্দ্ধমান যখন যেখানে ভিক্ষে করতে যান, সংগমক তাঁর আগে আগে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। বর্দ্ধমানকে শ্রমণ ধর্মের নিয়মানুযায়ী তাই ভিক্ষে না নিয়েই সেখান হতে ফিরে যেতে হয়। এভাবে এক আধ দিন নয় দীর্ঘ ছ'মাস তিনি কোথাও ভিক্ষে গ্রহণ করতে পারলেন না।

ব্রজগ্রামে সেদিন ভিক্ষা গ্রহণ করতে গেছেন। গিয়ে দেখেন সংগমক সেখানে আগে হতেই উপস্থিত।

বর্দ্ধমান যখন ভিক্ষা না নিয়েই সেখান হতে ফিরে যাচ্ছেন তখন সংগমক

তাঁর সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন ও তাঁকে নমস্কার করে বললেন : দেবার্য, ইন্দ্র আপনার সম্বন্ধে যা বলেছিলেন—আপনার মতো ধ্যানী বা ধীর নেই, তা অক্ষরশঃ সত্যি। আমি এতদিন আপনাকে নানাভাবে উত্যক্ত করেছি, আপনার ধ্যান ভাঙবার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি। বাস্তবে আপনি সত্য প্রতিজ্ঞ, আমি ভগ্ন প্রতিজ্ঞ। আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি আর বাধা দেব না। আপনি ভিক্ষেয় যান।

বর্দ্ধমান্ সেদিনো ভিক্ষা না নিয়ে ফিরে গেলেন। পরদিন এক গ্রাম-বৃদ্ধার হাতে পায়সার গ্রহণ করে দীর্ঘ ছ'মাসের উপবাস ভঙ্গ করলেন।

ব্রজগ্রাম হতে অলংভিয়া, সেয়বিয়া হয়ে তিনি এলেন শ্রাবস্তী। তারপর কৌশাম্বী বারাণসী, রাজগৃহ ও মিথিলা হয়ে বৈশালী। বৈশালীর বাইরে সমরোত্থান বলে যে উদ্যান ছিল সেই উদ্যানে বলদেব মন্দিরে অবস্থান করলেন। বৈশালীতেই তিনি এবারের বর্ষাবাস ব্যতীত করবেন।

বৈশালীতে থাকেন শ্রেষ্ঠী জিনদত্ত। জিনদত্তের এখন পূর্বের সে সমৃদ্ধি নেই। তাই সকলে তাঁকে জিন শ্রেষ্ঠী না বলে, বলে জীর্ণ শ্রেষ্ঠী। কিন্তু সে যা হোক, জিন শ্রেষ্ঠী ছিলেন খুবই সরল ও শ্রদ্ধাবান। বর্দ্ধমান তাই যখন সমরোত্থান উদ্যানে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি প্রতিদিন এসে তাঁর বন্দনা করে যেতেন ও তাঁকে তাঁর ঘরে ভিক্ষা নেবার জন্য আমন্ত্রণ করতেন।

বর্দ্ধমানের চাতুর্মাসিক তপ ছিল। তাই তিনি ভিক্ষা নিতেই যান না। তাছাড়া শ্রমণকে আমন্ত্রিত হয়ে ভিক্ষা নিতে যেতে নেই।

বর্দ্ধমানকে ভিক্ষা নিতে নগরে যেতে না দেখে জিন শ্রেষ্ঠী ভাবলেন, বর্দ্ধমানের হয়ত মাসিক তপ রয়েছে। তাই মাসান্তে তিনি বর্দ্ধমানকে তাঁর ঘরে ভিক্ষা গ্রহণের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

কিন্তু বর্দ্ধমান সেদিন ও তারপরেও ভিক্ষাচর্যায় গেলেন না।

জিন শ্রেষ্ঠী তখন ভাবলেন, বর্দ্ধমানের হয়ত দ্বিমাসিক তপ রয়েছে।

এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ মাসও অতীত হয়ে গেল। চাতুর্মাস্যের শেষের দিন জিন শ্রেষ্ঠী আবার তাঁর প্রার্থনা জানালেন ও নিজের ঘরে গিয়ে তাঁর প্রতীক্ষা করে রইলেন।

বর্দ্ধমান সেদিন ভিক্ষায় গেলেন—কিন্তু জিন শ্রেষ্ঠীর ঘরে গেলেন না,

অভিনব শ্রেষ্ঠীর ঘরে ভিক্ষা নিয়ে তিনি তাঁর অবস্থান স্থানে ফিরে এলেন। অভিনব শ্রেষ্ঠীর দাসী দারুহস্তকে করে তাঁকে কলাই সেদ্ধ ভিক্ষা দিল। তিনি তাই গ্রহণ করে তাঁর চাতুর্মাসিক তপের পারণ করলেন।

জিন শ্রেষ্ঠী যখন সেকথা জানতে পারলেন তখন মনে মনে একটু দুঃখিত হলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আনন্দিত যখন তিনি বুঝতে পারলেন বর্দ্ধমান কেন তাঁর ঘরে ভিক্ষা নিতে আসেন নি।

বর্দ্ধমান বৈশালী হতে এলেন সুংসুমারপুর। সুংসুমারপুর হতে ভোগপুর। তারপর নন্দীগ্রাম, মেঁঢ়িয়গ্রাম হয়ে কৌশাম্বী।

কৌশাম্বীতে বর্দ্ধমান এক ভীষণ অভিগ্রহ গ্রহণ করলেন। অভিগ্রহ অর্থ মানসিক সঙ্কল্প—যে সঙ্কল্প পূর্ণ হলে তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করবেন, নইলে নয়। সে অভিগ্রহ মুণ্ডিত মাথা, হাতে কড়া পায়ে বেড়ী, তিন দিনের উপবাসী দাসত্ব প্রাপ্ত কোনো রাজকন্যা ভিক্ষার সময় অতীত হয়ে গেলে কুলোর প্রান্তে কলাই সেদ্ধ নিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাঁকে যদি ভিক্ষে দেয় তবেই তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করবেন।

কিন্তু এধরণের অভিগ্রহ সহজেই পূর্ণ হবার নয়। তাই বর্দ্ধমান রোজই নগরে ভিক্ষায় যান আর রোজই ভিক্ষা না নিয়ে ফিরে আসেন।

একদিন বর্দ্ধমান ভিক্ষা নেবার জন্য এসেছেন কৌশাম্বীর অমাত্য সুগুপ্তের ঘরে। সুগুপ্তের স্ত্রী নন্দা নিজের হাতে পরমান্ন সাজিয়ে তাঁকে ভিক্ষা দিতে এলেন। কিন্তু বর্দ্ধমান সে ভিক্ষা না নিয়ে ফিরে গেলেন।

নন্দা জৈন শ্রাবিকা ছিলেন। তাই মনে মনে দুঃখিতা হলেন ও নিজের মন্দ ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

নন্দাকে বিষাদগ্রস্তা দেখে তাঁর পরিচারিকা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, দেবী, উনি ভিক্ষা নেননি বলে আপনি দুঃখিত হবেন না। উনি প্রতিদিনই নগরে ভিক্ষাচর্যায় আসেন আর প্রতিদিনই ভিক্ষা না নিয়ে ফিরে যান।

সেকথা শুনে নন্দা বুঝতে পারলেন বর্দ্ধমানের এমন কোনো অভিগ্রহ রয়েছে যা পূর্ণ না হবার জন্য তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করতে পারছেন না।

কিন্তু কি সে অভিগ্রহ?

সে অভিগ্রহের কথা কারু জানবার উপায় নেই। বর্দ্ধমান সে অভিগ্রহের কথা নিজে হতে কাউকে বলবেন না। •

সুগুপ্ত তাই ঘরে আসতেই নন্দা তাঁকে সমস্ত কথা খুলে বললেন। বললেন, তোমার বুদ্ধিচাতুর্যে ধিক যদি তুমি তাঁর কী অভিগ্রহ তা না জানতে পার। তোমার অমাত্য পদে অভিষিক্ত থাকাও বৃথা যদি না কৌশাম্বীতে বর্দ্ধমান ভিক্ষা পান।

যখন তাঁদের মধ্যে এই কথা হচ্ছিল তখন সেখানে দাঁড়িয়েছিল রাণী মৃগাবতীর দূতী বিজয়া। বিজয়া সেকথা গিয়ে মৃগাবতীকে নিবেদন করল। মৃগাবতী শতানীককে বললেন। বললেন, বর্দ্ধমান আজ কয়েকমাস ধরে নগরে ভিক্ষাচর্যায় আসছেন কিন্তু ভিক্ষা না নিয়েই ফিরে যাচ্ছেন। অথচ তিনি কেন ভিক্ষা নিচ্ছেন না—সেকথা কারু মনে এল না, বা তাঁর কী অভিগ্রহ তাও জানা গেল না।

শতানীক সুগুপ্তকে ডেকে পাঠালেন। সুগুপ্ত তথ্যবাদী পণ্ডিতদের। তাঁরা অনেক শাস্ত্র মন্থন করে সেখানে দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব বিষয়ক যে সব অভিগ্রহের কথা লিপিবদ্ধ আছে ও সাত রকমের যে পিণ্ডৈষণা ও পানৈষণা তা নিরূপিত করে শ্রমণদের আহার ও জল দেবার যে রীতি তা বিবৃত করলেন। রাজাও সেই তথ্য নগরে প্রচারিত করে দিলেন ও সেই ভাবে বর্দ্ধমানকে ভিক্ষা দিতে বললেন। কিন্তু বর্দ্ধমান তবু ভিক্ষা গ্রহণ করলেন না।

সেই অভিগ্রহ নেবার পর ছ'মাস প্রায় অতীত হতে চলেছে আর মাত্র পাঁচ দিন বাকী। বর্দ্ধমান সেদিন ভিক্ষায় এসেছেন শ্রেষ্ঠী ধনবাহের ঘরে।

না ঘরের মধ্যে না ঘরের বাইরে ঠিক দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে মলিন বসনা একটী মেয়ে। মুণ্ডিত যার মাথা, হাতে হাত কড়া, পায়ে বেড়ী। হাতে কুলোর কোণে রাখা সেদ্ধ কলাই। ভাবনায় বিভোর। বর্দ্ধমানের ওপর চোখ পড়তেই সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

উৎফুল্ল হয়ে উঠল কারণ সে মনে মনে তাঁরই আগমন প্রতীক্ষা করছিল। ভাবছিল, আজ তিন দিনের আমার উপবাস। এই সময় যদি তিনি আসেন তবে তাঁকে ভিক্ষা দিয়ে আমি আহার গ্রহণ করি।

মেয়েটী তাই উদ্ভাসিত মুখে স্খলিত পায়ে বর্দ্ধমানকে ভিক্ষা দিতে এলো।

বর্দ্ধমান ভিক্ষা নেবার জন্য হাত দুটি প্রসারিতও করেছিলেন কিন্তু তখুনি আবার তা গুটিয়ে নিলেন।

তবে কি তার অন্তরের প্রার্থনা বর্দ্ধমানের কানে পৌছয় নি—না তার হৃদয়ের আকুতি?

মুহূর্ত মাত্রই। মুহূর্তের মধ্যে নামল মেয়েটীর চোখ বেয়ে শ্রাবণের অজস্র বন্যা। অঝোর ধারায়। সেই জলের ধারায় তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। সব আজ তার ব্যর্থ। তার জীবন, তার প্রতীক্ষা, তার প্রার্থনা, সব। সে কি এতই ভাগ্যহীনা যে তার হাতে শ্রমণ বর্দ্ধমানও ভিক্ষা গ্রহণ করলেন না।

কিন্তু না। সেই ঝাপসা দৃষ্টির মধ্যে দিয়েই সে দেখল বর্দ্ধমান যেন থমকে দাঁড়ালেন। তারপর এক এক পা করে এগিয়ে এলেন। আবার হাত দুটো প্রসারিত করলেন তার সামনে। না, আর এক মুহূর্তও দেরী নয়। সে কম্পিত হাতে কুলোর কোণে রাখা সেই কলাই সেদ্ধর সমস্তটা বর্দ্ধমানের হাতে ঢেলে দিল।

[ক্রমশঃ

প্রাচীন বঙ্গদেশে জৈন ধর্মের প্রভাব

শ্রীঅমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতবর্ষে যে অংশ 'প্রাচ্যদেশ' বলে পরিচিত ছিল, আজকের পশ্চিমবঙ্গের একেবারে উত্তর প্রান্তের জেলাগুলি ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলকে সেই ভূখণ্ডের অন্তর্ভূত বলা চলে। এই 'প্রাচ্যদেশে'র আর্যীকরণ যে জৈন ধর্মের দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছিল সেকথা বলেছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর। 'প্রাচ্যদেশে'র অব্যবহিত পশ্চিমে অবস্থিত মগধ যে পুরাকালে জৈনধর্মের পীঠস্থান ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিংবদন্তী ও প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, মোট চব্বিশজন জৈন তীর্থংকরের মধ্যে অন্ততঃ কুড়িজনই সেখানে আবির্ভূত, কেবল জ্ঞান প্রাপ্ত ও তিরোহিত হয়েছিলেন। জনশ্রুতি ছাড়াও, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়ান স্কুল অব্ মিডিভ্যাল্ স্কাল্পচারস' গ্রন্থে বলেছেন, বহুসংখ্যক জৈন মন্দির ও জৈন মূর্তি প্রাপ্তির ভিত্তিতে একথা প্রমাণিত হয় যে ধানবাদ-বরাকর থেকে শুরু করে উড়িষ্যা ও রেওয়া এলাকা অবধি জৈনধর্ম একদা রীতিমত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর মতে, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তখন লোকবসতি ছিল খুবই ঘন এবং সে জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিল জৈনধর্মাবলম্বী। এই সিংভূম-মানভূম-ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে পাল যুগের পূর্বের প্রত্নতাত্ত্বিক নজির বিশেষ কিছু না পাওয়া গেলেও, সে যুগে বা তার পরবর্তীকালের যেসব স্থাপত্য-ভাস্কর্যের সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে জৈন নিদর্শনের সংখ্যা অগণিত। সে কেন্দ্রভূমি থেকে জৈন ধর্মের প্রভাব যে অব্যবহিত পূর্বের বাংলাদেশকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকবে এমন অনুমান কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়।

'প্রাচ্য দেশে' আদি জৈন ধর্মের প্রতিপত্তির মূল কারণ এই যে আর্য সভ্যতা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে জৈন ধর্মই এই অনগ্রসর অঞ্চলে সব চেয়ে প্রথমে প্রবেশ লাভ করেছিল। আর্যাবর্তের সীমারেখার বাইরে পূর্ব ভারতের এই অঞ্চল তখন ছিল অনেকাংশে অরণ্যাবৃত এবং অশ্রীক ও

দ্রাবিড়বংশীয় জাতি দ্বারা অধ্যুষিত। অস্ট্রীকেরা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এ-অঞ্চলের আদিবাসী, আর দ্রাবিড়বংশীয়দের কিছু অংশ যে আর্য-অভিযানের অগ্রগতির চাপে পশ্চাদপসরণ করে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এই অরণ্য অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন সেকথা স্বীকৃত। আর্যদের কাছে এই ভূভাগ তখন ছিল এক পাণ্ডববর্জিত দেশ।যেখানে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। ফলে, আর্য-বৌদ্ধ অথবা আর্য-হিন্দু সভ্যতার এই দূরবর্তী এলাকায় এসে পৌছতে বেশ বিলম্ব হয়েছিল এবং সে অনুপ্রবেশ পরেও এ-অঞ্চলের সর্বত্র বিস্তৃত হয়নি। কিন্তু তার পূর্বেই, আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে, জৈনধর্ম বাহিত হয়ে আর্য সভ্যতার প্রথম তরঙ্গগুলি এই ভূখণ্ডের দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে। জৈন সাহিত্যের অতি প্রাচীন ও প্রধান গ্রন্থ 'আচারাঙ্গ সূত্র' যে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের আগেই অনেকাংশে রচিত হয়েছিল, অধ্যাপক জেকোবি সেকথা সম্যকভাবেই প্রমাণ করেছেন। সে-গ্রন্থ থেকে জানা যায়, শেষতম জৈন তীর্থংকর মহাবীর কেবলজ্ঞান লাভ করবার পূর্বে কিছুকাল 'প্রাচ্যদেশে'র সুহ্মভূমি, লাঢ় ও বজ্জভূমি প্রভৃতি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছিলেন। সে-সব প্রদেশের অধিবাসীরা তখন ছিল খুবই অনুন্নত। মহাবীরের উপর তারা ঢিল ছুঁড়েছিল, কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল ও আরও নানাবিধভাবে তাঁর উপর অত্যাচার করেছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মহাবীরের জীবদ্দশার কালকে খৃঃ পূঃ ৫৪০ থেকে ৪৬৮ সাল বলে নির্ণয় করেছেন। 'আচারাঙ্গ সূত্রে'র নজিরে প্রমাণ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকেও প্রাচীন বঙ্গদেশের পশ্চিম অঞ্চলে আর্য-সভ্যতা ছাড়পত্র পায়নি। কিন্তু জৈন ধর্ম প্রচারকেরা স্থানীয় অধিবাসীদের হাতে বিরূপ অভ্যর্থনা সত্ত্বেও তাঁদের ধর্ম প্রচার থেকে বিরত হননি। কেননা, মহাবীরের দেহত্যাগের দু' তিন শ' বছরের মধ্যেই জৈন ধর্মের প্রভাব বঙ্গদেশের দূর দূরান্তরে বিশেষভাবে অনুভূত হতে আরম্ভ করে। ১৩৪৬ সালের 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত তাঁর 'বঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রারম্ভ' নামক প্রবন্ধে ডক্টর প্রবোধ চন্দ্র বাগচী বলছেন—"বঙ্গদেশে জৈনধর্ম অন্ততঃ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। আর উত্তরবঙ্গে যে সে-সম্প্রদায়ের প্রভাব খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রবল

ছিল তার প্রমাণ হিউয়েন-সাংয়ের বিবরণী থেকে পাওয়া যায়। তাঁর সময়েও পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে নির্গ্রন্থদের সংখ্যা ছিল অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে বেশী।"

নির্গ্রন্থদের, অর্থাৎ প্রাচীন জৈনদের, সমাবেশ যে শুধু পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়; উত্তর বঙ্গের কোটিবর্ষ ও দক্ষিণ বঙ্গের তাম্র-লিপ্তিতেও তাঁদের সংখ্যা কিছু কম ছিল না। জৈন 'কল্পসূত্র' ও বৌদ্ধ 'বোধিসত্ত্ব-কল্পলতা', 'দিব্যাবদান' প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায় খৃঃ পূঃ যুগেই পুণ্ড্রনগর 'প্রাচ্যদেশে' জৈনধর্মের সর্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল। জৈন কল্পসূত্রে 'গোদাস-গণ' সম্প্রদায়ের প্রথম শাখাকে কোটিবর্ষ নগরে অবস্থানকারী কোটিবর্ষীয় বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং তাম্রলিপ্তিতে বসবাসকারী দ্বিতীয় শাখার নামকরণ করা হয়েছে তাম্রলিপ্তীয় বলে। বঙ্গদেশে আর্য-সংস্কৃতির এগুলি প্রথম অনুপ্রবেশ; কেননা, সেই দূর অতীতে আর্য-বৌদ্ধ বা আর্য-হিন্দু সংস্কৃতির কোন প্রবাহ এ-অঞ্চলে এসে পৌঁছয় নি। এক কথায় এই ঘটনার সমীক্ষা করে রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর বলেছেন: 'প্রাচ্যদেশে' জৈন ধর্ম দ্বারাই আর্যীকৃত হয়েছিল।

জৈন ধর্মের প্রথম তরঙ্গ অতি প্রাচীনকালেই বঙ্গদেশে এসে পৌঁছলেও খৃঃ অষ্টম-নবম শতাব্দী নাগাদ একমাত্র রাঢ় ভূখণ্ড ছাড়া অন্যান্য অঞ্চল থেকে এ ধর্মের প্রভাব প্রায় লুপ্ত হয়েছিল। তার প্রধান কারণ, পাল রাজবংশ ধর্ম বিষয়ে মোটামুটি উদার মতাবলম্বী হলেও বৌদ্ধধর্মের অনুগামী ছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেশব্যাপী পুনরুত্থানও বঙ্গদেশে জৈন ধর্মের অবনতির অন্যতম কারণ। রাঢ়দেশ, বিশেষ করে সেখানকার বিস্তীর্ণ অরণ্যাবৃত অঞ্চলে, পাল রাজশক্তি কখনও পুরাপুরিভাবে কর্তৃত্বলাভ করেনি। অতএব, পাল যুগে পশ্চাদপসরণকারী আশ্রয়প্রার্থী জৈন ধর্ম অপেক্ষা-কৃত নিরাপদ এই ভূভাগেই নিজ প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করে। আগেই বলেছি, এ অঞ্চলের অব্যবহিত পশ্চিমে পুরাকালের জৈন ধর্ম একদা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। আজকের পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় এবং বিহারের অন্তর্গত সংলগ্ন অঞ্চলে সেজন্য প্রভূত পরিমাণে জৈনমূর্তি ও মন্দিরাদির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অবিষ্কৃত হয়েছে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে, ১৮৭২-৭৩ খৃঃ আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভের মিঃ

বেগলার এই অঞ্চলের দূরদূরান্তরে পরিভ্রমণ করেন। তাঁর বিবরণ কানিংহাম এর 'অর্কিঅলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্টে'র অষ্টম খণ্ডে সবিস্তারে উল্লিখিত আছে। তা থেকে দেখা যায়, বেগলারের আবিষ্কৃত পুরাকীর্তিগুলির অধিকাংশই জৈন। পুরুলিয়া থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে সুবর্ণ-রেখার তীরে দুলমি গ্রামে মিঃ বেগলার বহু জৈন মূর্তি ও মন্দিরের অবশেষ এবং একটি ভগ্ন দুর্গ আবিষ্কার করেন। সেখান থেকে বারো মাইল দূরে দেউলি গ্রামে কয়েকটি জৈন মন্দির ও তীর্থংকর শান্তিনাথের মূর্তিসমেত বহু জৈন নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। দেউলির দেড়মাইল উত্তর-পশ্চিমে সুইসা গ্রামে পার্শ্বনাথের এক দিগম্বর মূর্তিও মিঃ বেগলারের নজরে পড়ে। পুরুলিয়ার তেইশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পাকভিরা গ্রামে আবিষ্কৃত বহু জৈন নিদর্শনের,মধ্যে পদ্মপ্রভ, ঋষভনাথ ও প্রতিমা সর্বতোভদ্রিকার মূর্তিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই একই অঞ্চলে তেলকুপি, বোড়াম, ছড়রা, লোলাড়া ও পুঞ্চ প্রভৃতি গ্রামের জৈন পুরাকীতি সম্বন্ধে নির্মলকুমার বসু মহাশয় তাঁর অনুসন্ধানের ফলাফল ১৩৪০ খৃষ্টাব্দের ভাদ্রমাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে প্রকাশ করেছিলেন। আরও সম্প্রতিকালে, পুরুলিয়া জেলার সফা, সেনারা, ঝালদা, বলরামপুর, পারা প্রভৃতি স্থানেও বহু জৈন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সংলগ্ন বাঁকুড়া জেলাতেও এককালীন জৈন কেন্দ্রের সংখ্যা কিছু কম নয়। এ জেলার প্রধান নদী পথগুলির আশেপাশে প্রাচীন জৈন কেন্দ্রের অবস্থান দেখে মনে হয়, পশ্চিমের কেন্দ্রগুলি থেকে নদীপথ বাহিত হয়েই সম্ভবতঃ এ অঞ্চলে আদি জৈনধর্মের প্রসার ঘটেছিল। দামোদরের তীরে বিহারীনাথ, দারকেশ্বরের তীরে সোনাতপল, বহুলাড়া, ধরাপাট ও ডিহর, শিলাবতীর তীরে হাড়মাসরা এবং কংসবতীর তীরে পরেশনাথ, অম্বিকানগর ও বড়কোলা প্রভৃতি স্থানে জৈনধর্ম যে একদা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল সেকথা সন্দেহাতীত। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানতঃ এ দু'টি জেলাতেই জৈন নিদর্শনের সংখ্যা বেশী হলেও বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এমন কি ২৪-পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলেও সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে কিছু কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্দ্ধমান জেলার সাতদেউলিয়া, কাটোয়া ও উজানি, মেদিনীপুর জেলার রাজপাড়া ও সুন্দরবনের নলগোড়া এবং কাঁটাবেনিয়ায় জৈন পুরাকীর্তি প্রাপ্তি থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে এই ধর্মমত আধুনিক

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে তো বটেই, দক্ষিণ অংশেও একটা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছাড়াও নৃতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রাচীন বঙ্গদেশে জৈন-ধর্মের প্রতিপত্তির কথা সমর্থন করে। বাংলা দেশের পশ্চিমের জেলাগুলিতে 'শরাক' নামে এক আদিবাসী জাতি এখনও যথেষ্ট সংখ্যায় বাস করেন যাঁরা বর্তমান আচার-আচরণে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভূক্ত হলেও আদিতে তাঁরা যে জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। 'শরাক' কথাটি 'শ্রাবক' শব্দ থেকে উদ্ভূত। জৈন সম্প্রদায়ে যাঁরা সংসার ত্যাগী সাধুসন্তের জীবন যাপন করতেন না, ধর্মকথা শ্রবণ করে সাধারণ গৃহীর মতো সংসারধর্ম পালন করতেন তাঁদেরই এই নামে অভিহিত করা হত। এ নামের ছায়া এখনও দেখা যায় 'সারাওগী' পদবীতে।

এই চিত্তাকর্ষক আদিবাসী সম্পর্কে মিঃ রিজলীই সর্বপ্রথম ব্যাপক অনুসন্ধান করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ট্রাইবস এণ্ড কাস্টমস অব বেঙ্গল'-এ তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে আধুনিক কালে হিন্দু রীতিনীতির অনুগামী হলেও শরাকদের পূর্ব পুরুষেরা জৈন ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন লোহারডগা অঞ্চলে শরাকেরা পার্শ্বনাথকেই তাঁদের প্রধান দেবতা বলে পূজা করেন যদিও পরবর্তীকালের হিন্দু প্রভাবে শ্যামচাঁদ, রাধামোহন ও জগন্নাথও তাঁদের উপাস্য। রিজলীসাহেব তাঁদের মধ্যে অহিংসার ভাবধারা বিশেষ ভাবে বর্তমান দেখতে পান। তাঁরা প্রাণী হিংসার বিরোধী ও সম্পূর্ণ নিরামিষ আহারে অভ্যস্ত। শুধু তাই নয়, 'কাটা' এই শব্দটা তাঁরা কখনই উচ্চারণ করতেন না এবং রন্ধনের সময় ভুলক্রমে হিংসামূলক এ-শব্দটি উচ্চারিত হলে প্রস্তুত আহার্য তাঁদের ফেলে দিতে হত।

১৯০১ সালের লোক গণনার-রিপোর্টে মিঃ গেইট বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শরাকদের সংখ্যার একটি তালিকা প্রকাশ করেন। তা থেকে দেখা যায়, এই সমস্ত অঞ্চলে বসবাসকারী প্রায় সাড়ে সতেরো হাজার শরাকের মধ্যে প্রায় সাড়ে তেরো হাজারই বাস করতেন মানভূমি, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলায়। তাঁদের মধ্যে আবার সাড়ে দশ হাজারের বাস ছিল মানভূমে অর্থাৎ বর্তমান কালের পুরুলিয়ায়। গেইট সাহেব লক্ষ্য করেন, বাংলা দেশের এই শরাকদের

ধারণা তাঁদের পিতৃপুরুষেরা গুজরাট থেকে এসেছিলেন। জৈনধর্ম অধুনা রাজপুতানা ও গুজরাট অঞ্চলেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ। সরাকদের পূর্বতন বাসভূমির এ-ধারণা হয়ত কিছুটা সম্ভাব্য সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। শরাকদের আর একটি ঐতিহ্যের কথাও তিনি বলেছেন। সেটি, তাঁদের ধারণা, যে ভাস্কর ও রাজমিস্ত্রী হিসাবেই তাঁদের এখানে আনা হয়েছিল। বস্তুতঃ সরাক সম্প্রদায়ের মধ্যে এ-বিশ্বাস বদ্ধমূল যে স্থানীয় জৈন মূর্তি ও মন্দিরগুলি তাঁদেরই পূর্ব-পুরুষের নির্মিত। মিঃ ডল্টনও শরাক এবং জৈনদের এক করে দেখেছেন এবং তাঁদের কিছু অংশ যে ঝাড়খণ্ড ছেড়ে জয়পুর চিতোর ইত্যাদি অঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন সেকথাও বলেছেন। বস্তুতঃ এই শ্রাবক সম্প্রদায় পরবর্তী-কালে প্রবলতর হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে পড়লেও সাবেক জৈন আচার আচরণ এখনও যথেষ্ট পরিমাণে মেনে চলেন যা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে অতীতে এ অঞ্চলে জৈন ধর্মমতের তাঁরাই অন্যতম শক্তিশালী ধারক ও বাহক ছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে, একথার উল্লেখ করা যেতে পারে যে উড়িষ্যায় কিছু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সরাকেরও বসবাস আছে। তাঁরা বাঙলাদেশে, বিশেষ করে মেদিনীপুর জেলায় অল্পবিস্তর অনুপ্রবেশ করেছেন। সে জেলার চন্দ্রকোনা, ক্ষীরপাই প্রভৃতি স্থানে অল্প সংখ্যায় তাঁদের বসতি এখনও দেখা যায়। বহু কালের সামাজিক ও ধর্মীয় আদান-প্রদানের ফলে তাঁদের বর্তমান পদবী— চাঁদ, দত্ত, কর, নন্দী প্রভৃতি বাঙালীদের পদবী থেকে বিশেষ ভিন্ন নয়। তাঁরাও নিরামিষভোজী ও অহিংসায় বিশ্বাসী। ধর্মীয় আচার-আচরণে তাঁরা চতুর্ভুজ মূর্তিতে বুদ্ধদেবের পূজাও করেন আবার বরুণ এবং গণপতিও তাঁদের উপাস্য। কিন্তু পূজিত দেবতা যিনিই হোন না কেন, তাঁর আবাহন 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' এই মন্ত্র উচ্চারণ করে করা হয়ে থাকে। উড়িষ্যা অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের পূর্বে সেখানকার বৌদ্ধ সরাকদের পূর্বপুরুষেরা মানভূম-ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের প্রবলতর জৈন সরাক গোষ্ঠীর সঙ্গে কোন প্রকারে সম্পর্কিত ছিলেন কিনা সেকথা নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। সে যাই হোক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক প্রমাণের এই অগণিত দৃষ্টান্ত থেকে কোন সন্দেহ থাকে না যে বাংলাদেশের পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলিতে, বিশেষতঃ রাঢ় ভূখণ্ডে, জৈন ধর্ম একদা প্রভূত প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল।

সরাক জাতি ও জৈনধর্ম

শ্রীতরণীপ্রসাদ মাজি

বর্তমানে বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, সিংভূম, মানভূম ও সাঁওতাল পরগণা জেলার স্থানে স্থানে সরাক জাতির বসবাস দেখা যায়। সুদূর অতীতের ইতিহাস পাওয়া না গেলেও দুই তিন শত বৎসর পুর্বের যে সমস্ত দলিল-পত্র পাওয়া যায় তাহাতে সপ্রমাণিত হয় যে সরাক জাতি জৈন ধর্মাবলম্বী। এই নিরীহ ও ধর্মপরায়ণ জাতিটি বর্তমানে কৃষিকার্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তৎপূর্বে ব্যবসা-বাণিজ্যই যে প্রধান জীবিকা ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ সরাক জাতির মধ্যে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যে বা যাহারা কৃষিকর্ম জীবিকারূপে গ্রহণ করিবে, তাহারা তীর্থদর্শনে যাইতে পারিবে না। এই কারণেই মনে হয় বর্তমানে অধিকাংশ সরাক তীর্থযাত্রাদি হইতে বিরত রহিয়াছে।

পরেশনাথ যাহা একাধিক তীর্থংকরের নির্বাণ স্থান, জৈনদিগের প্রধান তীর্থগুলির অন্যতম। এবং একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে এই পরেশনাথকে কেন্দ্র করিয়াই সরাক জাতি নিজ বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিল। কারণ তৎকালে পদব্রজেই তীর্থ যাত্রা করিতে হইত। সরাকেরা মন্দির নির্মাণ করিয়া তীর্থংকরগণের পূজার্চনা করিত। তাই অদ্যাপি সরাক অধ্যুষিত অঞ্চলে মন্দির ও মূর্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুলিয়া হইতে কয়েক মাইলের মধ্যে পালমা নামক একটি নগরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান রহিয়াছে। সেখানে মূর্তি ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। শুধু তাই নয় মানভূম জেলায়—যেখানে অধিক সংখ্যক সরাক বাস করে——সেখানে কিছুদিন আগে একস্থানে মৃত্তিকার নীচে একটি অপূর্ব তীর্থংকর মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল। বর্দ্ধমান জেলায় স্থানে স্থানে ভগ্ন দেউলের চিহ্ন বর্তমান। শুনা যায় বর্দ্ধমান জেলার মধ্য দিয়া জৈন সাধুগণ পরিক্রমা করিতেন।

সরাকগণের আচার ব্যবহারের সহিত বর্তমান জৈন সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহারের হুবহু মিল আছে। 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ'—ইহা তাহারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। তাহাদের গোত্রাদিও তীর্থংকরগণের নামানুসারে। আমিষ ভোজীগণের মধ্যে বাস করিয়াও তাহারা অদ্যাপি খাদ্য বিষয়ে পবিত্রতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহা সরাকগণের গভীর ধর্মানুরাগের পরিচায়ক। বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারেও তাহাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সরাক জাতি বহু পুরাতন এবং কতকটা গোঁড়া বলিয়াই প্রগতির স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয় নাই এবং এখনও নিজেদের সত্তা বজায় রাখিয়াছে।

কিন্তু একটি মর্মান্তিক ব্যাপার হইতেছে যে সরাকগণের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়। তাহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হয় নাই—এবং দারিদ্র্যই তাহার একমাত্র কারণ। জৈন সম্প্রদায়ের ধনী ব্যক্তিরা যদি এ বিষয়ে সজাগ হইতেন তাহা হইলে এই আত্ম-বিস্মৃত ও অধঃপতিত জাতির উন্নয়নের পথ সুগম হইত।

জৈন সম্প্রদায় বহু সৎকার্যে অর্থব্যয় করেন। যদ্যপি তাঁহারা এই বিচ্ছিন্ন ও অধঃপতিত সরাক জাতিকে আপনার ভাই বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং সর্বভাবে উন্নয়ন কার্যে সাহায্য করিতেন তাহা হইলে রাহুমুক্ত সরাক জাতির গৌরবে তাঁহারাও গৌরবান্বিত হইতেন।

সরাকদের সম্পর্কে কয়েকটী অভিমত

'সরাক' শব্দটী নিঃসন্দেহে শ্রাবক শব্দ হতে উদ্ভূত হয়েছে। এর সংস্কৃত অর্থ শ্রবণকারী। জৈনদের মধ্যে শ্রাবক শব্দটী গৃহস্থদের বেলায় প্রযুক্ত হয়।

—গেইট, সেন্সর রিপোর্ট

'সরাকে'রা সম্পূর্ণ নিরামিষাসী, কখনো মাংসাহার করেন না এবং কোন কারণেই জীব হত্যা করেন না। এমন কি ব্যঞ্জন কুটবার সময় 'কাটা' শব্দের ব্যবহার করলে তা অপবিত্র হয়ে গেছে বলে মনে করেন ও সমস্তটা ফেলে দেন।

—এইচ্. রিজলী, দি পিপল অব ইণ্ডিয়া

'সরাকে'রা যে মূলতঃ জৈন তাতে সন্দেহ নেই। এঁদের এবং এঁদের প্রতিবেশী ভূমিজদের মধ্যে যে সব কিম্বদন্তী প্রচলিত রয়েছে তাতে মনে হয় যে ভূমিজদের মানভূমে আসবার অনেক আগে হতেই সরাকেরা এখানে বসবাস করতেন। প্রাক্ভূমিজ দিনের পাড়া, ছড়রা, বোড়াম ও অন্যান্য জায়গার মন্দিরাদিও সে কথারই সাক্ষ্য দেয়। সরাকেরা চিরকালই শান্তিপ্রিয় এবং ভূমিজদের সঙ্গে এ যাবৎকাল নির্বিবাদে বাস করে এসেছেন।

—কুপল্যাণ্ড, গেজেটীয়র অব মানভূম ডিষ্ট্রীক্ট

যে সমস্ত অঞ্চলে তামা পাওয়া যায়, সেই সমস্ত অঞ্চলে গত বছর আমি পর্যবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত ছিলাম। ছোট নাগপুর মালভূমির পাদদেশ হতে··· যেখানে যেখানে তামার খনি রয়েছে সেখানেই দেখি অতীতের খনন কার্যের চিহ্ন বর্তমান। ···এ সম্পর্কে 'সরাক'দের কথা বলা হয়।

—ভি বল, অন দি এনসিয়েণ্ট কপার মাইনার্স অব সিংভূম

মানভূম জেলায় আমরা দুই বিভিন্ন রকম স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাই। তার মধ্যে যেটি বেশী প্রাচীন তার সম্বন্ধে বলা হয় যে তা সেরাপ,

সেরাব, সেরাক বা সরাক নামে যাঁরা পরিচিত তাঁদের কীর্তি। এমন কি ভূমিজরা যাঁরা এখানে দীর্ঘকাল বসবাস করছেন তাঁরাও বলেন যে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা অরণ্য পরিষ্কার করতে গিয়ে এই সব পুরাকীর্তি দেখতে পান। সিংভূমের পূর্বাঞ্চলেও সরাকেরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন—এরকম কিম্বদন্তী প্রচলিত রয়েছে। মনে হয় সরাকেরা নদীর ধার দিয়ে দিয়ে তাঁদের বসতি স্থাপন করেছিলেন। ···কাঁসাই নদীর তটভূমি পুরাকীর্তির একটী সমৃদ্ধ ক্ষেত্র। সেখানকার বহু মূর্তি আমি দেখেছি। সেগুলি লাঞ্ছনসহ তীর্থংকর মূর্তি। ···আমি যে সমস্ত মন্দিরের বর্ণনা দিয়েছি সেই মন্দিরগুলো বীর বা মহাবীর যে পথ দিয়ে পরিব্রাজন করেছিলেন সেই পথ রেখা ধরে তাঁর ভক্তদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এই সমস্ত মন্দির সময় শিখর বা সম্মেত শিখরের পরিধির মধ্যে। এই সম্মেত শিখর সম্বন্ধে আরো বলা হয় যে বীর নির্বাণের ২৫০ বছর আগে সেখানে তীর্থংকর পার্শ্বনাথ নির্বাণ প্রাপ্ত হন। তাই মনে হয় যে অরণ্যের মধ্যে মধ্যে নদীর তীরে তীরে যাঁরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন তাঁরা জৈন।

—লেঃ কর্ণেল ই. টি. ডল্টন, নোটস অন এ টুর ইন মানভূম

অহিংসা ধর্মের শ্রেষ্ঠতা ও মাংস ভক্ষণের দোষ

[মহাভারতের অনুশাসন পর্বে অহিংসা ধর্মের শ্রেষ্ঠতা ও মাংস ভক্ষণ দোষের কথা বলা হয়েছে। শ্রমণ ভাবধারার সঙ্গে এই অংশের সাদৃশ্য আশ্চর্য রকমের। পাঠকদের নিকট সেই অংশটি আমরা এখানে উপস্থিত করছি। —সম্পাদক]

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! অহিংসা, বেদোক্ত কার্য, ধ্যান, ইন্দ্রিয় সংযম, তপস্যা ও গুরু শুশ্রূষা এই কয়েকটির মধ্যে কোনটিতে শ্রেয়ঃ সাধন হইয়া থাকে?"

বৃহস্পতি কহিলেন, "ধর্মরাজ! এই ধর্ম কার্য শ্রেয়ঃ সাধনোপায় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অহিংসাই পুরুষের সর্বোৎকৃষ্ট পরমার্থ সাধন বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ ও লোভকে দোষের আকর জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ পূর্বক অহিংসা ধর্ম প্রতিপালন করে, তাহার নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অহিংসক প্রাণিগণকে আপনার সুখোদ্দেশে নিহত করে সে দেহান্তে কখনই সুখলাভে সমর্থ হয় না। যিনি সকল প্রাণীকেই আপনার ন্যায় জ্ঞান করিয়া কাহাকেও প্রহার বা কাহারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন না তিনি দেহান্তে পরম সুখ লাভ করিয়া থাকেন। যিনি সকলকেই আপনার ন্যায় সুখভোগাভিলাষী ও দুঃখ ভোগে অনিচ্ছুক বিবেচনা করিয়া সকলের প্রতি তুল্য দৃষ্টি সম্পন্ন হয়েন, দেবগণও সেই মহাপুরুষের গতি নির্দেশে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। ফলতঃ যাহা আপনার প্রতিকূল, তাহা কদাচ অন্যের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিবে না।..."

সুরগুরু বৃহস্পতি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া সর্বসমক্ষে আকাশ মার্গে প্রস্থান করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ সুরাচার্য প্রস্থান করিলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শরশয্যায় শয়ান শান্তনুতনয়কে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, "পিতামহ! ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ বেদ প্রমাণানুসারে অহিংসা ধর্মেরই সবিশেষ প্রশংসা করেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই মনুষ্য কায়মনোবাক্যে হিংসা করিয়া কিরূপে দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্মরাজ! কোন জীবকে বিনাশ ও ভক্ষণ, মনোমধ্যে তদ্‌বিষয়ের আন্দোলন ও অন্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান না করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। ব্রহ্মবাদীরা এই কারণে অহিংসা ধর্মকে চারি প্রকার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ চারিটির মধ্যে অন্যতরের অভাব উপস্থিত হইলে অহিংসা ধর্ম আর আস্পদ লাভে সমর্থ হয় না। চতুষ্পদ জন্তু যেমন এক পদের অভাব উপস্থিত হইলে ক্ষণকালও দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না। সেইরূপ এই অহিংসা ধর্মের একাংশ হীন হইলে ইহার স্থায়িতার বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। যেমন হস্তীর পদচিহ্নে অন্যান্য জন্তুর পদচিহ্ন অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই অহিংসা ধর্মে অন্যান্য ধর্ম সমুদায় সম্পূর্ণরূপে সমাবিষ্ট হয়। মনুষ্য কায়-মনোবাক্যে হিংসা করিলে তাহাকে তজ্জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। আর যিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণিহিংসায় প্রবৃত্ত হয়েন না এবং কদাপি মাংস ভক্ষণ করেন না তিনি সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। মাংস ভক্ষণাভিলাষ, মাংস ভক্ষণে উপদেশ প্রদান ও মাংস ভক্ষণ দ্বারা হিংসা জনিত পাপ জন্মে। এই নিমিত্ত তপঃপরায়ণ মহর্ষিগণ মাংসাহার করেন না। এক্ষণে মাংস ভক্ষণের দোষ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"যে ব্যক্তি মোহ প্রভাবে পুত্র সদৃশ অন্য জীবের মাংস ভক্ষণ করে, সে অতি নীচাশয় বলিয়া পরিগণিত হয়। স্ত্রীপুরুষের সংযোগ যেমন সন্তানোৎপত্তির অদ্বিতীয় কারণ, সেইরূপ হিংসাই বহুবিধ পাপযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।..."

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্মরাজ! মাংস ভক্ষণ না করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, তাহা সর্বাগ্রে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সমুদায় মহাত্মা রূপবান, অবিকলাঙ্গ, দীর্ঘায়ুঃ, বলশালী ও স্মরণশক্তি সম্পন্ন হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের হিংসা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। মহর্ষিগণ কহিয়াছেন,

ষতব্রত হইয়া প্রতিমাসে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয়, মধু মাংস পরিত্যাগ করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং বালখিল্য ও মরীচিপ মহর্ষিগণ মাংস পরিত্যাগের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন। স্বায়ম্ভূব মনু কহিয়া গিয়াছেন যে ব্যক্তি পশু হিংসা ভোজনে পরাঙ্মুখ হয় তাহাকে সর্বভূতের মিত্র বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি মাংস ভোজন না করে, সে সর্বভূতের অধৃষ্য, সর্বজন্তুর বিশ্বাস পাত্র ও সাধুদিগের সম্মান ভাজন হয়।

"তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি পরমাংস দ্বারা স্বীয় মাংস বৰ্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই প্রতিনিয়ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। ভগবান বৃহস্পতি কহিয়াছেন, লোকে মাংস ভোজনে বিরত হইলে অনায়াসে দাতা যজ্ঞশীল ও তপস্বী হইতে পারে।...

"মনুষ্য মাত্রেরই আত্ম প্রাণের ন্যায় অন্যান্য প্রাণীর প্রাণকে প্রিয়বস্তু বলিয়া জ্ঞান করা কর্তব্য। যখন সিদ্ধিলাভাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীদিগেরও মৃত্যুভয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন মাংসোপজীবী দুরাত্মাগণ কতৃক নিপীড়িত অজ্ঞ জন্তুগণ যে মৃত্যু হইতে ভীত হইবে তাহার বিচিত্র কি? মাংস ভোজন পরিত্যাগ ধর্ম, স্বর্গ ও সুখের মূলীভূত কারণ; অতএব অহিংসাকেই পরম ধর্ম, উৎকৃষ্ট তপস্যা ও সত্য স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।...

"যে ব্যক্তি মাংস ভোজনে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাঁহাকে কোনকালেই দুর্গম অরণ্য, দুর্গ বা চত্বরে অথবা উদ্যতশস্ত্র ব্যক্তি বা সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর নিকট ভীত হইতে হয় না। তিনি সর্বদাই সর্বভূতের শরণ্য, বিশ্বাসপাত্র ও শান্তি-জনক হইয়া নিরুদ্বেগে কালহরণ করিতে সমর্থ হয়েন। যদি ইহলোকে কেহই মাংসভোজী না হয়, তাহা হইলে পশু হত্যা এককালে তিরোহিত হইতে পারে। ঘাতকেরা কেবল মাংসভোজীর নিমিত্তই জীব হত্যা করিয়া থাকে; যদি মাংস ভোজন না থাকে, তাহা হইলে ঘাতকেরা কখনই হত্যারূপ পাপ-কার্যে নিরত হয় না।

"যাহারা হিংসা বৃত্তি আশ্রয় করে, তাহাদিগের আয়ুঃক্ষয় হয়; অতএব মাংস ভোজন পরিত্যাগ করা হিতাকাঙ্ক্ষী মানবগণের অবশ্য কর্তব্য। হিংস্র জন্তু সদৃশ উদ্বেগজনক মাংসাশিগণ পরলোকে কিছুতেই পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না।...

"পূর্বে আমি মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট মাংস ভোজনের যে সমুদয় দোষ শ্রবণ করিয়াছিলাম এক্ষণে তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি স্বয়ং মৃত বা অন্য কতৃক নিপাতিত প্রাণীগণের মাংস ভোজন করে, তাহাকে হত্যাকারী ব্যক্তির তুল্য ফলভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কোন জন্তুকে সংহার করিবার নিমিত্ত ক্রয় করে, যে ব্যক্তি উহাকে সংহার করে এবং যে ব্যক্তি উহার মাংস ভোজন করে, তাহাদের তিন জনকেই হত্যাজনিত মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। পণ্ডিতেরা এইরূপ তিন প্রকার হত্যা নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং মাংস ভোজনে বিরত হইয়াও অন্যকে তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা করে, তাহাকেও বধভাগী হইতে হয়, সন্দেহ নাই।

"পূর্বকালে যাজ্ঞিকগণ পুণ্য লোক লাভে অভিলাষী হইয়া ব্রীহি সমুদয়কে পশুরূপে কল্পিত করিয়া তদ্দ্বারা যজ্ঞ কার্যের অনুষ্ঠান করিতেন। ঐ সময় একদা ঋষিগণ মাংস-ভক্ষণ বিষয়ে সংশয়াবিষ্ট হইয়া চেদিরাজ বসুর নিকট গমন পূর্বক মাংস অভক্ষ্য কিনা এই প্রশ্ন করিলে তিনি অভক্ষ্য মাংসকে ভক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। সেই অপরাধের জন্য তাঁহাকে স্বর্গচ্যুত হইয়া ধরাতলে আগমন এবং ধরাতলে আগমন পূর্বক পুনরায় মাংসকে ভক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করাতে পাতাল তলে প্রবেশ করিতে হয়।...

"মাংস ভক্ষণ না করিলে সমুদয় সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমার মতে যে ব্যক্তি পরিপুর্ণ একশত বৎসর ঘোরতর তপস্যার অনুষ্ঠান করে মাংস ভোজন পরাঙ্মুখ ব্যক্তি তাহার তুল্য ফললাভ করিয়া থাকে।...

"যে মহাত্মারা এই অতি উৎকৃষ্ট অহিংসা ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অনায়াসেই স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন। যে সকল মহাত্মা আজন্ম মধু, মাংস ও মদ্য পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই মুনি বলিয়া পরিগণিত হয়েন। যাঁহারা এই অহিংসা ধর্মের অনুষ্ঠান, শ্রবণ, অধ্যয়ন বা অন্যের কর্ণ-গোচর করেন, তাঁহারা দুরাচার হইলেও তাঁহাদিগের সমুদয় পাপ বিনাশ ও জ্ঞাতিমধ্যে প্রাধান্য লাভ হয়। এই অহিংসা ধর্ম প্রভাবে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি বিপদ হইতে উদ্ধৃত, বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত, রোগী রোগ শূন্য এবং দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ দূরীভূত হইয়া থাকে। যাহারা এই ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ

করে, তাহাদিগকে কখনই তির্যগ্ যোনি লাভ করিতে হয় না, প্রত্যুত তাহাদিগের বিপুল অর্থ ও কীর্তিলাভ হয়।

"হে ধর্মরাজ। এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি কথিত মাংস ভক্ষণ ও মাংস পরিত্যাগের ফল কীর্তন করিলাম।

"ধর্ম পরায়ণ মনুষ্যেরা অহিংসাত্মক কার্যেরই অনুষ্ঠান করিবেন। যে মহাত্মা দয়া পরায়ণ হইয়া প্রাণিগণকে অভয় প্রদান করেন সমস্ত প্রাণী হইতে তাঁহার আর কিছু মাত্র ভয় উপস্থিত হয় না। প্রাণিগণ সেই অভয় দাতা ক্ষত, স্খলিত বা আহত হউন, সকল অবস্থাতেই তাঁহাকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। হিংস্র জন্তু বা পিশাচেরাও তাঁহাকে বিনাশ করে না। যিনি অন্যের বিপদে সাহায্য করেন, তাঁহার বিপদ উপস্থিত হইলে অন্যে প্রাণপণে সাহায্য করিয়া থাকে। প্রাণ দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কখন হয় নাই, হইবেও না। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই। মৃত্যু সকল প্রাণীরই অপ্রীতিকর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সকলেরই কলেবর কম্পিত হইয়া থাকে। প্রাণিগণ এই সংসার মধ্যে জন্ম ও জরাজনিত দুঃখে নিরন্তর ক্লিষ্ট হয়, পরিশেষে আবার মৃত্যু উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে যার পর নাই যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা মাংসাহার নিরত, তাহারা প্রথমতঃ কুম্ভীপাক নরক ভোগ করিয়া পরিশেষে বারংবার তির্যগ্ জাতির গর্ভে অবস্থান পূর্বক ক্ষার, অম্ল কটুরস এবং মূত্র, শ্লেষ্মা, পুরীষ দ্বারা সিক্ত ও ক্লিষ্ট হয়, তৎপরে ভূমিষ্ঠ হইয়া অন্যের বশীভূত এবং পুনঃ পুনঃ ছিন্ন ও পতিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে বারংবার অন্য কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইতে হয়।

"পৃথিবীতে আত্মাপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই; অতএব সমুদয় প্রাণীর আত্মাতে দয়াবান হওয়া সকলেরই উচিত। যিনি যাবজ্জীবন কোন পশুর মাংস ভোজন করেন না স্বর্গে তাঁহার সুবিস্তীর্ণ স্থান লাভ হইয়া থাকে। যে দুরাত্মারা জীবিত-প্রিয় পশুগণের মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা পরজন্মে সেই সমস্ত নিহত পশু কর্তৃক আবার ভক্ষিত হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা পশু বিনাশ করে পরজন্মে তাহারা অগ্রে এবং যাহারা সেই বিনষ্ট পশুর মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা তৎপশ্চাৎ সেই পশু কর্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে, তাহাকে পরজন্মে অন্য কর্তৃক

আক্রুষ্ট ও যে অন্তের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে, তাহাকে তৎ কর্তৃক দ্বিষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি যে অবস্থায় যে কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই অবস্থাতেই সেই কার্যের ফলভোগ করিতে হয় সন্দেহ নাই। ফলতঃ অহিংসাই মনুষ্যের পরম ধর্ম, পরম দান, পরম তপ, পরম যজ্ঞ, পরম বল, পরম মিত্র, পরম সুখ, পরম সত্য ও পরম জ্ঞান। অহিংসাই সমস্ত যজ্ঞের দান ও সমস্ত তীর্থ স্নানের তুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীস্থ সমুদয় বস্তু দানের ফলও অহিংসার ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। অহিংসক ব্যক্তিরা সকলের পিতামাতা স্বরূপ।

"হে ধর্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সামান্যতঃ অহিংসার ফল কীর্তন করিলাম, ইহার সমগ্র ফল শত বৎসরেও বলিয়া নিঃশেষ করা যায় না।"

—মহাভারত, অনুশাসন পর্ব, অধ্যায় ১১৩-১১৬

জৈন সাহিত্যে উৎসব

বাঙলা দেশে বারো মাসে তেরো পার্বণের কথা আমরা বলে থাকি অর্থাৎ বছরে যত না মাস তার চাইতে বেশী উৎসব বা পার্বণ। কিন্তু একথা শুধু বাঙলাদেশ সম্বন্ধেই নয়, ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও বোধ হয় বলা যায়।

এই উৎসবের বাড়াবাড়ি আবার শরৎকালে বিশেষ করে দুর্গাপুজো বা নবরাত্রি হতে কালীপুজো বা দেওয়ালী পর্যন্ত।

একালের উৎসবের সঙ্গে কমবেশী আমরা সকলেই পরিচিত। তাই এখানে সেকালের কিছু উৎসবের আমরা পরিচয় দেব। এই পরিচয় প্রাচীন জৈন সাহিত্য হতে গৃহীত। অর্থাৎ সেকালে যেসব উৎসবাদি প্রচলিত ছিল তাদের নাম ও বিবরণ জৈন সাহিত্যে যেভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাই। এভাবে যদি আমরা অন্যান্য সাহিত্য হতেও তৎকালীন প্রচলিত উৎসবাদির নাম ও বিবরণ সংগ্রহ করি তবে তুলনামূলক আলোচনার পথই যে সহজ হবে তা নয়, সেই সঙ্গে আমরা আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পরিপূর্ণভাবে চিনতে ও জানতে পারব।

জৈন আচারাঙ্গ সূত্রে সাধু ও সাধ্বীদের ভিক্ষাটন প্রসঙ্গে কিছু উৎসব ও দেবদেবীর নামের উল্লেখ আছে। জৈন সাধু ও সাধ্বীরা যেখানে এই সমস্ত পুজো বা উৎসবাদি হয় সেখান হতে যেন ভিক্ষা গ্রহণ না করেন। যেমন সামূহিক ভোজন; শ্রাদ্ধ; ইন্দ্র, রুদ্র, মুকুন্দ, ভূত, যক্ষ বা নাগ উৎসব; অথবা চৈত্য, বৃক্ষ, গিরি, দরী কূপ, পুষ্করিণী, হ্রদ, নদী, সরোবর, সাগর বা খনির উৎসব অথবা এমন উৎসব যেখানে অনেক শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, অতিকৃপণ ও ভিক্ষুকদের ভোজন করানো হয়।

জ্ঞাতাধর্ম কথায় নিম্নলিখিত দেব দেবীর নাম পাওয়া যায়। যেমন: ইন্দ্র, স্কন্দ, রুদ্র, শিব, বৈশ্রমণ, নাগ, ভূত, যক্ষ, অজ্জা, কোট্টকিরিয়া।

ভগবতী সূত্রে যে সমস্ত দেবদেবীর নাম পাওয়া যায় তা এই: ইন্দ্র, স্কন্দ, রুদ্র, শিব, কুবের, আর্যা পার্বতী, মহিষাসুর, চণ্ডিকা।

ভগবতী সূত্রের অন্যত্র ইন্দ্রমহ, স্কন্দমহ, মুকুন্দমহ, নাগমহ, যক্ষমহ, ভূতমহ, কূপমহ, তড়াগমহ, নদীমহ, হ্রদমহ, রুদ্রমহ, চৈত্যমহ, স্তূপমহ'র বর্ণনা পাওয়া যায়।

নিশীথ চূর্ণি ও জ্ঞাতাধর্ম কথাতেও অনুরূপ উৎসবের নাম পাওয়া যায়।

এই সমস্ত উৎসবের মধ্যে ইন্দ্রমহ আষাঢ় পূর্ণিমায়, স্কন্দমহ আশ্বিন পূর্ণিমায়, যক্ষমহ কার্তিক পূর্ণিমায়, ভূতমহ চৈত্র পূর্ণিমায় পরিপালিত হত বলে বলা হয়েছে।

এবারে আমরা এই সমস্ত উৎসবের পৃথক পৃথক বিবরণ উপস্থিত করব।

ইন্দ্রমহ—উপরোক্ত উৎসবের মধ্যে ইন্দ্রমহ বোধহয় সব চাইতে প্রাচীন। ইন্দ্রমহ অর্থাৎ ইন্দ্রের উৎসব। যদিও আমরা সাধারণতঃ একজন ইন্দ্রের কথাই জানি কিন্তু জৈন সাহিত্যে চৌষট্টি জন ইন্দ্রের উল্লেখ আছে। এই চৌষট্টি জন ইন্দ্রের মধ্যে যিনি প্রথম দেবলোকের ইন্দ্র, যাঁর নাম শক্র তাঁরই এই উৎসব।

এই ইন্দ্রোৎসব কে কবে সুরু করেছিলেন তার যে বিবরণ ত্রিষষ্টিশলাকা-পুরুষ-চরিত্রে দেওয়া আছে সে এইরূপ :

আপনারাই হয়ত জৈনদের চব্বিশজন তীর্থংকরের প্রথম তীর্থংকর ভগবান ঋষভদেবের নাম অনেকেই শুনে থাকবেন। সেই ঋষভদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল ভরত। যাঁর নাম হতে আসমুদ্রহিমাচল এই ভূখণ্ডের নাম হয়েছে ভারতবর্ষ। এ কথা যে শুধু জৈনরাই বলেন তা নয়, শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে :

প্রিয়ব্রতোনাম সুতো মনোঃস্বায়ংভুবস্য যঃ।
তস্যাগ্নীধ্রস্ততো নাভিঋষভস্তৎসুতঃ স্মৃতং॥
তমাহুর্বাসুদেবাংশং মোক্ষধর্মবিবক্ষয়া।
অবতীর্ণং সুতশতং তস্যাসীদ্ ব্রহ্মপারগম্॥
তেষাং বৈ ভরতো জ্যেষ্ঠো নারায়ণপরায়ণঃ
বিখ্যাতং বর্ষমেতদ্যন্নাম্না ভারতমদ্ভূতম্॥

—স্কন্ধ ১১ অধ্যায় ২

সে যা হোক্, এই ভরত একদিন ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে দেবরাজ, যেরূপে আপনি আমাদের দেখা দেন, স্বর্গেও কি আপনি সেই রূপেই অবস্থান

করেন না অন্যরূপে ? কারণ দেবতাদের সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে আপনারা 'কামরূপ' অর্থাৎ ইচ্ছানুযায়ী রূপ ধারণ করতে পারেন।

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র বললেন, হে রাজন, স্বর্গে আমাদের রূপ এ রকম নয়, সে রূপ এ রকম যে সেরূপ মানুষ দেখতে সমর্থই নয়। ভরত তখন সেই রূপ দেখতে চাইলেন। ইন্দ্র তখন 'যোগ্যালংকারশালিনীম্ স্বাংগুলীং দর্শয়ামাস জগদ্বেশ্মৈকদীপিকাম্'—যোগ্যালংকারে সুশোভিত ও জগৎরূপ মন্দিরের বর্তিকার মতো নিজের একটি অঙ্গুলি ভরতকে দেখালেন ও একটী অঙ্গুরীয়ক তাঁকে দান করলেন। ভরত সেই অঙ্গুরীয়ক নিজের রাজধানী অযোধ্যায় নিয়ে এসে সেখানে স্থাপন করে এক অষ্ট দিনব্যাপী উৎসবের আয়োজন করলেন। সেই হতে ইন্দ্রোৎসব 'সমারব্ধো লোকৈরদ্যাঽপি বর্ততে'—ইন্দ্র-পূজার আরম্ভ ও লোকপ্রচলিতি।

ইন্দ্রপূজার প্রচলন সম্বন্ধে অনুরূপ বিবরণ আবশ্যক চূর্ণি, বাসুদেব হিণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থেও পাওয়া যায়। স্থানাঙ্গ সূত্রে ইন্দ্রমহ আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় অর্থাৎ কোজাগরী পূর্ণিমায় হবার উল্লেখ আছে। রামায়ণেও আশ্বিন পূর্ণিমায় ইন্দ্রমহ হত বলে বলা হয়েছে।

ইন্দ্রধ্বজ ইবোদ্ভূতঃ পৌর্ণমাস্যাং মহীতলে।
আশ্বযুক্ সময়ে মাসি গত শ্রীকো বিচেতনঃ॥

—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১৬, শ্লোক ৩৬

উত্তরাধ্যয়নের টীকায় কম্পিলপুরের রাজা দ্বিমুখ যেভাবে ইন্দ্রমহ উৎসব পালন করেছিলেন তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তার খানিকটা এখানে তুলে দিচ্ছি :

একবার ইন্দ্রোৎসবের সময় এলে রাজা দ্বিমুখ পৌরজনদের ইন্দ্রধ্বজ স্থাপন করবার আদেশ দিলেন। নাগরিকগণ উত্তম বস্ত্রে একটি মনোহর স্তম্ভ আচ্ছাদিত করে তার উপরে সুন্দর বস্ত্রের একটি ধ্বজা স্থাপন করলেন। তারপর ছোট ছোট ঘণ্টা ও ধ্বজায় সেই স্তম্ভটিকে সুসজ্জিত করলেন। ভ্রমর গুঞ্জরিত পুষ্প ও মুক্তা মালা দ্বারা সুশোভিত করলেন। এবং বাদ্যভাণ্ড সহকারে সেই ধ্বজাটিকে নগরের মাঝখানে স্থাপন করলেন। তারপর পত্র-পুষ্প ও ফলের অর্ঘ্য দিয়ে তাঁরা ধ্বজার পূজো করলেন। সেখানে কেউ নৃত্য

করতে লাগলেন, কেউ গীতবাদ্য। কেউ বা কল্প বৃক্ষের মতো যাচকদের দান দিতে লাগলেন। কেউ বা কর্পূর-কেশর-সুবাসিত রং ও সুগন্ধিত চূর্ণ ছড়াতে লাগলেন। এভাবে সাতদিন ধরে উৎসব চলল। পূর্ণিমা লাগলে ত্রিমুখ রাজা সেই ধ্বজার পুজো করলেন।

অনুরূপ ইন্দ্রপূজার বিবরণ অন্যত্রও পাওয়া যায়।

ইন্দ্রর বিবরণ কল্পসূত্রে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে। তার খানিকটা— তিনি দেবিংদে অর্থাৎ দেবতাদের স্বামী, দেবরায় অর্থাৎ দেবতাদের রাজা, বজ্জপাণি—বজ্রধারণকারী, পুরন্দর—দৈত্যনগর বিনাশকারী, সহস্সক্খে—এক সহস্র চক্ষু সম্পন্ন, (ইন্দ্রের পাঁচশ জন মন্ত্রী ছিলেন। পাঁচশ জন মন্ত্রীর এক হাজার দৃষ্টির পরামর্শানুসারে ইন্দ্র কাজ করতেন।) মঘবং—মঘবা দেব যাঁর সেবা করেন, পাবসাসনে—পাক নামক দৈত্যকে যিনি শাসন করেন বা শিক্ষা দেন, ইত্যাদি।

স্কন্দমহ—বা কার্তিক উৎসব। আবশ্যক চূর্ণিতে আছে যে ভগবান মহাবীর যখন শ্রাবস্তীতে পৌছলেন তখন সেখানে স্কন্দ বা কার্তিককে নিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হচ্ছিল।

বৃহৎ কল্পসূত্রেও স্কন্দের মূর্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। মূর্তি দারু বা কাষ্ঠ নির্মিত হত। এই মূর্তির সামনে সমস্ত রাত্রি ধরে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হত।

রুদ্রমহ—রুদ্র ঘরের উল্লেখ অনেক জৈন গ্রন্থেই পাওয়া যায়। এই রুদ্রকে মহাদেবতাও বলা হয়েছে। রুদ্রঘরে—রুদ্রের সঙ্গে সঙ্গে মাঈ বা চামুণ্ডা, আদিত্য ও দুর্গার মূর্তিও স্থাপিত হত। ব্যবহার ভাষ্যে বলা হয়েছে রুদ্রঘর মৃত ব্যক্তির শবের উপর নির্মিত হত। রুদ্রমূর্তিও দারু বা কাষ্ঠেরই হত।

মুকুন্দমহ—জৈন গ্রন্থে মুকুন্দমহের উল্লেখ আছে। মুকুন্দের সঙ্গে সঙ্গে বাসুদেব ও বলদেবের পূজাও প্রচলিত ছিল। বলদেবের মূর্তির সঙ্গে হাল বা লাঙলও থাকত।

শিবমহ—শিবপূজাও সে সময় প্রচলিত ছিল। পাতা ফুল গুগ্‌গুল ও জলের দ্বারা শিবের পুজো হত।

বৈশ্রমণ মহ—বৈশ্রমণ অর্থাৎ কুবের। জীবাজীবাভিগম্ সূত্রে কুবেরকে যক্ষ ও উত্তর দিকের অধিপতি বলে বলা হয়েছে।

নাগমহ—নাগপূজার প্রারম্ভ সম্বন্ধে জৈনগ্রন্থে যে গল্প আছে তার সঙ্গে ভগীরথের গঙ্গানয়নের মিল ও অমিল দুই-ই রয়েছে।

ভগবান ঋষভদেবের নাম আগেই উল্লেখ করেছি। তিনি অষ্টাপদ বা কৈলাসে নির্বাণ প্রাপ্ত হন। তাঁর নির্বাণের পর ভরত সেখানে একটি রত্নময় মন্দির নির্মাণ করেন। কালান্তরে সগরের জহ্নু আদি ষাট হাজার পুত্র একবার ভ্রমণ করতে করতে অষ্টাপদ পাহাড়ে যান। সেখানে মন্দিরটিকে সুরক্ষিত করবার জন্য তাঁরা সেই পর্বতের চারদিকে পরিখা খনন করেন ও গঙ্গার জল এনে সেই পরিখা পূর্ণ করেন। সেই গঙ্গার জল যখন নাগ কুমারদের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে তখন নাগকুমারদের আজ্ঞায় দৃষ্টিবিষ সাপেরা এসে সগরপুত্রদের ভস্ম করে দেয়।

কিছুকাল বাদে সেই গঙ্গাজল পরিখার ভিতর আর আবদ্ধ রইল না নিকটবর্তী গ্রামে তা প্রবেশ করতে লাগল। সেকথা জানতে পেরে সগর তাঁর পৌত্র ভগীরথকে পাঠালেন গঙ্গাজলকে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলবার জন্য। ভগীরথ অষ্টাপদে গিয়ে নাগ পূজা করলেন ও তাঁর অনুমতি নিয়ে গঙ্গাজল সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। এই নাগ পূজার প্রারম্ভ।

এই গল্পটি উত্তরাধ্যয়ন টীকার মতো ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষ-চরিত্র ও বাসুদেব হিণ্ডীতেও পাওয়া যায়।

নাগপূজার বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতাধর্ম কথায় আছে। রাণী পদ্মাবতী খুব জাঁকজমকের সঙ্গে এই পুজো করতেন। সেই সময়ে সমস্ত নগরে জল ছড়ানো হত। মন্দিরের নিকট পুষ্পমণ্ডপ নির্মাণ করা হত। সুন্দর ও সুগন্ধিত মাল্যে তা সুসজ্জিত করা হত। পদ্মাবতী ঝিলে স্নান করে আর্দ্রবস্ত্রে সেই মন্দিরে যেতেন—প্রতিমা পুজো করতেন।

যক্ষমহ—যক্ষপূজা ভগবান মহাবীরের সময়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল বলা যায় কারণ প্রব্রজ্যাকালে তিনি অনেক সময়েই এই সব যক্ষায়তনে অবস্থান করতেন।

যক্ষদের সম্বন্ধে জৈন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এরা 'বাণ-মন্তর' দেবতা। বাণ-মন্তর অর্থ বনের মধ্যভাগে যাঁরা বাস করেন।

যক্ষের রূপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এঁদের বর্ণ শ্যাম, পাণি, পাদ, তল,

নখ, তালু, জিহ্বা ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ ; গম্ভীর আকৃতি ও কিরীট ও রত্নালঙ্কার ভূষিত।

যক্ষ যেমন পুত্রদাতা, রোগনাশক ও বলদায়ক তেমনি কষ্টদানকারীও। যক্ষ ক্রুদ্ধ হলে নির্দয় ও হিংসক।

ভূতমহ--ভূত নিশাচর। আবশ্যক চূর্ণিতে ভূতের সম্মুখে বলি দেবার উল্লেখ আছে। ইন্দ্রমহ আদির মতো ভূতমহও সেকালের একটি বিশিষ্ট পর্ব। এরা রক্তপানকারী ও মাংসখাদক।

অজ্জা-কোট্টকিরিয়া—অজ্জা কোট্টকিরিয়া আর কেউ নয়, আমরা যে দুর্গা পুজো করি সেই দুর্গা। দুর্গা যখন শান্তিময়ী তখন অজ্জা বা আর্যা। যখন মহিষাসুরমর্দিনী তখন কোট্টকিরিয়া।

পুস্তক পরিচয়

তীর্থংকর ভগবান শ্রীমহাবীর, জৈন চিত্রকলা নিদর্শন, বোম্বাই, ১৯৭৪। মূল্য ৬১.০০ টাকা।

ভগবান মহাবীরের পুণ্য জীবন ৩৫ খানি রঙীন চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রখ্যাত শিল্পী গোকুলদাস কাপড়িয়া। মুনিশ্রী যশোবিজয়জীর নির্দেশনায় ও উৎসাহে এই অমূল্য গ্রন্থটী ভগবান মহাবীরের ২৫০০ নির্বাণ উৎসব বৎসরে প্রকাশিত হয়েছে। সকলের বোধার্থে ছবির ব্যাখ্যা গুজরাতী, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় দেওয়া হয়েছে। জৈন প্রতীকের ১২১ খানি রেখাচিত্র ও শিল্প সম্পর্কিত ১২টী পরিশিষ্ট গ্রন্থের মূল্য আরো বর্দ্ধিত করেছে। শিল্প রসিকদের এই গ্রন্থটী অবশ্যই সংগ্রহণীয়। আশা করি ভগবান পার্শ্বনাথ, অরিষ্ট-নেমি, ঋষভদেব প্রভৃতি তীর্থংকরের জীবনও এইভাবে চিত্রের মাধ্যমে পরিবেশন করবার প্রকল্প মুনিশ্রী অবশ্যই গ্রহণ করবেন।

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
দ্বিতীয় বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৮১ ॥ সপ্তম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :
গণেশ লালওয়ানী

পার্শ্বনাথ, মথুরা

বর্দ্ধমান-মহাবীর

[জীবন চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

মুহূর্তের মধ্যে সেই কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল কৌশাম্বীতে—বর্দ্ধমান ভিক্ষাগ্রহণ করেছেন শ্রেষ্ঠী ধনবাহের ঘরে ক্রীতদাসী চন্দনার হাতে। এই সেই চন্দনা যাকে তিনি নগরের চৌমাথা হতে কিনে নিয়ে এসেছিলেন। মেয়েটী রূপসীই ছিল না; তার চারপাশে ছিল শুভ্রতার, নির্মলতার এক পরিমণ্ডল। তাই তিনি তাকে ক্রীতদাসীদের ঘরে না পাঠিয়ে নিজের অন্তঃপুরে স্থান দিয়েছিলেন, নিজের মেয়ের মতো ব্যবহার করেছিলেন। আর চন্দনের মতো শীতল তার ব্যবহার বলে তার নাম দিয়েছিলেন চন্দনা।

কিন্তু চন্দনার প্রতি শ্রেষ্ঠীর এই অহেতুক স্নেহই হল চন্দনার কাল। শ্রেষ্ঠীর স্ত্রী মূলা এর জন্য বিষ চোখে দেখতে লাগলেন চন্দনাকে। ভাবলেন, চন্দনা তার রূপের জন্য হয়ত একদিন কর্ত্রী হয়ে উঠবে এই ঘরের। সেদিন সে তার সপত্নীই হবে না, সেদিন সন্তানহীনা মূলার কোন মর্যাদাই থাকবে না শ্রেষ্ঠীর চোখে।

কিন্তু শ্রেষ্ঠীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি করতে পারেন মূলা? তাছাড়া শ্রেষ্ঠীর অনুরাগের এখনো তিনি কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পান নি।

তবু চন্দনার প্রতি তাঁর দুর্ব্যবহারের সীমা নেই।

কিন্তু শেষে একদিন সেই অনুরাগের প্রমাণও পাওয়া গেল। অন্ততঃ মূলার তাই মনে হল। মূলা দেখলেন, শ্রেষ্ঠী সেদিন মধ্যাহ্নে ঘরে আসতেই চন্দনা যেভাবে ভৃঙ্গারে করে তাঁর পা ধোয়াবার জল নিয়ে এল। তারপর তাঁর পায়ের কাছে বসে তাঁর পা ধুইয়ে দিল।

শ্রেষ্ঠী অবশ্যই নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, নিজেই ধুয়ে নিতে পারবেন। অন্যদিন অন্য দাসীরাই ধুইয়ে দেয়। আজ কেউ নিকটে ছিল না। তাই চন্দনা জল নিয়ে এসেছে। কিন্তু চন্দনা তাঁর কথা শুনল না।

তারপর পা ধোয়াবার সময় কেমন করে তার চুলের গ্রন্থি খুলে গিয়ে সমস্ত চুল এলিয়ে পড়ল। কিছু মাটিতে গিয়ে পড়ল। চুলে কাদা লাগবে ভেবে শ্রেষ্ঠী সেই চুল আলগোছে তুলে নিয়ে আবার তার মাথায় গ্রন্থি বেঁধে দিলেন।

মূলা এই দৃশ্য নিজের চোখেই দেখলেন। এর মধ্যে কিছুই অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু মূলার চোখে ঈর্ষ্যার অঞ্জন। মূলা তাই সমস্তটাকে অনুরাগের লক্ষণ বলে ধরে নিলেন।

এর জন্য চন্দনাকে কি শাস্তি দেওয়া যায়? শুধু শাস্তি কেন, তাকে কী একেবারেই সরিয়ে দেওয়া যায় না? মূলা সেদিন হতে সেই সুযোগেরই অপেক্ষা করে রইলেন।

সেই সুযোগও আবার সহসাই এসে গেল। শ্রেষ্ঠী কি একটা কাজে তিন দিনের জন্য কৌশাম্বীর বাইরে গেলেন। মূলা সেই অবসরে এক ক্ষৌরকারকে ডেকে তাঁর স্বামী চন্দনার যে চুল স্পর্শ করেছিলেন তা কাটিয়ে ফেললেন। তারপর তার হাতে কড়া, পায়ে বেড়ি পরিয়ে নীচের এক অন্ধকার কুঠরীতে বন্ধ করে দিয়ে পিতৃগৃহে চলে গেলেন। যাবার আগে আন্যান্য দাসদাসীদের বলে গেলেন একথা যেন তারা শ্রেষ্ঠীর কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না করে।

শ্রেষ্ঠী ফিরে এসে তাই মূলার পিতৃগৃহে যাবার সংবাদ পেলেন কিন্তু চন্দনার কোনো খবরই পেলেন না।

শ্রেষ্ঠী চন্দনার জন্য চিন্তিত হলেন ও তার ব্যাপক অনুসন্ধান করতে সুরু করলেন। তখন এক বৃদ্ধা দাসী সমস্ত কথা তাঁকে খুলে বলল। বলল, মূলার ভয়েই তারা শ্রেষ্ঠীকে এতক্ষণ সমস্ত কথা খুলে বলতে পারে নি।

শ্রেষ্ঠী তখন চন্দনা যে কুঠরীতে বন্ধ ছিল সেই কুঠরীর দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলেন ও দরজা খুলে তাকে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে এলেন। চন্দনার তখনকার স্থিতি দেখে তাঁর চোখেও জল এসে গিয়েছিল। কিন্তু চন্দনাকে তখনই কিছু খেতে দেওয়া দরকার। ঘরে আর কিছু নেই। রান্নাঘরেও কুলুপ দেওয়া। শ্রেষ্ঠী তাই গাই বাছুরের জন্য যে কলাই সেদ্ধ করা ছিল তাই পাত্রের অভাবে কুলোর এক কোণে রেখে নিয়ে এলেন ও

চন্দনাকে তাই খেতে দিয়ে কামার ডাকতে গেলেন—চন্দনার হাতের কড়া, পায়ের বেড়ী কাটিয়ে দিতে হবে। শ্রেষ্ঠীও যেই গেছেন। আর বর্দ্ধমানও সেই এসেছেন।

কিন্তু কে এই চন্দনা! কে সেই ভাগ্যবতী যার হাতে বর্দ্ধমান ভিক্ষা গ্রহণ করলেন! শ্রেষ্ঠীর গৃহে কৌশাম্বীর সমস্ত লোক ভেঙে পড়েছে। শতানীক এসেছেন আর পদ্মগন্ধা মৃগাবতী। সুগুপ্ত এসেছেন ও নন্দা। সকলের দৃষ্টি এখন চন্দনার ওপর।

তোমরা কাকে বলছ চন্দনা? এতো বসুমতী—বলে এগিয়ে এলো রাজান্তঃপুরের এক বৃদ্ধা দাসী। এ যে রাজা দধিবাহনের মেয়ে বসুমতী।

মৃগাবতী এবারে চন্দনাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছেন। বলেছেন, বসুমতী, আমি যে তোর মাসী হই। যুদ্ধে তোর বাবা মারা যাবার পর আমি তোদের অনেক সন্ধান করিয়েছি। কিন্তু কোন সন্ধান পাইনি। শুনি, প্রাসাদ আক্রমণ হলে তোরা প্রাসাদ পরিত্যাগ করে কোথায় যেন চলে গেলি।

তখন প্রকাশ পেল প্রাসাদ আক্রমণের সময় এক সুভট যে ভাবে তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল। মা ধারিণী শীল রক্ষার জন্য যে ভাবে নিজের প্রাণ দিলেন। বসুমতী আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল কিন্তু সুভটের হৃদয় পরিবর্তন হওয়ায় সে তাকে আশ্বস্ত করে কৌশাম্বীতে নিয়ে আসে। কিন্তু তার স্ত্রীর বিরূপতায় সে শেষ পর্যন্ত চন্দনাকে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। প্রথমে তাকে কিনতে চেয়েছিল কৌশাম্বীর এক রূপোপজীবিনী। কিন্তু সে তার ঘরে যেতে অস্বীকার করে। পরে শ্রেষ্ঠী ধনবাহ তাকে ক্রয় করে নিয়ে আসেন।

মৃগাবতী আর একবার তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, বসুমতী আজ হতে তোর সমস্ত দুঃখের অবসান হল।

সেকথা শুনে চন্দনা চোখের জলের ভেতর দিয়ে হাসল। হাসল, কারণ সংসারে কি দুঃখের শেষ আছে! যদিও চন্দনার বয়স খুব বেশী নয়, তবু সে সংসারের নির্লজ্জ রূপটাকে দেখেছে। দেখেছে মানুষের লালসা ও লোভ, নীচতা ও উৎপীড়ন। সংসারে তার আর মোহ নেই। সে শান্তি চায়, জন্ম মৃত্যুর এই প্রবাহ হতে মুক্তি।

চন্দনা তাই রাজান্তঃপুরে ফিরে গেল না। প্রতীক্ষা করে রইল সেইদিনের যেদিন বর্দ্ধমান কেবল-জ্ঞান ল'ভ করে সর্বজ্ঞ তীর্থংকর হবেন। বর্দ্ধমান যখন জ্ঞান লাভ করে সর্বজ্ঞ তীর্থংকর হলেন সেদিন চন্দনা এসে তাঁর কাছে সাধ্বী ধর্ম গ্রহণ করল। মেয়েদের মধ্যে চন্দনাই তাঁর প্রথম শিষ্যা।

চন্দনা এই জীবনেই সাধ্বী ধর্ম পালন করে জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ হতে মুক্তি লাভ করেছিল।

আর মৃগাবতী? মৃগাবতীও পরে সাধ্বী ধর্ম গ্রহণ করে শ্রমণী সংঘে প্রবেশ করেছিলেন যার সর্বাধিনায়িকা ছিল আর্যা চন্দনা। কিন্তু সেকথা এখানে নয়।

বর্দ্ধমান কৌশাম্বী হতে সুমঙ্গল, সুচ্ছেত্তা, পালক আদি গ্রাম হয়ে এলেন চম্পায়। চম্পায় তিনি তাঁর প্রব্রজ্যা জীবনের দ্বাদশ চাতুর্মাস্য ব্যতীত করবেন।

বর্দ্ধমান সেখানে এসে আশ্রয় নিলেন স্বাতী দত্ত নামক এক ব্রাহ্মণের যজ্ঞ শালায়।

সেই যজ্ঞ শালায় বর্দ্ধমানের তপশ্চর্যায় প্রভাবিত হয়ে প্রতি রাত্রে তাঁকে বন্দনা করতে আসে পূর্ণভদ্র ও মণিভদ্র নামে দু'জন যক্ষ। বর্দ্ধমানের সঙ্গে তাদের কথা হয়। স্বাতি দত্ত যেদিন সেকথা জানতে পারলেন সেদিন তিনিও এলেন তাঁর কাছে ধর্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হয়ে। এসেই প্রশ্ন করলেন, এই শরীরে আত্মা কে?

বর্দ্ধমান প্রত্যুত্তর দিলেন, যা আমি শব্দের বাচ্যার্থ, তাই আত্মা।

আমি শব্দের বাচ্যার্থ বলতে আপনি কী বলতে চান?

স্বাতি দত্ত, যা এই দেহ হতে সম্পূর্ণ-ই ভিন্ন এবং সূক্ষ্ম।

ভগবন্, কি রকম সূক্ষ্ম? শব্দ, গন্ধ ও বায়ুর মতো সূক্ষ্ম কী?

না স্বাতি দত্ত, কারণ চোখ দিয়ে শব্দ, গন্ধ ও বায়ুকে দেখা না গেলেও, অন্য ইন্দ্রিয় দিয়ে এদেরকে গ্রহণ করা যায়। যেমন কান দিয়ে শব্দকে, নাক দিয়ে গন্ধকে, ত্বক দিয়ে বায়ুকে। যা কোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করা যায় না তাই সূক্ষ্ম; তাই আত্মা।

ভগবন্, তবে কি জ্ঞানই আত্মা ?

না, স্বাতি দত্ত। জ্ঞান তার অসাধারণ গুণ মাত্র, আত্মা নয়। যার জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানীই আত্মা।

স্বাতি দত্ত অন্য প্রশ্ন করলেন। বললেন, ভগবন্ প্রদেশন শব্দের অর্থ কী ?

বর্দ্ধমান বললেন, প্রদেশন শব্দের অর্থ উপদেশ। উপদেশ দুই ধরণের : ধার্মিক, অধার্মিক।

স্বাতি দত্ত আবারো অন্য প্রশ্ন করলেন। ভগবন্, প্রত্যাখ্যান কী ?

স্বাতি দত্ত, প্রত্যাখ্যান অর্থ নিষেধ। নিষেধও দুই ধরণের। মূল-গুণ প্রত্যাখ্যান, উত্তর গুণ প্রত্যাখ্যান। আত্মার দয়া, সত্যবাদিতা আদি স্বাভাবিক মূলগুণের রক্ষা ও হিংসা, অসত্যাদি বৈভাবিক প্রবৃত্তির পরিত্যাগ মূলগুণ প্রত্যাখ্যান। এই মূলগুণের সহায়ক সদাচারের বিপরীত আচরণের ত্যাগ উত্তরগুণ প্রত্যাখ্যান।

এই সব প্রশ্নোত্তরের ফলে স্বাতী দত্তের বিশ্বাস হল বর্দ্ধমান কেবল মাত্র কঠোর তপস্বীই নন, মহাজ্ঞানীও।

চাতুর্মাস্য শেষ হতে বর্দ্ধমান সেখান হতে এলেন জংভিয় গ্রাম। জংভিয় গ্রামে কিছুকাল অবস্থান করে মেঁঢ়িয় হয়ে এলেন ছম্মানি। ছম্মানিতে গ্রামের বাইরে তিনি ধ্যানস্থিত হলেন।

যেখানে তিনি ধ্যানস্থিত হলেন, সেখানে এক গোপ খানিক বাদে এসে তার বলদ দুটো ছেড়ে দিয়ে গ্রামের দিকে চলে গেল। তারপর গ্রাম হতে ফিরে এসে যখন সে সেখানে তার বলদ দুটো দেখতে পেল না তখন বর্দ্ধমানকে জিজ্ঞাসা করল, দেবার্য, আপনি কী আমার বলদ দুটো দেখেছেন ?

বর্দ্ধমান ধ্যানে ছিলেন, তাই কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না।

প্রত্যুত্তর না পাওয়ায় গোপ ক্রুদ্ধ হল ও কাষ্ঠ শলাকা এনে তাঁর কানের ভেতর প্রবেশ করিয়ে কালা সাজবার সাজা দিল। এমনভাবে প্রবেশ করাল যাতে তা কর্ণপট ভেদ করে মাথার ভেতর পরস্পর মিলিত হয় অথচ বাইরে থেকে দেখলে কিছুই যেন বোঝা না যায়।

বর্দ্ধমানের সেই সময় অসহ্য যন্ত্রণা হয়েছিল কিন্তু তবু তিনি ধ্যানে নিশ্চল রইলেন।

ধ্যান ভঙ্গের পরও সেই শলাকা নিষ্কাশন করবার কোনো প্রযত্নই তিনি করলেন না, সেইভাবে সেই অবস্থায় প্রব্রজন করে পরদিন সকালে এলেন মধ্যমা পাবায়। মধ্যমা পাবায় ভিক্ষাচর্যার জন্য তিনি শ্রেষ্ঠী সিদ্ধার্থের ঘরে গেলেন।

শ্রেষ্ঠী সেই সময় ঘরে ছিলেন। তাঁর মিত্র বৈদ্য খরকও সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বর্দ্ধমানের মুখাকৃতি দেখা মাত্রই বৈদ্যরাজ বলে উঠলেন, দেবার্যর শরীর সর্বসুলক্ষণযুক্ত হলেও সশল্য।

সেকথা শুনে সিদ্ধার্থ কোথায় শল্য রয়েছে তা দেখতে বললেন।

খরক তখন বর্দ্ধমানের সমস্ত শরীর নিরীক্ষণ করে বুঝতে পারলেন, যে তাঁর কানের ভেতর শলাকা বিদ্ধ রয়েছে।

খরক ও সিদ্ধার্থ তখন বর্দ্ধমানের সেই শলাকা নিষ্কাশনের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু বর্দ্ধমান তাঁদের নিবারিত করে গ্রামের ধারে গিয়ে আবার ধ্যানস্থিত হলেন।

কিন্তু নিবারিত হয়েও খরক ও সিদ্ধার্থ নিবৃত্ত হলেন না। তাঁকে অনুসরণ করে তিনি যেখানে ধ্যানস্থিত ছিলেন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ও তাঁকে ধরে তেলের এক দ্রোণীর মধ্যে বসিয়ে প্রথমে সর্বাঙ্গে তৈলমর্দন করলেন ও পরে সাঁড়াসী দিয়ে তাঁর দুই কান হতে দুই কাষ্ঠশলাকা টেনে বার করলেন। বর্দ্ধমান অসাধারণ ধৈর্যশীল হওয়া সত্ত্বেও সেই সময় তীব্র বেদনায় চীৎকার দিয়ে উঠলেন। শলাকা নিষ্কাশন করবার পর খরক তাঁর কানের ভেতর সংরোহণ ঔষধিতে ভরে দিলেন।

গোপের অত্যাচারের উপসর্গ দিয়ে বর্দ্ধমানের প্রব্রজ্যা জীবনের আরম্ভ হয়েছিল, গোপের অত্যাচারের উপসর্গ দিয়েই তার শেষ হল।

বর্দ্ধমানকে যে সব উপসর্গের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তার মধ্যে জঘন্য উপসর্গ ছিল কঠপুতনাকৃত শীত উপসর্গ, মধ্যম উপসর্গের মধ্যে সংগমক সৃষ্ট কালচক্র নিক্ষেপ উপসর্গ ও উৎকৃষ্ট উপসর্গের মধ্যে খরক কৃত শলাকা নিষ্কাশন-রূপ এই উপসর্গ।

বর্দ্ধমান প্রব্রজ্যা নেবার পর সাড়ে বারো বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। এই দীর্ঘকাল তাঁর অনুপম জ্ঞান, অনুপম দর্শন, অনুপম চারিত্র, অনুপম

লাঘব, অনুপম ক্ষান্তি, অনুপম মুক্তি, অনুপম প্রাপ্তি, অনুপম সত্য, অনুপম সংযম ও অনুপম ত্যাগের দ্বারা আত্মানুসন্ধান করতে করতেই ব্যয়িত হয়েছে। এখন উপস্থিত হয়েছে তাঁর কেবল-জ্ঞান লাভের চরম মুহূর্ত।

বর্দ্ধমান মধ্যমা পাবা হতে এসেছেন আবার জংভীয়গ্রামে। সেখানে জংভীয়গ্রামের বাইরে ঋজুবালুকার উত্তর তীরে শ্যামাকের ভূমিতে শালবৃক্ষের নীচে ধ্যানস্থিত হয়েছেন। বর্দ্ধমান সেদিন দু'দিনের উপবাসী ছিলেন। সেখানে সেই ধ্যানাবস্থায় দিনের চতুর্থ প্রহরে শুক্ল ধ্যানের পৃথকত্ব বিতর্ক সবিচার, একত্ব বিতর্ক অবিচার অবস্থা অতিক্রম করে জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয় ও অন্তরায় এই চার রকম ঘাতি কর্মের ক্ষয় করে কেবল-জ্ঞান ও কেবল-দর্শন লাভ করলেন।

এই চরম উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও দর্শন অনন্ত, ব্যাপক, সম্পূর্ণ নিরাবরণ ও অব্যাহত, যে জন্য এর প্রাপ্তির পর সমস্ত লোকালোকের সমস্ত পর্যায় বর্দ্ধমানের দৃষ্টি গোচর হতে লাগল। তিনি অর্হন অর্থাৎ পূজনীয়, জিন অর্থাৎ রাগদ্বেষজয়ী ও কেবলী অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী হলেন।

সেদিন বৈশাখ শুক্লা দশমী ছিল। চন্দ্রের সঙ্গে উত্তরা ফাল্গুনী নক্ষত্রের যোগ ছিল।

[ক্রমশঃ

জৈন ধর্মের পূর্ববর্তী নাম

মুনি শ্রীনথমল

ইতিহাসের দৃষ্টিতে জৈন ধর্ম মাত্র ২৮০০ বছর পুরুনো, কিন্তু সাহিত্যের দৃষ্টিতে তা কয়েক হাজার বছর পুরুনো। জৈন ধর্ম শ্রমণ পরম্পরার প্রাচীনতম রূপ। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন নামে তা অভিহিত হয়ে এসেছে। বৈদিক কাল হতে আরণ্যক কাল পর্যন্ত তা বাতরশন শ্রমণদের ধর্ম নামে অভিহিত হত। ঋগ্বেদে বাতরশন মুনিদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মুনয়োবাতরশনাঃ পিশঙ্গা বসতে মলা।[১]

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে কেতু, অরুণ ও বাতরশন ঋষিদের স্তুতি করা হয়েছে।

কেতবো অরুণাসশ্চ ঋষয়ো বাতরশনাঃ।
প্রতিষ্ঠাং শতধা হি সমাহিতাসো সহস্রধায়সম্ ॥[২]

আচার্য সায়ণের মতে কেতু, অরুণ ও বাতরশন এ তিনটী ঋষি সংঘ ছিল। তাঁরা অপ্রমত্ত ছিলেন।[৩] এঁদের উৎপত্তি প্রজাপতি হতে হয়েছিল। প্রজাপতিতে সৃষ্টির বাসনা উৎপন্ন হলে তিনি তপস্যা করলেন ও সৃষ্টির পর্যালোচনা করে নিজের শরীর প্রকম্পিত করলেন। তাঁর প্রকম্পিত শরীরের মাংস হতে তিন ঋষির উদ্ভব হল: অরুণ, কেতু ও বাতরশন। তাঁর নখ হতে বৈখানস ও চুল হতে বালখিল্য মুনির উৎপত্তি হল।[৪]

এই সৃষ্টিক্রমে সর্ব প্রথম ঋষিদের উদ্ভবের কথা বলা হয়। এ হতে এই মনে হয় যে এখানে ধার্মিক সৃষ্টির কথাই বলা হয়েছে। জৈন দৃষ্টি ভঙ্গীতে এই উদ্ভব ক্রমের ব্যাখ্যা এ ভাবে করা যায়। ভগবান ঋষভদেব যখন দীক্ষিত হন তখন তাঁর সঙ্গে আরো চার হাজার লোক দীক্ষিত হয়। ঋষভদেব দীক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ ছয় মাস অনাহারে কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দাঁড়িয়ে থাকেন।[৫] অন্য মুনিরা কিছুদিন যাবৎ তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে

থাকে কিন্তু পরিশেষে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে বল্কলধারী তাপস ও পরিব্রাজক হয়ে যায়।[৬] ঋষভদেবের পৌত্র মরীচি হতে আবার সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্রের উদ্ভব হয়।[৭] ভগবান ঋষভদেবের ধর্ম প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাই এভাবে নানা ধর্ম সংঘেরও প্রবর্তন হয়। যদিও এই সব সংঘ নায়কেরা ঋষভের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন[৮] তবু তাঁর পরম্পরার সঙ্গে কালক্রমে তাঁদের প্রত্যক্ষ কোনো সম্বন্ধ থাকে না। প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ কেবল মাত্র বাতরশন শ্রমণদের সঙ্গেই বর্তমান থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বাতরশন শ্রমণদের ধর্ম যে ভগবান ঋষভের দ্বারাই প্রবর্তিত হয়েছিল তার সমর্থন পাওয়া যায়।

ধর্মান্ দর্শয়িতুকামো বাতরশনানাং শ্রমণানামৃষীণামূর্ধ্ব-মন্থিনাং শুক্লয়া তনুবাবততার।[৯]

ভগবান ঋষভদেবের নয় পুত্রও বাতরশন মুনি হন।

নবাভবন্ মহাভাগা মুনয়ো হ্যর্থশংসিনঃ।

শ্রমণা বাতরশনা আত্মবিদ্যাবিশারদাঃ ॥[১০]

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের বিবৃতি রূপকের ভাষায়। প্রজাপতির শরীর প্রকম্পিত করা, শরীরের মাংস হতে অরুণ, কেতু ও বাতরশন ঋষিদের উৎপত্তি—এদের অর্থ মহাপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের পর্যালোচনায় এই দাঁড়ায় যে ধ্যান ভঙ্গের পর ঋষভ যখন ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন তার পূর্বেই অনেক ঋষি সংঘের উদ্ভব হয়ে গিয়েছিল। এ হতে আরো প্রমাণিত হয় যে শ্রীমদ্ভাগবতের ঋষভ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রজাপতি একই ব্যক্তি ছিলেন।

গোড়ার দিকে অরুণ ও কেতুও ঋষভের শিষ্য ছিলেন। কারণ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১।২৫।১) অরুণকে স্বায়ম্ভুব বলা হয়েছে—আরুণঃ স্বায়ম্ভুবঃ।

মহাপুরাণেও (১৮।৬০) একথা লেখা হয়েছে যে ঐ সময় স্বয়ম্ভু ঋষভ ছাড়া অন্য কাউকেও দেবতা বলে স্বীকার করা হত না—ন দেবতান্তরং তেষামাসীন্মুক্তা স্বয়ম্ভুবম্। যে আরুণ-কেতুক অগ্নিচয়ন করে তার পক্ষে জলও অহিংসনীয়।

অঘাতুকা আপঃ। য এতমগ্নিং চিনুতে।[১১]

য এবমারুণকেতুকমগ্নিং চিনুতে যশ্চৈবং বেদ তমেনং প্রত্যোদকাম্যদক-

বর্তীনি মীনাদীনি অধাতুকান্যহিংসকানি ভবন্তি। আপোপ্যঘাতুকাঃ। উদকময়ণং ন ভবেদিত্যর্থঃ।[১২]

অহিংসার এই সূক্ষ্ম ধারণায় এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে আরুণ ও কেতুক ঋষিগণ গোড়াতে ঋষভের সঙ্গে সম্বন্ধান্বিত ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জৈন ধর্মের পূর্ববর্তী ধারক রূপে বাতরশন শ্রমণেরাই অবশেষ রইলেন। তাঁরা ঊর্ধ্বমন্থীরূপে পরিচিত হলেন।[১৩] ব্রাত্য শব্দও বাতরশন শব্দের সহচারী রূপে পরিগণিত হল।

জৈন ধর্মের দ্বিতীয় মুখ্য নাম আর্হৎ। ভগবান অরিষ্টনেমির পূর্বেই এই নাম প্রচলিত হয় ও ভগবান পার্শ্বনাথের তীর্থকাল অবধি প্রচলিত থাকে। অরিষ্টনেমির তীর্থকালে প্রত্যেক-বুদ্ধদেরও অর্হৎ বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১৪]

পদ্ম ও বিষ্ণুপুরাণেও[১৫] জৈন ধর্মের স্থানে আর্হৎ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন পদ্মপুরাণে :

আর্হতং সর্বমেতচ্চ মুক্তিদ্বারমসংবৃতম্।
ধর্মাদ্ বিমুক্তেরর্হোয়ং ন তস্মাদপরঃ পরঃ॥[১৬]

জৈন ধর্মের তৃতীয় মুখ্য নাম নিগ্রন্থ। নিগ্রন্থ শব্দের ব্যবহার বৈদিক বা পৌরাণিক সাহিত্যে তেমন পাওয়া যায় না। আচার্য সায়ণ অবশ্য এক স্থানে নিগ্রন্থ সম্পর্কিত একটী বাক্য উদ্ধৃত করেছেন : কন্থা কৌপীনোত্তরাসঙ্গণ-দীনাং ত্যাগিনো যথাজাত রূপধরা নিগ্রন্থা নিষ্পরিগ্রহাঃ —ইতি সংবর্ত-শ্রুতিঃ।[১৭]

জাবালোপনিষদেও এক জায়গায় নিগ্রন্থ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। তবে ভগবান মহাবীরের তীর্থকালেই এই শব্দের বহুল ব্যবহার করা হয় এবং তৎকালীন সাহিত্যে নিগ্‌গংথং পাবয়নং—নিগ্রন্থ প্রবচনের প্রমুখ উল্লেখ দেখা যায়। বৌদ্ধ সাহিত্যে মহাবীরকে নিগ্রন্থ নাতপুত্র বলা হয়েছে ও জৈন শ্রমণদের জন্য বারবার নিগ্‌গণ্ঠং শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। অশোকের শিলা লেখেও নিগ্‌গণ্ঠং-এর উল্লেখ পাওয়া যায়—ইমে বিয়াপটা হোহন্তি নিগ্‌গংঠেসু পি মে কটে।[১৮]

সেকালীন জৈন আগমে সোচ্চাণং জিণ সাসণং[১৯], অনুত্তরং ধম্মং মিণং

জিণাণং[২০], জিণময়[২১], ণিণবময়[২২] প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ থাকলেও জৈন ধর্ম এরূপ সুস্পষ্ট প্রয়োগ দেখা যায় না। ভগবান মহাবীরের পর আঠ গণধর বা আচার্য অবধি নির্গ্রন্থ শব্দ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়।[২৩]

শ্রীসুধর্মস্বামিনোষ্টৌ সূরীন্ যাবৎ নির্গ্রন্থাঃ। সাধবোঽনগারা ইত্যাদি সামান্যার্থাভিধায়িন্যাখ্যাসীৎ।

বিশেষাবশ্যক ভাষ্যে প্রথম জৈন তীর্থ, জৈন সমুদঘাত ইত্যাদি প্রয়োগ প্রাপ্ত হওয়া যায়।[২৪]

মৎস্যপুরাণের

গত্বার্থমোহয়মাস রজিপুত্রান্ বৃহস্পতিঃ।
জিনধর্ম সমাস্থায় বেদবাহ্যং স বেদবিৎ ॥[২৫]

বা দেবী ভাগবতের

ছদ্মরূপধরং সৌম্যং বোধয়ন্তং ছলেন তান্।
জৈনধর্ম কৃতং স্বেন যজ্ঞ নিন্দাপরং তথা ॥[২৬]

জিন ধর্ম বা জৈন ধর্ম তারই প্রতিধ্বনি।

তাই মনে হয় শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই বিভেদের পর যখন হতে ভিন্ন ভিন্ন গচ্ছের স্থাপনা হয় তখন হতে নির্গ্রন্থ শব্দ গৌণ হয়ে জৈন শব্দ মুখ্যতঃ প্রযুক্ত হতে থাকে। এবং সেই সময় হতে একাল অবধি জৈন ধর্ম নাম ব্যবহৃত হয়ে এসেছে।

১ ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।১৩৬।২
২ তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১।২১।৩, ১ ২৪, ১।৩১ ৬ •
৩ ঐ ১।২১.৩, ভাষ্য।
৪ ঐ ১।২৩।২-৩
৫ মহাপুরাণ ১৮ ২
৬ ঐ ১৮।৫৫-৫৯
৭ ঐ ১৮।৬১-৬২
৮ ঐ ১৮।৬০
৯ শ্রীমদ্ভাগবত ৫ ৩ ২০
১০ ঐ ১১ ২।২০

১১ তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১।২৬।৭

১২ ঐ।

১৩ ঐ ২।৭।১

১৪ ইসিভাষিয় ১-২০

১৫ ৩।১৮।১২

১৬ ১৩।৩৫০

১৭ তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ভাষ্য ১০।৬৩

১৮ প্রাচীন ভারতীয় অভিলেখোঁকা অধ্যয়ন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯

১৯ দশ বৈকালিক ৮।২৫

২০ সূত্রকৃতাঙ্গ

২১ দশ বৈকালিক ৯।৩।১৫

২২ উত্তরাধ্যয়ন ৩৬।২৬০

২৩ পট্টাবলি সমুচ্চয়, তপাগচ্ছ পট্টাবলি, পৃঃ ৪৫

২৪ ১০৪৩ জেণং তিথং। ১০৪৫-১০৪৬ তিথং...জইণং। ৩৮৩ জইণ সমুগ্‌ধায়গঈএ

২৫ মৎস্যপুরাণ ২৮।৪৭

২৬ দেবী ভাগবত ৪।১৩।৫৪

জৈন মতে জীবভেদ

পূরণচাঁদ নাহার

জৈনধর্ম অতি প্রাচীন ধর্ম। ইহার দর্শন বিচার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ। জৈনদিগের দর্শন, সাহিত্য, ন্যায়, অলঙ্কার আদির ঔৎকর্ষ ও সর্বাঙ্গীনতার প্রতি বহু পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কর্মই দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং জীবই কর্মের ভোক্তা। জৈন সুধীগণ জীবতত্ত্বের কিরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। অধুনা বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপ উদ্ভিদাদিতে চেতনা (sensation etc.) ও খনিজ ধাতুতে রোগাদির (diseases etc.) অস্তিত্ব ও ব্যাপকতা দর্শাইয়াছেন, জৈন মনীষীগণ খৃষ্ট শতাব্দীর বহুকাল পূর্বে তদ্রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কৌতূহলী পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছি। জৈন কেবলীগণ জ্ঞানমার্গে কতদূর উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা অনায়াসে উপলব্ধি হইবে, এই জন্য জীবভেদের একটি নাম-লতা (chart) অপর পৃষ্ঠে প্রদত্ত হইল।

জৈনমতে 'জীবন্তি কালত্রয়েঽপি প্রাণান্ ধারয়ন্তি ইতি জীবাঃ'। জীববৃন্দ দুই প্রকার : (১) সংসারী ও (২) সিদ্ধাত্মা।

প্রথমতঃ, সংসারী অর্থাৎ চতুর্গতিরূপ সংসারে যাহারা অবস্থিতি করিতেছে তাহাদের স্থূল বিভাগ দুইটি : (ক) স্থাবর ও (খ) ত্রস্ (গতিবিশিষ্ট)। স্থাবর জীবের কেবলমাত্র একটি স্পর্শেন্দ্রিয় আছে। ইহারা পাঁচপ্রকার :

(১ক) পৃথ্বীকায়—যথা স্ফটিক, মুক্তা, চন্দ্রকান্তাদি মণি (সমুদ্রজ), বজ্রকর্কেতনাদি রত্ন (খনিজ), প্রবাল, হিঙ্গুল, হরিতাল, মনঃশিলা, পারদ, কনকাদি সপ্তধাতু, খড়িমাটি, রক্ত মৃত্তিকা, শ্বেত মৃত্তিকা, অভ্র, ক্ষার মৃত্তিকা, সর্বপ্রকার প্রস্তর, সৈন্ধবাদি লবণ ইত্যাদি।

(২ক) অপ্ কায়—যথা ভূমিগর্ভস্থ জল (কূপোদকাদি), বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, হিম, তুষার, শিশির, কুজ্ঝটিকা, সমুদ্রবারি ইত্যাদি।

(১) সংসারী
(২) সিদ্ধগামী
তীর্থসিদ্ধ
অতীর্থসিদ্ধ
(ক) স্থাবর
[একেন্দ্রিয়]
(স্পর্শ)
(খ)
পৃথ্বীকায়
(১ ক)
অপ্ কায়
(২ ক)
অগ্নিকায়
(৩ ক)
বায়ুকায়
(৪ ক)
উদ্ভিদ
(৫ ক)
সাধারণ
(নিগোদ)
প্রত্যেক
দ্বীন্দ্রিয়
(স্পর্শ ও রসনা)
(১ খ)
ত্রীন্দ্রিয়
(স্পর্শ, রসনা ও ঘ্রাণ)
(২ খ)
চতুরিন্দ্রিয়
(স্পর্শ, রসনা, ঘ্রাণ ও নেত্র)
(৩ খ)
পঞ্চেন্দ্রিয়
(স্পর্শ, রসনা, ঘ্রাণ, নেত্র ও শ্রোত্র)
(৪ খ)
নারকীয়
তির্যক
মনুষ্য
দেবতা
(১) রত্নপ্রভাবাসী
(২) শর্করাপ্রভাবাসী
(৩) বালুকাপ্রভাবাসী
(৪) পঙ্কপ্রভাবাসী
(৫) ধূমপ্রভাবাসী
জলচর
স্থলচর
খেচর
কর্মভূমিজ
অকর্মভূমিজ
অন্তর্দ্বীপজ
ভুবনপতি
(১০)
ব্যন্তর
(৮)
জ্যোতিষ্ক
(৫)
বৈমানিক
(২)
চতুষ্পদ
উরঃপরিসর্প
ভুজপরিসর্প
রোমজ
চর্মজ
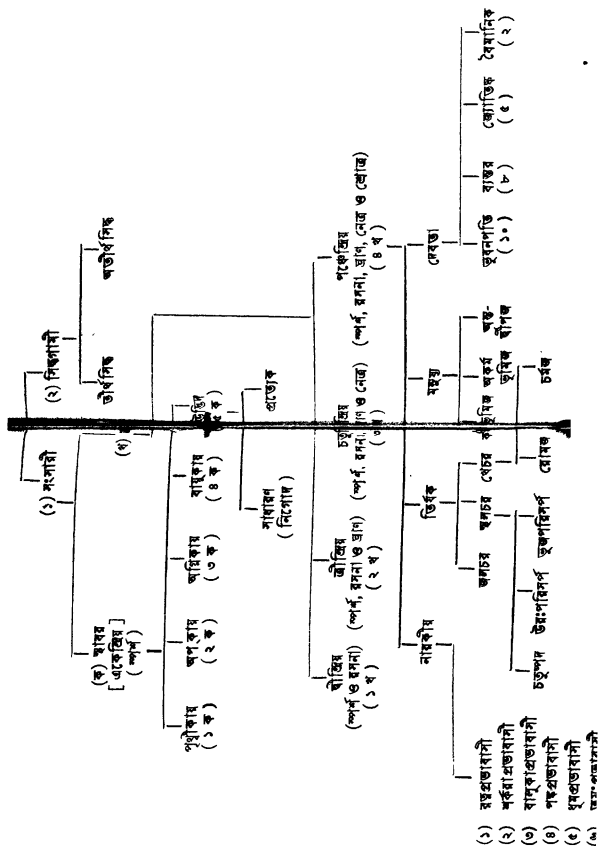
(৩ক) অগ্নিকায়—যথা অঙ্গার, উল্কা, বিদ্যুৎ, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ইত্যাদি।

(৪ক) বায়ুকায়—যথা ঝঞ্ঝাবাত, গুঞ্জবাত, উৎকলিকাবাত, মণ্ডলীবাত, শুদ্ধবাত, ঘনবাত, তনুবাত[১] ইত্যাদি।

(৫ক) উদ্ভিদকায় দ্বিবিধ: সাধারণ ও প্রত্যেক।

যে উদ্ভিদে বহুবিধ (অনন্ত) উদ্ভিদকায় জীবাণু একই শরীরে থাকে তাহারা সাধারণ উদ্ভিদ বা নিগোদ,—যথা কন্দ, অঙ্কুর, কিশলয়, শৈবাল, ব্যাংছাতি, আদ্রা, হরিদ্রা, সর্বপ্রকার কোমল ফল, গুগ্‌গুল, গুলঞ্চ প্রভৃতি ছিন্নরুহ (ছেদন করিবার পরও যাহা পুনরায় জন্মে) যাহাদের শিরা, সন্ধি ও পর্ব গুপ্ত থাকে ও যাহারা সমভঙ্গ (পানের ন্যায় যাহা ছিঁড়িলে অদন্তুর ভাবে ভগ্ন হয়) ও অহীরক (ছেদন করিলে যাহার মধ্য হইতে তন্তু পাওয়া যায় না) ইত্যাদি।

যে উদ্ভিদের এক শরীরে একটি মাত্র জীব থাকে তাহা প্রত্যেক উদ্ভিদ নামে বিশেষিত হইয়াছে। যথা ফল, ফুল, ছাল, কাষ্ঠ, মূল, পত্র ইত্যাদি।

প্রত্যেক উদ্ভিদ ব্যতীত অন্যান্য সর্বপ্রকার স্থাবর জীব সূক্ষ্ম ও বাদর হইয়া থাকে।

সংসারী জীবের দ্বিতীয় প্রধান বিভাগ ত্রস্ জীব চারি প্রকার:

(১খ) দ্বীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইহাদের স্পর্শ ও রসনাজ্ঞান আছে। যথা শঙ্খ, কপর্দক, ক্রিমি, জলৌকা, কেঁচো ইত্যাদি।

(২খ) ত্রীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইহাদের স্পর্শ, রসনা ও ঘ্রাণ এই তিনটি ইন্দ্রিয় আছে। যথা কর্ণকীট, উকুন, পিপীলিকা, মাকড়সা, আরসোলা ইত্যাদি।

(৩খ) চতুরিন্দ্রিয় অর্থাৎ ইহাদের স্পর্শ, রসনা, ঘ্রাণ ও নেত্র এই চারিটি ইন্দ্রিয় আছে। যথা বৃশ্চিক, ভ্রমর, পতঙ্গপাল, মশক, মক্ষিকা ইত্যাদি।

(৪খ) পঞ্চেন্দ্রিয় অর্থাৎ ইহাদের স্পর্শ, রসনা, ঘ্রাণ, নেত্র ও শ্রোত্র এই চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে।

(১) নারকীয় জীবেরা তাহাদের বাসস্থান ভেদে সাত প্রকার—যথা রত্নপ্রভাবাসী, শর্করাপ্রভাবাসী, বালুকাপ্রভাবাসী, পঙ্কপ্রভাবাসী, ধূমপ্রভাবাসী, তমঃপ্রভাবাসী, তমস্তমঃপ্রভাবাসী।

১ জৈন মতে রত্নপ্রভাদিভূমি ও সৌধর্মাদি বিমান লোকের ঘনবাত ও তনুবাত-এর ওপর আধারভূত আছে। ঘনবাত ঘৃতসদৃশ গাঢ় ও তনুবাত তাপিত ঘৃতবৎ তরল।

(২) তির্যক জীব ত্রিবিধ—জলচর (মৎস্য, কচ্ছপ, মকর, হাঙ্গর ইত্যাদি), স্থলচর ও খেচর।

স্থলচর তিনপ্রকার—চতুষ্পদ, উরঃপরিসর্প ও ভুজ-পরিসর্প।

চতুষ্পদ—যথা গো, অশ্ব, মহিষাদি।

উরঃপরিসর্প—যথা সর্প ইত্যাদি।

ভুজপরিসর্প—যথা নকুল ইত্যাদি।

খেচর—ইহারা দুইপ্রকার : রোমজ ও চর্মজ।

রোমজ—যথা হংস, সারস ইত্যাদি। চর্মজ—যথা চর্মচটিক ইত্যাদি।

যাবতীয় জলচর স্থলচর ও খেচর জীবগণ সমূর্চ্ছিম ও গর্ভজ এই দুই ভাগে বিভক্ত। মাতৃপিতৃনিরপেক্ষতায় যাহাদের উৎপত্তি তাহারা সমূর্চ্ছিম। গর্ভে যাহারা জন্মে তাহারা গর্ভজ।

(৩) মনুষ্যের বিভাগও বাসস্থান ভেদে তিন প্রকার—(১) কর্মভূমিবাসী, (২) অকর্মভূমিবাসী, (৩) অন্তর্দ্বীপবাসী।

(১) কর্মভূমি অর্থাৎ কৃষিবাণিজ্যাদি কর্মপ্রধান ভূমি—পঞ্চভরত, পঞ্চ ঐরাবত ও পঞ্চবিদেহ এই পঞ্চদশ প্রদেশকে কর্মভূমি বলে।

(২) অকর্মভূমি অর্থাৎ হৈমবৎ, ঐরাবত, হরিবর্ষ, রম্যকবর্ষ, দেবকুরু ও উত্তরকুরু এই ষট্ অকর্মভূমি পঞ্চ মেরুর প্রত্যেক মেরুতে অবস্থিত আছে। তজ্জন্য মেরুভেদে অকর্মভূমির মোট সংখ্যা ৩০।

(৩) অন্তর্দ্বীপের সংখ্যা ৫৬।

দেবগণ প্রধানতঃ চারিপ্রকার—যথা (১) ভুবনপতি, (২) ব্যন্তর, (৩) জ্যোতিষ্ক ও (৪) বৈমানিক।

ভুবনপতি দেবতা—অসুরকুমার, নাগকুমার, সুপর্ণকুমার, বিদ্যুৎকুমার, অগ্নিকুমার, উদধিকুমার, দিগ্কুমার, বায়ুকুমার ও স্তনিতকুমার এই দশ প্রকার।

ব্যন্তর দেবতা—পিশাচ, ভূত, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, কিংপুরুষ, মহোরগ ও গন্ধর্ব এই আট প্রকার।

জ্যোতিষ্ক দেবতা—চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারা। ইহারা মনুষ্য-ক্ষেত্রে 'চর তদ্বহিঃ স্থির'।

বৈমানিক দেবতা দুই প্রকার—যথা কল্পোৎপন্ন ও কল্পাতীত।

সৌধর্ম, ঈশান, সনৎকুমার, মাহেন্দ্র, ব্রহ্ম, লান্তক, শুক্র, সহস্র, আনত, প্রাণত, আরণ ও অচ্ছ্যুত এই দ্বাদশ কল্পবাসী দেবতারা কল্পোৎপন্ন।

সুদর্শন, সপ্রবুদ্ধ, মনোরম, সর্বতোভদ্র, বিশাল, সমনঃ, সোমনসঃ, প্রিয়ঙ্কর, নন্দীকর, এই নয় গ্রৈবেয়ক বিমানবাসী ও বিজয়, বৈজয়ন্ত, অপরাজিত, সর্বার্থসিদ্ধ এই পঞ্চানুত্তর বিমানবাসী দেবতারা কল্পাতীত বলিয়া কথিত হইয়াছে।

জীবের দ্বিতীয় বিভাগ সিদ্ধগামী জীব তীর্থ সিদ্ধ ও অতীর্থসিদ্ধ ভেদে পঞ্চদশ প্রকার জৈন সিদ্ধান্তে বর্ণিত আছে। তাহাদের নাম: যথা (১) জিনসিদ্ধ, (২) অজিনসিদ্ধ, (৩) তীর্থসিদ্ধ, (৪) অতীর্থসিদ্ধ, (৫) গৃহস্থলিঙ্গসিদ্ধ, (৬) অন্যলিঙ্গসিদ্ধ, (৭) স্বলিঙ্গসিদ্ধ, (৮) স্ত্রীলিঙ্গসিদ্ধ, (৯) পুরুষলিঙ্গ সিদ্ধ, (১০) নপুংসকলিঙ্গসিদ্ধ, (১১) প্রত্যেকবুদ্ধসিদ্ধ, (১২) স্বয়ংবুদ্ধসিদ্ধ, (১৩) বুদ্ধপোষিতসিদ্ধ, (১৪) একসিদ্ধ ও (১৫) অনেকসিদ্ধ।

প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২১ হইতে সংকলিত।

জৈন ধর্ম ও বাঙ্‌লা সাহিত্য

বাঙ্‌লা দেশের সঙ্গে জৈনধর্মের সম্পর্ক যখন অনেক প্রাচীন তখন বাঙ্‌লা সাহিত্যে জৈনধর্মের সুস্পষ্ট কোনো প্রভাব নেই কেন, সে প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে। কিন্তু সত্যিই কি কোনো প্রভাব নেই? অবশ্য অপভ্রংশের কাল কাটিয়ে যে সময় হতে বাঙ্‌লা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হতে আরম্ভ হয় সে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতক। সেই সময় পৌরাণিক ভক্তিবাদের প্রাধান্য। তাই বাঙ্‌লা সাহিত্যেও রাধাকৃষ্ণের গীতি কবিতার প্রাবল্য। অবশ্য তার পূর্বে চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। চর্যাচর্য বিনিশ্চয় রাঢ় অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীতি কবিতার পাশে পাশে বাঙ্‌লাদেশে সেদিন আর এক ধরণের সাহিত্যও রচিত হয়েছিল যাদের আমরা শিবায়ন ও মঙ্গল কাব্য বলে অভিহিত করি। মঙ্গল কাব্যের মধ্যে আবার ধর্মমঙ্গল। এই ধর্ম কে ছিলেন? ইনি কি জৈন তীর্থঙ্কর ধর্মনাথ স্বামী? অবশ্য ধর্মপূজা আজ যে ভাবে প্রচলিত তাতে জৈন ধর্মের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন একটু কষ্টকর হয় বটে তবে ধর্মপূজার বিশুদ্ধ রীতি যে আজ রক্ষিত হয় নি সেকথা সকলেই স্বীকার করেছেন। তীর্থঙ্কর মূর্তির সামনে মানভূম অঞ্চলে অনেক জায়গায় আজ পশুবলি দেওয়া হয়। তাই ধর্মপূজায় কোনো এক সময়ে পশুবলি প্রবেশ করে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি? তবে ধর্মপূজার প্রচলন জৈনধর্ম হতে যে উদ্ভূত হয়েছিল সেকথা মনে করবার অনেক কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ, এই ধর্মপূজা বাঙ্‌লা দেশের রাঢ় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। বাঙ্‌লাদেশের এই অঞ্চলেই জৈনধর্ম ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছিল। অনেকে অবশ্য বৌদ্ধধর্মের 'ত্রিশরণ' মন্ত্রের ধর্মকেই এই ধর্ম বলে মনে করেন ও ধর্ম পূজাই বাঙ্‌লা দেশে বৌদ্ধ ধর্মের শেষ নিদর্শন বলে থাকেন। কিন্তু ত্রিশরণ

মন্ত্রের ধর্ম কি কেবলমাত্র বৌদ্ধদের? কেবলীপন্নতং ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, কেবলীপন্নতং ধর্ম্মং মঙ্গলং—এ মন্ত্র জৈনরাও উচ্চারণ করেন। বিশেষ করে ধর্ম্মং মঙ্গলং লক্ষ্য করবার। মনে হয় এ হতে ধর্ম্মমঙ্গল ও মঙ্গল কথার উদ্ভব হয়ে থাকবে। তাছাড়া ধর্ম মঙ্গলের ধর্ম যদি বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিশরণ মন্ত্রের ধর্মই হত তবে তা বাঙ্‌লাদেশের রাঢ় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ না থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে যেখানে এখনো বহু বৌদ্ধ বাস করেন সেখানে প্রচলিত থাকত।

দ্বিতীয়তঃ,

শূন্যমূর্ত্তি ধ্যান করি।
সাকার মূর্ত্তি ভজি॥

এর সঙ্গে জৈন উপাসনা পদ্ধতির মিল আছে। জৈনরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না কিন্তু তীর্থঙ্করের সাকার মূর্তির উপাসনা করেন। মূর্তি উপাসনা জৈনদের মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হতেই প্রচলিত। কেবলমাত্র প্রাচীন গ্রন্থাদির সমর্থনেই নয়, পুরাতত্ত্বের আবিষ্কারেও একথা আজ অবিসম্বাদিত সত্যরূপে স্বীকৃত হয়েছে। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত কায়োৎসর্গস্থিত মূর্তিগুলি যে জৈন মূর্তি সেকথা ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করতে সুরু করেছেন।

তৃতীয়তঃ, মানসিক শোধের জন্য ধর্মের যে আড়ম্বরপূর্ণ পূজা হয় তা অক্ষয় তৃতীয়ায় আরম্ভ হয়। প্রথমেই মানসিক শোধ কথাটী লক্ষ্য করবার। মানসিক শোধ জৈনদের ত্রিবিধ 'কায়িক, বাচিক ও মানসিক' কথাকে স্মরণ করায়। দ্বিতীয়, অক্ষয় তৃতীয়া জৈনদের একটী বিশেষ পর্বদিন। এই দিনটীতে ভগবান আদিনাথ বা ঋষভদেব বার্ষিক তপস্যার পর পারণ করেন। সেইজন্য এই তিথিতে আজো বহু জৈন বার্ষিক তপস্যার (একান্তরী উপবাস) পর পারণ করেন ও এই উপলক্ষে শত্রুঞ্জয়ে (পালিতানা) বিরাট উৎসব ও মেলা হয়। প্রসঙ্গতঃ, আদিনাথ বৃষভলাঞ্ছন। (সিন্ধু সভ্যতার বহুল প্রচারিত বৃষ আদিনাথের লাঞ্ছন কিনা সেকথা বিবেচ্য।) এই লাঞ্ছনই মনে হয় পরবর্তীকালে বাহনরূপে রূপান্তরিত হয় ও আদিনাথ শিব রূপে সর্বত্র পূজিত হন। একথা মনে করবার কারণ এই যে আদিনাথের নির্বাণভূমি অষ্টাপদ বা কৈলাস। এই কৈলাসে আদিনাথের পুত্র ভরত (বিষ্ণু পুরাণের মতে যাঁর

নামানুসারে আসমুদ্র-হিমাচল এই ভূখণ্ডের নাম হয়েছে ভারতবর্ষ) পিতার নির্বাণ লাভের পর রত্নময় মন্দির নির্মাণ করান ও আরো পরবর্তীকালে তাঁরই বংশধর সগর পুত্রেরা তার চতুর্দিকে খাল খনন করে গঙ্গা প্রবাহিত করেন। সে যা হোক, বাঙ্লাদেশের শিবায়ণ কাব্যের শিবের সঙ্গে এই আদিনাথের অনেক মিল দেখা যায়। শিবায়ণ কাব্যের শিব যেমন যোগী তেমনি ভোগীও। আদিনাথও তাই ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি যেমন মানুষকে কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষণাদি শিক্ষা দেন, পরবর্তী জীবনে তেমনি তিনি মুক্তিমার্গের উপদেশ দেন। শিবায়ণ কাব্যে কৃষি কর্মনিরত শিবের যে চিত্র পাই তা তাই মনে হয় জৈন আদিনাথের আদর্শের প্রভাব জাত।

চতুর্থতঃ, চরণপূজা জৈনদের একটা বিশেষত্ব। জৈনদের বহু মন্দির রয়েছে যেখানে কোন মূর্তি নেই, রয়েছে শুধু তীর্থঙ্কর বা আচার্যদের চরণ। ধর্ম পূজাতেও এই চরণ পূজাই ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

পঞ্চমতঃ, ধর্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে। অহিংসা সম্পর্কে বৌদ্ধদের চাইতেও জৈনরাই বেশী সোচ্চার। তাছাড়া ভগবান মহাবীর মধ্যমাপাবায় যজ্ঞে সমাগত এগার জন ব্রাহ্মণকে প্রতিবোধদানে জৈন ধর্মে দীক্ষিত করেন। এই এগারো জন ব্রাহ্মণই পরবর্তীকালে ভগবান মহাবীরের প্রধান শিষ্য বা গণধর রূপে পরিচিত হন। ধর্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করার মধ্যে মনে হয় এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত থেকে থাকবে। এই ধারণা আরো বদ্ধমূল হয় যখন আমরা দেখি যে ধর্মপূজার আদিস্থান বল্লুকা জৈনশাস্ত্রোক্ত ঋজু বালুকা যার তীরে ভগবান মহাবীর কেবল-জ্ঞান লাভ করেন। বল্লুকা বর্দ্ধমানের নিকটস্থ দামোদর হতে উদ্ভূত। শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের মতে বর্তমান বর্দ্ধমানই প্রাচীন অস্থিক গ্রাম যেখানে মহাবীর শূলপাণি যক্ষকে শান্ত করেন এবং সেই হতে তাঁর নামে অস্থিক গ্রামের নাম হয় বর্দ্ধমানপুর।

ধর্মপূজার আর একটা বিশিষ্ট স্থান চম্পানদীর ঘাট। মহাবীর তাঁর প্রব্রজ্যা জীবনের শেষ চাতুর্মাস্য চম্পাতেই অতিবাহিত করেন। ধর্মমঙ্গলের রঞ্জাবতী 'শালে ভর দিয়া' পুত্র কামনায় ধর্মপূজা করেছিলেন। আমরা জানি শাল বৃক্ষের নিচেই ভগবান মহাবীর কেবল জ্ঞান-লাভ করেছিলেন এবং শাল বৃক্ষই তাঁর চৈত্য বৃক্ষ ছিল।

মনসা মঙ্গলের মনসা বা পদ্মাবতী কে ছিলেন তা অনুসন্ধানের জন্য আমরা বেদপুরাণ মহাভারত সমস্তই ঘাঁটা-ঘাঁটি করেছি এবং বৌদ্ধ জাঙ্গুলী হতে মহীশূরের মুদমা এমনকি কানাড়ী মনে মঞ্চম্মা পর্যন্ত ধাওয়া করেছি কিন্তু কোনো সময়েই জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের শাসনদেবী বা শক্তি পদ্মাবতীর ওপর আমাদের দৃষ্টি পতিত হয়নি। অথচ এই পদ্মাবতী সর্পদেবী, যাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—তস্মিন্নেব তীর্থে সমুৎপন্নাং পদ্মাবতীং দেবীং কনকবর্ণাং কুর্কুট-বাহনাং চতুর্ভুজাং পদ্মপাশস্থিতদক্ষিণকরাং ফলাং কুশধিষ্ঠিত বামকরাং চেতি। প্রবচন সারোদ্ধার, ত্রিষষ্টি-শলাকা-পুরুষ-চরিত্র ও আচার দিনকরের মতে কুর্কুট বাহনাং অর্থ কুর্কুটজাতীয় সর্প যাঁর বাহন। পদ্মাবতীর বাহন যেমন সর্প, তেমনি এই সর্প তাঁর মাথায় ছত্র ধারণ করে থাকে। পার্শ্বনাথও সর্পছত্র। পার্শ্বনাথ সম্বন্ধে একটী কাহিনী প্রচলিত আছে যে পঞ্চাগ্নিতপ নিরত কমঠ সাধুর কাষ্ঠাভ্যন্তরস্থ যুগল সর্পের তিনি প্রাণ রক্ষা করেন। লেঃ কর্ণেল ডাল্টন জৈন চতুর্ভুজা দেবীমূর্তি ষষ্ঠীরূপে পূজিত হচ্ছেন তার উদাহরণ দিয়েছেন। তাই জৈন পদ্মাবতী পদ্মাপুরাণের পদ্মা বা মনসা রূপে পূজিত হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? শব্দকল্পদ্রুমে কশ্যপেন মনসা সৃষ্টা দেবী 'মনসা দেবী' অলুক সমাস নিষ্পন্ন করা হয়েছে। কশ্যপ তীর্থঙ্কর গোত্র। সুতরাং তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মানসোদ্ভূত শক্তি পদ্মাবতীর মনসারূপে রূপান্তরিত হওয়া খুবই সম্ভব। এবং আরো একটী লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে প্রাচীন যে সমস্ত মনসা মূর্তি পাওয়া গেছে তার সমস্তই বীরভূম অঞ্চল হতে।

তাছাড়া বেহুলা কাহিনীর উদ্ভবের মূলেও রয়েছে হয়ত কোনো প্রাচীন জৈন কাহিনী। বেহুলার স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ মনোভাব ও স্বামীকে নিয়ে মান্দাসে করে যাত্রায় অনেকে দ্রাবিড় গন্ধ পেয়েছেন। কারণ এই স্বাধীন মনোভাব বাঙালী সমাজে সুলভ নয়। এই প্রসঙ্গে জৈন সাহিত্যের একটী প্রাচীন কাহিনী শ্রীপাল চরিত্রের কথা মনে পড়ে। সেখানেও দেখি মূল চরিত্র ময়না কুষ্ঠরোগাক্রান্ত স্বামীকে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ও নিজের ভক্তি ও আত্মত্যাগের দ্বারা স্বামীকে সুন্দর স্বাস্থ্যে ফিরিয়ে আনছেন। তাঁর স্বচ্ছন্দতা ও নির্ভীকতা বেহুলার মতো। তাছাড়া সেই কাহিনীর স্থান অঙ্গদেশের চম্পানগরী। বেহুলার কাহিনীর স্থানও চম্পকনগর। জৈনধর্মের

প্রসার বণিক সম্প্রদায়েই বেশী দেখা যায়। মনসা মঙ্গলে ত বটেই মঙ্গল কাব্যেও বণিক সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে মনসা মঙ্গল সম্পর্কে বলেছেন যে বিহারই (অঙ্গদেশ) এই গীতির আদিস্থান।

চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীও কি জৈনদের ষোল মহাবিদ্যার চণ্ডী? না আদিদেব বা আদিনাথের শক্তি বা শাসনদেবী চক্রেশ্বরী? মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গলে দেখা যায় যে আদিদেব বা ধর্মের শক্তিস্বরূপিনী আদ্যাই চণ্ডীতে পরিণত হয়েছেন। আদিনাথ, আদিদেব বা ধর্মের নাম শুনলেই আমরা তাকে বৌদ্ধ বলে মনে করে নেই, ভুলে যাই যে আদিনাথ বা আদিদেব ছিলেন জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর। তাঁকে আদিনাথ বা আদিদেব বলবার কারণ এই যে এই অবসর্পিণীতে তিনিই ছিলেন ধর্মের প্রথম প্রবর্তক।

চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ের কথা আগেই বলেছি এবং তার ভাষা রাঢ় অঞ্চলের সেকথাও বলা হয়েছে। চর্যাচর্য বিনিশ্চয় যে সমস্ত সিদ্ধাচার্যদের রচিত লুইপাদ তাঁদের মধ্যে আদি সিদ্ধ। এই লুইপাদকে অনেকে মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাঙলাদেশে মীননাথ হতে যে নাথ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে তাঁরা অজিতনাথ, সম্ভবনাথ, শীতলনাথ, নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ প্রমুখের শিষ্য সম্প্রদায়। স্বাধ্যায় নিষ্ঠার অভাবে শিথিলাচার হয়ে ক্রমশঃ তাঁরা হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে গেছেন। মনে হয় এর মধ্যে অনেকখানি সত্য রয়েছে। কারণ, জৈন ধর্মের সঙ্গে কিছু কিছু সাদৃশ্যই নয়, নাথ সাহিত্যে প্রচলিত প্রাচীন কাহিনী হতে আরো এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে আদিনাথই এই মার্গের প্রথম উপদেষ্টা এবং মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ তাঁর কৃপাতেই নাথ ধর্ম প্রচার করেন। নেপালে পাওয়া একটা পুঁথিতে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস বিষয়ক রচনায় দেখা যায়:

শ্রীআদিনাথ কহিয়ে উপদেশ।

এই আদিনাথ যে জৈন প্রথম তীর্থঙ্কর বৃষভলাঞ্ছন আদিনাথ তাতে সন্দেহ নেই। এ হতে আমরা কেবলমাত্র চর্যাচর্য বিনিশ্চয়েই নয়, পরবর্তী শৈব নাথ তন্ত্রেও জৈন প্রভাবের মূলসূত্র আবিষ্কার করতে পারি।

অনুবাদ শাখায়[১] বাংলা রামায়ণেও জৈন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কৃত্তিবাসীয় :

পঞ্চ মাস আছে গর্ভ সীতার উদরে।
আয়ে আয়ে এক ঠাঁই বসেছেন ঘরে॥
মাথায় সীতার কেহ দিতেছে চিরুণী।
সীতারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রমণী॥
সীতারে চাহিয়া বলে যত নারীগণ।
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত কেমন রাবণ॥

সীতা বলে সে ছায়ে না দেখি কোনো কালে।
ছায়ামাত্র দেখিয়াছি সাগরের জলে॥
তথাপি জিজ্ঞাসা করে যত নারীগণ।
জলেতে দেখেছ ছায়া কেমন রাবণ॥

হাতে খড়ি ধরে সীতা দৈবের নির্বন্ধ।
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত লিখে দশ স্কন্ধ॥
গর্ভবতী নারী হাই উঠে সর্বক্ষণ।
সদাই অলস সীতা ভূমিতে শয়ন॥
সুখের সাগরে দুঃখ ঘটায় বিধাতা।
নেতের অঞ্চল পাতি শুইলেন সীতা॥
ভাবিতে ভাবিতে রাম যান অন্তঃপুরী।
রামে দেখি বাহির হইল যত নারী॥
সীতার পাশে দেখি রাম লিখিত রাবণ।
সত্য অপযশ মম করে সর্বজন॥

এ সম্পর্কে ডাঃ দিনেশচন্দ্র সেনের অভিমত এখানে উদ্ধৃত করছি : "মহর্ষি বাল্মীকিকৃত রামায়ণের সঙ্গে যে উত্তরাকাণ্ড জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যাহা এ পর্যন্ত তাঁহারই নামে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে সীতার প্রতি রামের কোনো হীন সন্দেহ স্থান পায় নাই। 'তিনি জগৎ মধ্যে শুদ্ধা, তিনি আমার

প্রতি প্রীতা হউন' রাম এইরূপে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু সীতা বনবাস বাঙ্‌লা রামায়ণে যে সন্দেহের ভিত্তির ওপর দাঁড়াইয়া আছে, তাহা জৈন রামায়ণ অবলম্বনে। ...এককালে বাঙ্‌লা দেশে জৈন প্রভাব খুব বেশী ছিল। তাঁহারা রাম ও রাবণ সংক্রান্ত অনেক প্রাচীন আখ্যায়িকা এ দেশে লইয়া আসিয়াছিলেন। জৈন রামায়ণে সীতার সতিনী তাঁহাকে রাবণের আকৃতি অঙ্কণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল।" এই ধারারই অনুসরণ করে চন্দ্রবতী রামায়ণের কুকুয়াও—

আবার সীতারে কয় রাবণ আঁকিতে ॥
এড়াতে না পারি সীতা গো পাথার ওপর ।
আঁকিলেন দশমুণ্ড গো রাজালঙ্কেশ্বর ॥
শ্রমেতে কাতর সীতা গো নিদ্রায় ঢলিল ।
কুকুয়া তালের পাখা গো বুকে তুলে দিল ॥

কুকুয়া কৈকয়ী কন্যা, সীতার ননদ। কুকুয়া তখন রামকে ডেকে নিয়ে এসে দেখাল—দেখ, তোমার সাধ্বী সীতা এখনও রাবণকে ভুলতে পারেনি, তার ছবি এঁকে বুকে লুকিয়ে রেখেছে।

রামের বহুপত্নীত্বও জৈন ধারারই অনুবর্তন।

বদ্রী বিশাল কী ভগবান ঋষভ দেব?

শ্রীতাজমল বোথরা

বদ্রী বিশালের মূর্তিই সম্ভবতঃ এমন একটী নারায়ণ মূর্তি যাকে ধ্যান মুদ্রায় দেখানো হয়েছে। এ ধরণের হাজারো তীর্থংকর মূর্তি ভারতবর্ষের সব খানে পাওয়া যাবে। তাছাড়া বদ্রীনাথের মূর্তি খুব পুরুণো, ভাঙা ও যার মাত্র দুটী হাত রয়েছে এবং সে হাত কোলের ওপর ধ্যান মুদ্রায় একটীর ওপর আর একটী রাখা। রাওয়াল, যিনি বদ্রীবিশালের পূজোর একমাত্র অধিকারী, তিনি একাহার করেন এবং সেও দিনের বেলায়, রাত্রে নয় ও আলু জাতীয় উদ্ভিদ বা মাটীর নীচে হয় তা খান না। জৈন উপাসকের সংযত জীবনের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আশ্চর্য রকমের এবং এ হতে এ ধারণাই দৃঢ় হয় যে মূর্তিটি কোনো জৈন তীর্থংকরের। নির্বাণ অভিষেকের সময় আবার যে মন্ত্র পাঠ করা হয় সে মন্ত্রও হিন্দু মন্ত্র হতে ভিন্ন।

বহু দিন আগে শ্রীসহজানন্দঘনজী মহারাজ যখন একবার বদ্রীনাথ যান তখন তিনি মূর্তি দেখে এই অভিমত ব্যক্ত করে ছিলেন যে মূর্তিটি তীর্থংকরের। জৈন সাধু শ্রীবিদ্যানন্দজী মহারাজও মূর্তিটি যে নগ্ন ও ভগবান ঋষভ দেবের সেকথা বলেন। তীর্থংকরদের মধ্যে একমাত্র ঋষভদেবের মাথায় জটা দেখানো হয় ও তিনি হিমালয়ে কৈলাস পর্বতে নির্বাণ লাভ করেন। মূর্তির বসা অবস্থায় ধ্যান মুদ্রা, হাতের ওপর হাত রাখা, মাথায় জটা, নগ্নতা ও উপাসনা বিধি ইত্যাদি মূর্তিটি যে জৈন তীর্থংকরের সে দিকেই নির্দেশ করে।

এই অভিমত যে কেবল মাত্র জৈন সাধু বা গৃহীদের তা নয়, হিন্দু পর্যটকরাও বিষয়টীকে এই ভাবে উপস্থাপিত করেছেন যার তাৎপর্য হল মূর্তিটি ভক্তের অভিলাষানুযায়ী তার কাছে সেই রূপে পরিদৃষ্ট হয়। শেঠ গোবিন্দ দাস তাঁর 'উত্তরাখণ্ড-কী যাত্রা'য় লিখেছেন:

"বদ্রীনাথ মন্দিরের তিনটী ভাগ—অন্তবর্তী গৃহ গর্ভগৃহ। সেখানে অন্যান্য মূর্তিসহ বদ্রীনাথের মূর্তি রক্ষিত। মূর্তিটি ১৮ ইঞ্চি লম্বা এবং কাল পাথরের, পৃষ্ঠফলকসহ একই সঙ্গে ক্ষোদিত।

"বদ্রী বিশালের এই মূর্তি পদ্মাসনে বসা ধ্যান মূর্তি। ধ্যানাবস্থায় কোলের ওপর যেমন হাতের ওপর হাত রাখা থাকে ঠিক সেই ভাবে।

"বৌদ্ধরা এটিকে বুদ্ধ মূর্তি বলে দাবী করেন। জৈনরা পার্শ্ব বা ঋষভনাথের মূর্তি বলে অভিহিত করেন। তবে সাধারণে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে ভক্তের অভিলাষানুযায়ী তাঁর নিকট তিনি তৎ তৎরূপে পরিদৃষ্ট হন। বক্ষদেশে ভৃগুপদ চিহ্ন বা শ্রীবৎস লক্ষণীয়।" (পৃ: ২১-২৪)

বলা বাহুল্য তীর্থংকরের বক্ষদেশে শ্রীবৎস চিহ্ন উৎকীর্ণ থাকে।

লাক্ষ্ণৌর লালা রাম নারায়ণ তাঁর 'মেরে উত্তরাখণ্ড-কী যাত্রা'য় (১৯৪২) বিষয়টিকে এভাবে উপস্থাপিত করেছেন :

"বদ্রী বিশালের দরজায় দুটী সোনার পত্রক সহ কলস অঙ্কিত। দরজাটী পুব দিকে খোলে।" (পৃ: ৬৫)

"পূজারী এবারে আমাদের সেই মূর্তি দেখালেন যা তিনি সিংহাসনের মাঝখানে বসালেন। মূর্তির গায়ে তখন কোনো অঙ্গ সজ্জা ছিল না। রাওয়াল (পূজারী যে নামে অভিহিত হন) প্রদীপ আরো একটু উজ্জ্বল করে দিলেন। সেই আলোয় মূর্তিটি কালো পাথরের ও দৈর্ঘে এক হাত মতো বলে মনে হল। মূর্তিটিকে এভাবে দেখার পর আমার পূর্ব রাত্রের ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে বাধ্য হলাম। মূর্তির ডানদিকে কুবের, উদ্ধব, গণেশ ও গরুড়, বাঁ দিকে নারায়ণ মূর্তি। মূর্তির কাছে ঘণ্টাকর্ণ বা ক্ষেত্র পাল। সিংহাসনটী সম্পূর্ণ রূপোর তৈরী, এবং পূজায় ব্যবহৃত সমস্ত বাসনও আবার রূপোর।" (পৃ: ৭২)

লালজী এই বলে শেষ করছেন : "মূর্তিটি এমন ভাবে তৈরী যে, যে যেভাবে দেখতে চায় সে সেই ভাবেই এই মূর্তিটিকে দেখতে পায়।"

মূর্তিটি সম্পর্কে শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখনী হতে একটী সুন্দর বিবরণ পাই। তিনি তাঁর 'হিমালয়ের পথে পথে' গ্রন্থে লিখছেন :

"কালো পাথরের মূর্তি। প্রায় ফিট দুই উঁচু। কেউ বলেন যোগাসন, কারু মতে সিদ্ধাসন। চরণ দু'খানি দেখা যায়; চরণে পদ্ম চিহ্ন—বর্ণনায় শুনি। দুইটী হাত কোলের উপর রাখা—স্পষ্ট দেখা যায়। কারো মতে চতুর্ভুজ মূর্তি—অপর দুইটী হাত এক সময়ে থাকার কয়েকটি নিদর্শন মূর্তির

অঙ্গে দেখানো হয়। কম্বু গ্রীব—প্রদীপের আলোকেও শাঁখের ন্যায় রেখা গ্রীবায় স্পষ্ট ফোটে। যোগী নারায়ণ—শিরোভাগ থেকে জটা ভার নেমে এসেছে দু'দিকে কাঁধের উপর। বুকের উপর উপবীত, মধ্যখানে ভৃগুপদ চিহ্ন। বিশাল বক্ষ। ক্ষীণ-কটি। সুন্দর লীলান্বিত মূর্তি। কিন্তু মুখ মণ্ডলের অস্তিত্ব নেই—যেন কিসের আঘাতে অবলুপ্ত হয়েছে—এমনি মসৃণ, সমতল!

"এ-মূর্তি কোন দেবতার তা নিয়ে মতভেদ আছে। সে কথাও প্রচার করা হয়। বৈষ্ণবরা এই বিগ্রহে দেখেন চতুর্ভুজ নারায়ণ। শৈবরা বলেন, দ্বিভুজ জটাধারী শিব মূর্তি। শক্তি উপাসকদের মতে—দেবী ভদ্রকালীর মূর্তি। জৈনরা বলেন, ইনি তীর্থংকর। আবার, কারো মতে—এটি ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তি; নারায়ণের প্রাচীন মূর্তি অপসারিত হবার পর, এই মূর্তি তির্বত থেকে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রবাদ আছে, রাজা বৈখানস বদরী নারায়ণের মূর্তিতে রামচন্দ্রজির পুজা করতেন। ব্যাখ্যাকারী উপসংহারে বলেন দেবতার মূর্তি যে ভক্ত যেমন বিশ্বাস নিয়ে দেখবেন তিনি এখানে সেই রূপেরই সেই ভাবে দর্শন পাবেন।···

"শোনা যায়, বদরীনাথে নারদকুণ্ড থেকে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য এখনকার এই মূর্তি উদ্ধার করেন এবং গরুড় শিলার কাছে এটির প্রতিষ্ঠা করেন। পরে, ১৫শ শতাব্দীতে গাড়োয়ালের এক মহারাজা বদরীনাথে একটি মন্দির নির্মাণের জন্যে স্বপ্নাদিষ্ট হন এবং এখন যেখানে মন্দির সেইখানে মূর্তিটি নিয়ে আসেন।" (পৃঃ ১৪৩-৪৪)

কিম্বদন্তী ও পুরাণ কথা বিষয়টীর ওপর আলোকপাত না করে বরং আরো ঘোরালো করে তুলেছে; তবে বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের অভিমত এই যে আমরা যেন তাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কেবল মাত্র মূর্তির পর্যবেক্ষণের দ্বারাই সত্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করি। এবং তা যদি করা হয় তবে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে একথা বলা যাবে যে মূর্তিটি ভগবান ঋষভদেবের যাঁর মাথার দু'দিক হতে জটাভার নেমেছে এবং যিনি হিমালয়ে নির্বাণ প্রাপ্ত হন। মুখ যে ভেঙে দেওয়া হয়েছে তাও ইচ্ছাকৃত বলেই মনে হয়। যাতে এটিকে তীর্থংকর মূর্তি বলে চেনা না যায়। শিল্প সম্পদকে এভাবে বিকৃত করবার নিদর্শন

অন্যত্রও দেখা যায়। বসা ধ্যান মূর্তি, জৈন সিদ্ধান্তানুযায়ী হাতের অনুস্থাপন প্রত্যেকটাই ইনি যে বিতরাগী পরম্পরার সে কথা বলে। মূর্তিটি যে বৌদ্ধ মূর্তি নয়, শরীরে কাপড়ের চিহ্ন না থাকায় এর নগ্নতা দৃষ্টে তা বলা যায়। মূর্তি ছাড়াও মন্দিরের গর্ভগৃহ, সভামণ্ডপ ইত্যাদির রচনা শৈলীতে, মন্দিরের দরজায় দুইটী সুবর্ণ পত্রকসহ কলস স্থাপনে ও দরজা পূর্বদ্বারী করায়, রূপোর সিংহাসনে মূর্তিকে মাঝখানে বসানোতে ও পূজার জন্য রূপোর বাসন ব্যবহার করায়, ঘণ্টাকর্ণ বা ক্ষেত্রপালের উপস্থিতিতে, পরিকর সহ মূল নায়ক একই পাথরে ক্ষোদিত করায়, নির্বাণ অভিষেকে ও রাওলের সংযত জীবন যাপনে মূর্তিটি যে জৈন তাই অনুমিত হয়।

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৮১ ॥ অষ্টম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :

গণেশ লালওয়ানী

"গৌতম, আমার নির্বাণের পর লোকে বলবে—'নিশ্চয়ই এখন কোনো জিন দেখা যাচ্ছে না।' কিন্তু গৌতম, আমার উপদিষ্ট ও বিবিধ দৃষ্টিতে প্রতিপাদিত পথই পথ-প্রদর্শকরূপে বর্তমান থাকবে।"

"গ্রাম ও নগরে যেখানেই যাবে সংযত থেকে শান্তি পথের অভিবৃদ্ধি করবে, অহিংসা পথের প্রচার করবে।"

—ভগবান মহাবীর

মহাবীর স্বামী

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

'জ্ঞান-ক্রিয়াভ্যাং মোক্ষঃ'

জ্ঞানপ্রভা-দীপ্ত তব চিত্ত অভিরাম,
রাজপুত্র, ভারতের যুগ-অন্ধকারে
জ্বালিলে অতুল শিখা। ত্যজি' সর্বকাম—
জীবনের জয় বার্তা দিলে দ্বারে দ্বারে।

সত্যসাধনায় তৃপ্তি, কর্ম বন্ধনের
চির বিলুপ্তির পথ স্বীয় মাঝে আনি,
প্রতিজনে বিতরিয়া পরম মোক্ষের
প্রাণ দ্যুতি, শ্রেয়োলাভে জাগালে, সন্ধানি!

সাধকের হৃদি-মন নমে তব নামে,
মহাসিদ্ধ, জন্মজিৎ, আদর্শ গভীর,
তীর্থস্রষ্টা, ধর্মময়, অহিংস সংগ্রামে
মহাবীর, আনন্দ-প্রতীক ধরিত্রীর।

প্রকাশ দীপ

ভগবান মহাবীর ২৫০০ বৎসর পূর্বে যে উদার আদর্শ বহির্জগতে প্রচার ও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—সেই অপরিগ্রহ ও অহিংসার বাণী আজও আমাদের জীবনে ও সমাজে যেন চিরন্তন প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি শিথিল হয়ে যাবে যদি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে লোভ ও হিংসাকে আমরা জয় করতে না পারি। মহাত্মা গান্ধিও এই বাণীই তাঁর জীবন দিয়ে প্রচার করে গেছেন—অহিংসাই সংসারে চরম সত্য। জৈন ধর্মের প্রভূত প্রভাব গান্ধিজীর জীবনে ও তাঁর পরিবারে সঞ্চারিত হয়েছিল। জৈন ধর্ম সেকালের এক বিস্মৃত-প্রায় 'দর্শন' মাত্র নয়, জৈন সিদ্ধান্ত আধুনিক ও ভবিষ্যৎ কালেও মানব সমাজের সংগঠন ও সংরক্ষণে কাজে লাগবে একথা আমাদের মনে রাখা দরকার।

—ডঃ কালিদাস নাগ

ভারতীয় ধর্মচিন্তায় যে যে ক্ষেত্র মহাবীরের শিক্ষার দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে তাহা হইতেছে আত্মা বিষয়ক চিন্তা; কর্মফলবাদ অর্থাৎ আচরণ বা চরিত্রই ধর্মাধর্মের মূল অঙ্গ; মোক্ষলাভে ইহজন্মের বা মানব জন্মের সার্থকতা এবং পুরুষাকারের শিক্ষা অর্থাৎ জীব সম্পূর্ণতঃ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা। সে যুগের যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকাণ্ডময় পুরোহিত-পরিচালিত ধর্মের ও দেবোপাসনায় স্বর্গলাভ-ধর্মের বাতাবরণের মধ্যে এই শিক্ষার খুব প্রয়োজন ছিল।

—ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেন

মহাবীরের কর্মবাদের আদর্শও কর্ম কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করে নাই। মোক্ষলাভে প্রত্যেক মানুষেরই চিরন্তন জন্মগত অধিকার রহিয়া গিয়াছে। মহাবীরের কর্মবাদে এই অধিকারকে নূতন করিয়া স্বীকৃতি দেয়। ফলে সেদিনকার সামাজিক ও জাতিগত বৈষম্যের উপর পতিত হয় এক প্রচণ্ড আঘাত। তাঁহার দার্শনিক মতবাদ ঘোষণা করে জীব জগতের প্রতিটি হিংসাত্মক কার্যেরই রহিয়াছে এক দূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া, তাই তাঁহার ধর্মের আদর্শ মানুষের হৃদয়ে এক উচ্চতর সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগাইয়া তোলে।

—শঙ্করনাথ রায়

মহাবীর ছিলেন প্রকৃত মহাবীর।…ইতিহাস লেখকেরা মিথ্যা করে পাইকারী হত্যার নেতা আলেকজাণ্ডার, সীজার, নেপোলিয়ন প্রমুখ দিগ্বিজয়ীদের মহাবীর রূপে বর্ণনা করে মহা অন্যায় এবং মহা ক্ষতি করেছেন। অগণিত মানুষের মৃত্যুর এবং অন্যান্য নানাবিধ দুঃখের যাঁরা কারণ হন, তাঁদের প্রশংসা না করে ধিক্কার দেওয়া উচিত ; তাঁদের প্রাপ্য অভিনন্দন নয়— নিন্দা, তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয় নয়—বর্জনীয় ; তাঁরা মহাবীর আখ্যার কোনো প্রকারেই যোগ্য নন্। অহিংসা কাপুরুষতা নয়, খাঁটি অহিংসাতেই আছে মহান বীরত্ব। …মহাবীরের নামটি (তাই) আমার কাছে শুধু একটি নাম নয়, একটি মহান প্রতীক।

—অজিতকৃষ্ণ বসু

আমরা কেবল ভুলি

শ্রীজ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

আমরা কেবল ভুলি। কিন্তু তবু কই
ভুলেছি একথা ভেবে আশ্চর্য কি হই?
অহিংসা, তিতিক্ষা, প্রেম, আজো তা না হ'লে
কি করে বিস্মৃত হই? সারা বিশ্ব চলে
কেন আজো মাৎস্যন্যায়ে? কেন আজো আছে
ক্ষুরধার তরবারি প্রত্যেকের কাছে
মনের গভীরে রাখা? কোন প্রয়োজন
আছে তাকে পুষে রেখে, জানে নাকো মন।
তবু রাখি। হয় তো বা নিজেও জানি না।
শান্তি কোথা, তোমার ও পুণ্য স্মৃতি বিনা?

ভগবান মহাবীর

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

যে মন্ত্র তুমি করে গেছ দান
ভগবান মহাবীর,
দেশে দেশে আর যুগে যুগে তাই
এনেছে তো প্রত্যাশা।
তোমাকে যে স্মরে—এমন সাধুই
সত্য শপথে স্থির,
তুমি দিয়ে গেছ অহিংসা-বাণী—
ক্ষমা-ত্যাগ-ভালোবাসা !

সকল ধর্ম তোমাতে মিশেছে—
মিশেছে মিত্র-অরি।
তীর্থংকর, হে যোগীপ্রবর,
তোমাকে প্রণাম করি ॥

ভগবান মহাবীর

শ্রী আর. ডি. ভাণ্ডারে

ভগবান মহাবীরের ২৫০০তম নির্বাণ উৎসবের উদ্বোধন করবার যে সুযোগ আপনারা আমাকে দিয়েছেন তার জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এই উৎসব দেশের সর্বত্র উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ভগবান মহাবীরের জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় মুনিদের জায়গায় জায়গায় অভিভাষণ হবে। সেই অভিভাষণ হতে আপনারা জীবন নির্মাণের অনেক প্রেরণা লাভ করবেন। তবে পাবাপুরীর এই উৎসবের এক বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ এই পাবাপুরীতে ভগবান মহাবীর নির্বাণ লাভ করেন ও সংসারের জীবন মৃত্যুর প্রবাহ হতে নিজেকে সর্বথা মুক্ত করে নেন। নির্বাণ লাভ খুবই শক্ত এবং তা দু'একজন লোকই করতে পারে। কারণ সত্য জ্ঞান ছাড়া নির্বাণ লাভ করা যায় না এবং সত্য জ্ঞানের পথে পদে পদে বাধা ও প্রলোভন ছড়ানো। এদের ওপর তিনিই জয় লাভ করতে পারেন যিনি অসীম সাহসী ও সংকল্পে অটল।

কল্পসূত্র ও মহাবীর পুরাণে ভগবান মহাবীরের যে জীবন পাওয়া যায় তার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। তবে তাঁর দর্শন ও উপদেশে কোনো পার্থক্যই নেই। মহাবীর এক নির্ভীক, দৃঢ়চেতা ও সাহসী যুবক ছিলেন। এক সমৃদ্ধ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। সুখী সাংসারিক জীবন যাপন করবার সমস্ত সাধন তাঁর করায়ত্ত ছিল। ধন সম্পদের তাঁর কোনো অভাবই ছিল না। সুন্দরী স্ত্রী ছিল ও পরিবার পরিজন। কিন্তু সে সমস্তকে তাঁর হেয় বলে মনে হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন সেই সুখ যার অন্ত নেই। তিরিশ বছর বয়সে তাই সংসার পরিত্যাগ করে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। নিজের ধন সম্পদ জন সাধারণের মধ্যে বণ্টন করে দেন। তাই মনে হয় সংসার পরিত্যাগের বাসনা তাঁর মনে অনেক আগেই উদিত হয়েছিল। সংসারে তাঁর কোনো অনুরাগ ছিল না। জৈন মান্যতা অনুসারে মাথার চুল উৎপাটিত করে তিনি স্বয়ং প্রব্রজিত হন। এ যে কত বড় ত্যাগ ও সাহস তা আপনারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারছেন।

দীর্ঘ বারো বছর মহাবীর তপস্যা করেন। সাধনার তেরো বছরে তিনি জ্ঞান প্রাপ্ত হন। জ্ঞানের সন্ধান ও পথ কত দুরূহ ও কষ্ট সাধ্য তা এ হতেই অনুমান করা যায়। মহাবীর এভাবে কঠোর তপস্যায় কর্মরজঃ ক্ষয় করে নিজের ইন্দ্রিয়ের ওপর বিজয় প্রাপ্ত হন। তিনি যে জ্ঞান প্রাপ্ত হলেন তাকে কেবল-জ্ঞান বলে যা সর্বোচ্চ, অব্যবাধ, অভাব-রহিত ও পরিপূর্ণ। মহাবীর সেই জ্ঞান নিজের মধ্যেই সীমিত রাখেন নি। সেই জ্ঞান যাতে সকলেই লাভ করতে পারে তার জন্য দীর্ঘ তিরিশ বছর নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেছেন। বছরের আট মাসই তিনি প্রব্রজন করতেন, শুধু বর্ষার চার মাস এক স্থানে অবস্থান। বর্ষার সময় জীবের অভিবৃদ্ধি হয়, তাই যাতে তাঁর চলায় জীবহানি না হয় তার জন্য এই নিয়ম। মহাবীর এভাবে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন স্থানে জ্ঞান ও সদাচারের উপদেশ দিয়েছেন ও নিগ্রর্ন্থ মতবাদ প্রচার করেছেন। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহের কথা রাজার প্রাসাদ হতে দীনতম দরিদ্রের কুটীরে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। সমস্ত জাতি ও বর্ণের জন্য তাঁর দরজা ছিল সর্বদাই খোলা। স্ত্রী পুরুষ সকলেরই ছিল তাঁর ধর্ম গ্রহণ করবার সমান অধিকার। বিশ্ব মৈত্রীর ভাবনা তাই তাঁর প্রচারের মধ্যে দিয়ে দিকে দিকে প্রসারিত হল। তিনি বললেন মুক্তি বা মোক্ষ লাভের পথ সম্যক দর্শন, জ্ঞান ও চারিত্রের পথ। 'সম্যকদর্শন-জ্ঞান-চারিত্রাণি মোক্ষঃমার্গঃ'। সম্যক দর্শনের অর্থ তীর্থংকর বাক্যে পূর্ণ বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস জাত তত্ত্বের যে সত্য বা পূর্ণ জ্ঞান তাই সম্যক জ্ঞান। তদনুযায়ী জীবন যাপন সম্যক চারিত্র বা সদাচারময় জীবন। মহাবীর সম্যক চারিত্রের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ সম্যক চারিত্র জাত বিশুদ্ধতা ছাড়া প্রাত্যহিক জীবনের বাসনা কামনার ওপর জয় লাভ করা যায় না এবং সমাজেও নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা হয় না।

ভগবান মহাবীরের উপদেশ কোনো বিশেষ স্থান, কাল বা পাত্রের জন্য সীমিত ছিল না। জৈন দর্শনের পৃষ্ঠভূমি অনেকান্ত। দীর্ঘ ২৫০০ বছর তা আমাদের অনুপ্রাণিত করে এসেছে এবং তার দ্বারা আমাদের জীবনও সমৃদ্ধ হয়েছে। সদাচারের জন্য মহাবীর যে পাঁচটী বিষয়ের

ওপর জোর দিয়েছিলেন, তার একটি অহিংসার ওপরই জৈনরা আজ কেবল গুরুত্ব দেন। এই গুরুত্বের জন্য রাত্রে পর্যন্ত তাঁরা আহার করেন না। অহিংসা পরমো ধর্মঃ সন্দেহ নেই তবে তাকে জীব হত্যা না করাতেই সীমিত রাখা ঠিক নয়। অনেকান্ত বৌদ্ধিক অহিংসা। অহিংসার ক্ষেত্র তাই অনেক বিস্তৃত। সাহস, পরোপকার, কাউকে পীড়া না দেওয়া ইত্যাদিও অহিংসার অন্তর্গত।

ভগবান মহাবীরের উপদেশ আমাদের ভালো ভাবে বুঝতে হবে ও তাকে জীবনে রূপায়িত করতে হবে। জৈন ধর্মাবলম্বীরা প্রধানতঃ সমাজের সুসম্পন্ন ও সমৃদ্ধিশালী অংশ। তাই তাঁরা যদি সদাচার-সম্পন্ন হন তবে সমাজের রূপ সহজেই পরিবর্তন করতে পারবেন; নৈতিকতার প্রকাশ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত করতে পারবেন। আজকের পৃথিবীতে এর প্রয়োজন আছে। জৈন ধর্মে যেমন অহিংসার ওপর জোর দেওয়া হয় তেমনি সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহের ওপরও জোর দেওয়া হোক।

শ্রদ্ধেয় অমর মুনি একটু আগেই বললেন যে জৈনধর্ম সমভাব সাধনের ধর্ম। বাস্তবেও সমভাব, সমতা, সমদৃষ্টি ও সাম্য জৈনধর্মের মূল। শ্রম, জ্ঞান ও সাম্য, যার ওপর জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠিত, আজকের নূতন সমাজের তার ওপরই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কারণ একমাত্র সেই ভাবেই সমাজের দুর্বল অংশের শোষণ বন্ধ হতে পারে ও সামাজিক ন্যায়ের ওপর এক সুন্দর, সুস্থ ও সবল সমাজের প্রতিষ্ঠা হতে পারে।

ভগবান মহাবীরের নির্বাণভূমি পাবাপুরীতে অনুষ্ঠিত ভগবান মহাবীরের ২৫০০তম নির্বাণ মহোৎসবে প্রদত্ত বিহারের রাজ্যপাল শ্রী আর. ডি ভাণ্ডারের অভিভাষণ।

বর্দ্ধমান-মহাবীর

[জীবন চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

কেবল-জ্ঞান লাভ করে ঋজুবালুকা তীর হতে বর্দ্ধমান একরাত্রে বারো যোজন পথ অতিক্রম করে এলেন মধ্যমা পাবায়।

মধ্যমা পাবায় আসবার কারণ তখন সেখানে এক যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন আচার্য সোমিল। সেই যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করবার জন্য তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সর্ব ভারতীয় পণ্ডিতদের। বর্দ্ধমান দেখলেন, তিনি যদি এখন সেখানে যান, যদি সেই সর্ব ভারতীয় পণ্ডিতদের স্বমতে আনতে পারেন তবে নিগ্রন্থ ধর্ম প্রচারে তা তাঁকে অনেকখানি সাহায্য করবে। তাঁরা তাঁর তীর্থ প্রতিষ্ঠার কাজে সরিক হবেন।

বর্দ্ধমান তীর্থ প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন, তিনি তীর্থংকর।

যাঁরা কেবল কেবল-জ্ঞান লাভ করে নিজেরাই মুক্ত হন তাঁরা জিন, অর্হৎ, কেবলী, কিন্তু তীর্থংকর নন্। যাঁরা নিজেরা মুক্ত হয়ে অন্যের মুক্তির পথ নিরূপণ করে দেন ও চতুর্বিধ সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁরা তীর্থংকর।

জিন, অর্হৎ বা কেবলী অনেক হয়েছেন, কিন্তু তীর্থংকর ?

এই অবসর্পিনীতে মাত্র চব্বিশটী। বর্দ্ধমান সেই চব্বিশ সংখ্যক তীর্থংকর।

অবশ্য বর্দ্ধমান মধ্যমা পাবা যাবার আগে দেবতারা ঋজুবালুকা তীরে তাঁর ধর্মসভা বা সমবসরণের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু সেই সমবসরণে কেবল মাত্র দেবতারা উপস্থিত ছিলেন। তাই বর্দ্ধমানের উপদেশে কেউই সংযম ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন নি। তীর্থংকরের উপদেশ এভাবে কখনো ব্যর্থ যায় না। তাই এই ঘটনাকে জৈন সাহিত্যে 'অচ্ছেরা' বা আশ্চর্যজনক বলে অভিহিত করা হয়েছে।

বর্দ্ধমান মধ্যমা পাবায় এসে মহাসেন উদ্যানে আশ্রয় নিলেন।

বৈশাখ শুক্লা দশমী। বর্দ্ধমানের উপদেশ শুনতে দলে দলে মানুষ চলেছে। কেউ হেঁটে, কেউ রথে, কেউ চতুর্দোলায়। কারু চিনাংশুকের বসন, কেউ নিরাভরণ। পশুপক্ষীও চলেছে। আকাশ পথে দেবতারা।

বর্দ্ধমান সেই উপদেশ সভায় সকলকে সম্বোধিত করে উপদেশ দিলেন। বললেন জীব ও অজীবের কথা, পাপ ও পুণ্যের কথা, আস্রব ও বন্ধের কথা, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষের কথা।

মানুষ যেমন কর্ম করে তেমনি ফলভোগ। সৎকর্ম করলে স্বর্গ, অসৎ কর্ম করলে নরক।

কিন্তু স্বর্গও কি কাম্য? মানুষ স্বর্গ কামনায় যজ্ঞ করে। যজ্ঞে পশু বলি দেয়। জীব হত্যা করে।

হিংসা কখনো ধর্ম হতে পারে না। স্বর্গ-সুখও অশাশ্বত। স্বর্গ হতেও মানুষ ভ্রষ্ট হয়। তাই মুক্তিই একমাত্র কাম্য।

জীব মুক্তই। অনন্ত জ্ঞান, দর্শন, বীর্য ও আনন্দ তার স্বরূপ। শুধু কর্মের আবরণ তাকে আবৃত করে রেখেছে। যেমন লাউয়ের খোল। মাটির প্রলেপ দিয়ে জলে ফেলে দিলে ডুবে যায়। কিন্তু মাটি গলে গেলেই আবার ভেসে ওঠে।

কর্ম সংস্পৃষ্ট মানুষ সংসার সমুদ্রে ডুবে রয়েছে। কর্মের আবরণ দূর করে দাও আবার ভেসে উঠবে, ঊর্দ্ধগতি লাভ করবে।

কর্ম সংস্পৃষ্ট হওয়ার নামই আস্রব। আস্রবের পরিণাম বন্ধ।

সঞ্চিত কর্মের যেমন ক্ষয় করতে হবে, তেমনি নূতন কর্ম বন্ধনের নিরোধ। এরই নাম সংবর ও নির্জরা। চৌবাচ্চার জল খালি করে দিলেই হবে না, দেখতে হবে তাতে যেন নূতন জল জমে না ওঠে।

কর্ম যখন নিঃশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তখন মুক্তি।

এরজন্য সর্ব নিয়ন্তা ঈশ্বরের কল্পনা করবার দরকার নেই কারণ তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন বললে কে তাঁকে সৃষ্টি করেছিল, তাঁর স্বরূপ কি সে সব প্রশ্নও তুলতে হয়।

তাই বিশ্বাস করো জীব অনাদি। কর্মও অনাদি। তবে কর্মের অন্ত

আছে, কর্ম অনন্ত নয়। কর্ম অন্তের যে পথ সেই পথ জিন নির্দিষ্ট পথ, সেপথ সম্যক দর্শন, জ্ঞান ও চারিত্রের পথ।

এই সত্য, এছাড়া সত্য নেই এই বিশ্বাসের নাম সম্যক দর্শন। এই বিশ্বাস জনিত যে সত্য জ্ঞান তাই সম্যক জ্ঞান। তদনুরূপ যে আচরণ তাই সম্যক চারিত্র।

সম্যক দর্শন বা বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। চাই জ্ঞান, তত্ত্বের অবধারণ। কিন্তু তত্ত্বের অবধারণও বৃথা যদি না হয় তদনুরূপ আচরণ। তাই এই তিনটিকে একত্রে আরাধনা করতে হয়।

এই তিনটী মিলে এক ত্রিপুটী—ত্রিরত্ন। তিনে এক, একে তিন।

সম্যক চারিত্রের জন্য অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ।

মহাবীরের পূর্ববর্তী তীর্থংকর অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ও অপরিগ্রহের কথা বলেছিলেন; মহাবীর তার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য যোগ করে দিলেন।

পার্শ্বনাথের চতুর্যাম ধর্ম তাই হল পঞ্চযাম।

বর্দ্ধমান বললেন, মনুষ্য জন্মের দুর্লভতার কথা। মানুষই কেবল মুক্ত হতে পারে, আর কেউ নয়। দেবতারাও মুক্ত হতে পারেন না কারণ স্বর্গ কর্ম ভূমি নয়, ভোগ ভূমি। মুক্তির জন্য তাই দেবতাদেরও মানুষ হয়ে জন্মাতে হয়।

মানুষ হয়ে জন্মান সুলভ নয়, কত জন্ম-জন্মান্তরের ভেতর দিয়ে জীব মানুষ হয়ে জন্মায়।

মানুষ হয়ে জন্মালেই কী সদ্ধর্ম শ্রবণ হয়? হয় না। সদ্ধর্ম শ্রবণ তাই দুর্লভ।

সদ্ধর্ম শ্রবণ হলেই কি হয় তাতে শ্রদ্ধা—বিশ্বাস? শ্রদ্ধা তাই দুর্লভ।

কিন্তু শ্রদ্ধা হলেই কি সব হয়? হয় না, যদি না থাকে উদ্যম। দুর্লভ তাই ধর্মে উদ্যম।

বর্দ্ধমান তাই সবাইকে ডাক দিয়ে বললেন, সময়ং মা পমায়য়—ওঠো, জাগো, অলস হয়ে সময় ক্ষেপ কোরো না। কালগত হয়ে যেমন ঝরছে গাছের পাতা তেমনি ঝরছে আয়ু, সময়। যা পাবার তা দ্রুত লাভ কর।

বর্দ্ধমানের কথা শ্রোতাদের মনে নিয়েছে। মনে নিয়েছে কেন না বর্দ্ধমান

সুন্দর করে সহজ করে বলেছেন ধর্মের তত্ত্ব। বলেন নি, আমার কাছে এসো, আমি তোমায় মুক্তি দেব। বলেছেন মুক্তি তোমার জন্মগত অধিকার। মুক্তি তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে। শুধু তাকে জানো, বোঝ, লাভ কর।

বর্দ্ধমানের কথা আরো ভালো লেগেছে তার কারণ তিনি ধর্মের তত্ত্ব বলেন নি বিদ্বৎজনের ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষায়, দুরূহ শব্দের সমাবেশে। বলেছেন সহজ করে, সাধারণের বোধগম্য লোক ভাষায়, অর্দ্ধমাগধীতে।

বর্দ্ধমানের কথা তাই এখন লোকের মুখে মুখে। ঘাটে মাঠে বাটে, অন্তঃপুরিকাদের অন্তঃপুরে, রাজন্যদের রাজসভায়, বিদ্বৎজনের আলোচনাচক্রে।

ক্রমে সেই কথা সোমিলাচার্যের যজ্ঞশালায় গিয়ে পৌছল। শুনে তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

যজ্ঞে উপস্থিত বিদ্বৎজনদের মধ্যে ইন্দ্রভূতিই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। ইনি গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাই গৌতম নামেও আবার ইনি অভিহিত হতেন। বাসস্থান মগধান্তর্বর্তী গোবর গ্রাম। পিতার নাম বসুভূতি, মায়ের নাম পৃথিবী। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। শিষ্য সংখ্যা পাঁচশ।

বর্দ্ধমানের খ্যাতির কথা শুনে গৌতমই সর্ব প্রথম জ্বলে উঠলেন। কারণ তাঁর নিজের জ্ঞানের গর্ব ছিল। নিজেকে তিনি সর্বজ্ঞ ভাবতেন। এক খাপে যেমন দুই তলোয়ার থাকে না, সেই রকম এক সময়ে দুই সর্বজ্ঞ। তাই তিনি মহাসেন উদ্যান হতে প্রত্যাগত একজনকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন দেখলে সেই সর্বজ্ঞ?

জবাব এল, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না। যেমন জ্ঞানা, তেমনি মধুক্ষরা তাঁর বাণী।

সেকথা শুনে গৌতম আরো জ্বলে উঠলেন। বর্দ্ধমানকে তাঁকে বাদে পরাস্ত করতে হবে। এ তাঁর প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। নইলে তাঁর সর্বজ্ঞত্ব থাকবে না। আবার ভাবলেন, সত্যিই কী বর্দ্ধমান সর্বজ্ঞ! না কোন শঠ, প্রবঞ্চক বা ঐন্দ্রজালিক নিজের সম্মোহনী শক্তিতে সবাইকে বিভ্রান্ত করছে। যাকেই সে বিভ্রান্ত করুক কিন্তু তাঁকে বিভ্রান্ত করা সহজ নয়। গৌতম তখন তাঁর শিষ্যদের নিয়ে মহাসেন উদ্যানের দিকে যাত্রা করলেন।

গৌতম সত্যিই বড় পণ্ডিত ছিলেন। বাদে সবাইকে তিনি পরাস্ত

করেছেন। কোথাও পরাজিত হননি। কিন্তু পাণ্ডিত্য এক, সাধনলব্ধ সিদ্ধি আর। তাই যখন বর্দ্ধমানের সামনে এসে উপস্থিত হলেন তখন তিনি তাঁর যোগৈশ্বর্য ও তপঃপ্রভাবে অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি বর্দ্ধমানকে তর্কে পরাস্ত করতে এসেছিলেন কিন্তু এখন দেখলেন তাঁকে তর্কে পরাস্ত করবার কোনো প্রবৃত্তিই যেন তাঁর আর নেই। বরং আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর যে সংশয় ছিল সে সংশয়ের কথা মনে এল। মনে মনে ভাবলেন—ইনি যদি অজিজ্ঞাসিতভাবে সেই সংশয়ের নিরসন করে দেন তবে তিনি তাঁকে সর্বজ্ঞ বলে স্বীকার করে নেবেন।

গৌতমকে তদবস্থ দেখে বর্দ্ধমানই প্রথম কথা বললেন। বললেন, ইন্দ্রভূতি গৌতম, আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই না তোমার সন্দেহ। আত্মা আছে কী নেই—তাই নয় কী ?

আশ্চর্য চকিত হলেন গৌতম। কী করে জানলেন ইনি তাঁর মনের কথা, তাঁর নাম ? তবে নিশ্চয়ই ইনি তাঁর সংশয়েরও নিরসন করে দিতে পারবেন। গৌতম তাই আরো বিনীত হয়ে বললেন, হাঁ ভগবন্।

কিন্তু কেন ?

কেন ? ভগবন্, বেদেই ত সেকথা রয়েছে। বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি। ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি।

কিন্তু গৌতম, স বৈ অয়মাত্মা জ্ঞানময়ঃ ইত্যাদি বাক্যে বেদে আত্মার অস্তিত্বও ত আবার স্বীকৃত হয়েছে ?

হাঁ ভগবন্। আমার শঙ্কার কারণও তাই।

গৌতম, তুমি যেমন বিজ্ঞানঘনর অর্থ করছ, বাস্তবে তা তার অর্থ নয়। বিজ্ঞানঘন ইত্যাদি বাক্যের অর্থ আত্মায় প্রতিনিয়ত যে জ্ঞান পর্যায়ের উদ্ভব ও পূর্ববর্তী জ্ঞান পর্যায়ের লোপ হয় তাই। এখানে পদার্থের জ্ঞান পর্যায়ই বিজ্ঞানঘন যা ভূত বা জ্ঞেয় পদার্থ হতে উৎপন্ন হয়। ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তির তাৎপর্যও পরলোকের সঙ্গে নয়। যখন নূতন জ্ঞান পর্যায়ের উদ্ভব হয় তখন পূর্ববর্তী জ্ঞান পর্যায় স্ফুটিত হয় না এই মাত্র।

বর্দ্ধমানের মুখে বেদবাক্যের এমন অপূর্ব সমন্বয় শুনে ইন্দ্রভূতি গৌতমের অজ্ঞানান্ধকার মুহূর্তেই দূর হয়ে গেল। তিনি করযোড়ে

বর্দ্ধমানের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, ভগবন্, আমি নিগ্র্ন্থ প্রবচন শুনতে অভিলাষী।

বর্দ্ধমান তখন তাঁকে নিগ্র্ন্থ প্রবচনের উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশে গৌতম সংসার বিরক্ত হয়ে তাঁর শিষ্যসহ বর্দ্ধমানের কাছে শ্রমণ ধর্ম গ্রহণ করলেন।

ইন্দ্রভূতি শ্রমণধর্ম গ্রহণ করেছেন সে খবর মুহূর্তেই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। শুনে কেউ বলল বর্দ্ধমান জ্ঞানের অগাধ বারিধি; কেউ বলল ধর্মের সাক্ষাৎ অবতার। তা নইলে গৌতমকে পরাস্ত করা মানুষের সাধ্য নয়।

ইন্দ্রভূতির পরাজয় ও শ্রমণ ধর্ম গ্রহণের খবর তাঁর ছোট ভাই অগ্নিভূতিও শুনলেন। তিনিও মধ্যমা পাবার যজ্ঞশালায় আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। প্রথমে ইন্দ্রভূতির পরাজয় হয়েছে সে কথা তাঁর বিশ্বাসই হয়নি। পূর্বের সূর্য পশ্চিমে উদিত হতে পারে কিন্তু ইন্দ্রভূতির পরাজয় কখনো নয়। কিন্তু ইন্দ্রভূতি যখন মহাসেন উদ্যান হতে ফিরে এলেন না তখন তিনি খানিকটা ক্ষোভ, খানিকটা অভিমান, খানিকটা আশ্চর্যচকিত ভাব নিয়ে তাঁর পাঁচশ জন শিষ্যসহ মহাসেন উদ্যানের দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর এ বিশ্বাস তখন দৃঢ় ছিল যে বর্দ্ধমানকে পরাস্ত করে তাঁর অগ্রজ ইন্দ্রভূতি গৌতমকে তিনি আবার যজ্ঞশালায় ফিরিয়ে আনবেন।

অগ্নিভূতি যজ্ঞশালা হতে যে আবেগ ও উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে বেরিয়েছিলেন মহাসেন উদ্যানের দিকে যতই এগিয়ে যেতে লাগলেন ততই দেখলেন তা যেন ক্রমশঃই স্তিমিত হয়ে আসছে। তারপর যখন তিনি বর্দ্ধমানের সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন তিনি যেন আর এক মানুষ।

বর্দ্ধমানই প্রথম কথা বললেন। বললেন, অগ্নিভূতি, কর্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই না তোমার সন্দেহ?

অগ্নিভূতি বললেন, হাঁ ভগবন্।

তার কারণ?

কারণ শ্রুতি যখন পুরুষ এবেদং গ্নিং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং এই বাক্যে পুরুষাদ্বৈতের প্রতিষ্ঠা করছে, যখন দৃশ্য অদৃশ্য, বাহ্য অভ্যন্তর, ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত কিছু পুরুষই তখন পুরুষের অতিরিক্ত কর্মের অস্তিত্ব কিভাবে স্বীকার করা

যায়। তাছাড়া যুক্তিতেও কী কর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়? কর্মবাদীরা বলেন, যেমন কর্ম তেমনি ফল। জীব যেমন কর্ম করে তেমনি ফল লাভ করে। জীব নিত্য, অরূপী ও চেতন, অথচ কর্ম অনিত্য, রূপী ও জড়। সে ক্ষেত্রে এদের সম্বন্ধ অনাদি না সাদি অর্থাৎ কোনো সময়ে হয়েছিল। যদি কোনো সময়ে হয়ে থাকে তার অর্থ হল জীব তার পূর্ববর্তী সময়ে কর্মরহিত ছিল কিন্তু এই মান্যতা কর্ম সিদ্ধান্তের প্রতিকূল। কারণ কর্মসিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবের কায়িক, বাচিক ও মানসিক প্রবৃত্তিই কর্মবন্ধের কারণ। আর জীবের সেইরূপ কায়িক বাচিক, ও মানসিক প্রবৃত্তি পূর্ববদ্ধ কর্মের জন্য। সেক্ষেত্রে মুক্ত জীব কোনো সময়েই বদ্ধ হতে পারে না। কারণ বদ্ধ হবার কারণের সেখানে সর্বথা অভাব। যদি বলা হয় জীব অকারণে কর্ম বদ্ধ হয় তবে একথাও বলা যেতে পারে যে মুক্তাত্মারও পুনরায় কর্মবদ্ধ হতে পারে। সেক্ষেত্রে কাউকেই আর মুক্ত বলা যাবে না। যদি জীব ও কর্মের সম্বন্ধকে অনাদি বলা হয় তবে কর্মও আত্ম স্বরূপের মতো নিত্য। যা নিত্য তা কখনো বিনষ্ট হয় না। সেক্ষেত্রে জীব কোনো সময়েই কর্মমুক্ত হবে না। যদি কর্মমুক্তই না হবে তবে মুক্তির জন্য প্রয়াসও নিরর্থক।

বর্দ্ধমান বললেন, অগ্নিভূতি, তোমার কথাতেই বোঝা যায় যে তুমি পুরুষ এবেদং ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের যথার্থ তাৎপর্য বুঝতে পারনি। এই শ্রুতি বাক্য পুরুষাদ্বৈতবাদের সাধক নয়, স্তুতি বাক্য মাত্র।

কেন ভগবন্?

এই জন্যই যে পুরুষাদ্বৈতবাদ দৃষ্টাপলাপ ও অদৃষ্টকল্পনা দোষে দুষ্ট।

সে কী রকম?

অগ্নিভূতি, সে এই রকম। পুরুষাদ্বৈত স্বীকার করলে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু আদি যা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট পদার্থ তার অপলাপ হয় ও সৎ ও অসৎ হতে স্বতন্ত্র 'অনির্বচনীয়' এক অদৃষ্ট বস্তুর কল্পনা করতে হয়।

না, ভগবন্। পুরুষাদ্বৈতবাদীরা এই দৃশ্য জগৎকে পুরুষ হতে ভিন্ন মনে করেন না, তাই অপলাপের প্রশ্নই নেই। জড় ও চেতনের পার্থক্য ব্যবহারিক কল্পনা মাত্র। বস্তুতঃ যা কিছু দৃশ্য অদৃশ্য, চর অচর সমস্তই পুরুষ স্বরূপ।

আচ্ছা, অগ্নিভূতি, পুরুষ দৃশ্য না অদৃশ্য ?

ভগবন্, পুরুষ রূপ রস স্বাদ গন্ধ ও স্পর্শহীন, অদৃশ্য। ইন্দ্রিয় দিয়ে পুরুষকে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

অগ্নিভূতি, যা চোখ দিয়ে দেখা যায়, কান দিয়ে শোনা যায়, নাক দিয়ে শোঁখা যায়, জিব দিয়ে যার আস্বাদ নেওয়া যায় ও ত্বক দিয়ে যা স্পর্শ করা যায় তাকে তুমি কি বলবে ?

ভগবন্, সে সমস্তই নাম রূপাত্মক জগৎ।

অগ্নিভূতি, এরা পুরুষ হতে ভিন্ন না অভিন্ন ?

অভিন্ন।

অগ্নিভূতি, তুমি এই মাত্র বললে পুরুষ অদৃশ্য, ইন্দ্রিয়াতীত। পুরুষ হতে অভিন্ন জগৎ তবে কি করে ইন্দ্রিয় প্রত্যয়ের বিষয় হয় ?

ভগবন্, মায়ায়। নামরূপাত্মক দৃশ্য জগতের উদ্ভব হয় মায়ায়। মায়া ও মায়া হতে উদ্ভূত নামরূপ জগৎ সৎ নয় কারণ কালান্তরে এর নাশ হয়।

অগ্নিভূতি, তবে কী দৃশ্য জগৎ অসৎ ?

না, ভগবন্। যেমন তা সৎ নয়, তেমনি অসৎও নয়। কারণ জ্ঞান সময়ে তা সৎরূপে প্রতিভাসিত হয়।

সৎও নয়, অসৎও নয়, তবে তুমি তাকে কি বলবে ?

সৎ ও অসৎ হতে স্বতন্ত্র এই মায়াকে আমি অনির্বচনীয় বলব।

অগ্নিভূতি, শেষ পর্যন্ত তোমাকে পুরুষাতিরিক্ত মায়ারূপ স্বতন্ত্র পদার্থকে স্বীকার করতেই হল। তবে কোথায় রইল তোমার পুরুষাদ্বৈতবাদ? অগ্নিভূতি, একটু চিন্তা কর—এই দৃশ্য জগৎ যদি পুরুষ হতে অভিন্ন হয় তবে তা ইন্দ্রিয়গোচর হতে পারে না কিন্তু তুমি সেই জগৎকে প্রত্যক্ষই দেখছ। নিশ্চয়ই তুমি একে ভ্রান্তি বলবে না ?

ভগবন্, যদি আমি একে ভ্রান্তিই বলি।

অগ্নিভূতি, ভ্রান্তজ্ঞান উত্তরকালেও ভ্রান্তই প্রমাণিত হয়। কিন্তু তুমি যাকে ভ্রান্তি বলছ তা কোনো সময়েই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়নি। তাই তা ভ্রান্তি নয়। নির্বাধ জ্ঞান।

ভগবন্, বাস্তবে মায়া পুরুষেরই শক্তি। পুরুষ বিবর্ত সময়ে নামরূপাত্মক জগৎ হয়ে ভাসমান হয়। বস্তুতঃ মায়া পুরুষ হতে ভিন্ন নয়।

অগ্নিভূতি, মায়া যদি পুরুষের শক্তিই হয় তবে তা পুরুষের জ্ঞানাদি অন্ত গুণের মতো অরূপী ও অদৃশ্য হতে হয়। কিন্তু মায়া অদৃশ্য নয়। তাই মায়া পুরুষের শক্তি হতে পারে না। মায়া পুরুষ হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাছাড়া পুরুষ বিবর্ত স্বীকার করলেও তা হতে পুরুষাদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। পুরুষ বিবর্তের অর্থ পুরুষের মূল স্বরূপের বিকৃতি। পুরুষ বিকৃতি স্বীকার করলে তাকে আর অকর্মক বলা যাবে না, বলতে হবে সকর্মক। যেমন সাদা জলের পচন হয় না তেমনি অকর্মক জীবে বিবর্তও হয় না। তাই পুরুষাদ্বৈতবাদীরা যাকে মায়া নামে অভিহিত করেন তা পুরুষাতিরিক্ত জড় পদার্থ। তাঁরা যে তাকে সৎ বা অসৎ না বলে অনির্বচনীয় বলেন এতেও তা যে পুরুষ হতে স্বতন্ত্র সে কথাই সিদ্ধ হয়। সৎ নয় কারণ তা পুরুষ নয়; অসৎও নয় কারণ তা আকাশ কুসুমের মতো কল্পিত বস্তুও নয়।

ভগবন্, স্বীকার করছি পুরুষাদ্বৈতবাদ স্বীকার করলে প্রত্যক্ষ অনুভবের অসম্ভাব হয়। কিন্তু জড় ও রূপী কর্মপদার্থ চেতন ও অরূপী আত্মার সঙ্গে কিভাবে সংবদ্ধ হয় ও কিভাবে তাকে প্রভাবিত করে?

যেমন অরূপী আকাশের সঙ্গে রূপময় দ্রব্যের সম্বন্ধ হয়, যেমন ব্রাহ্মী ঔষধি ও মদিরা আত্মার অরূপী চৈতন্যের ওপর ভালোমন্দ প্রভাব বিস্তার করে।

এভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ও শঙ্কার সমাধান। শেষ পর্যন্ত অগ্নিভূতিকে স্বীকার করতেই হল কর্মের অস্তিত্ব। স্বীকার করতে হল জীব ও কর্মের অনাদি সম্বন্ধ। যেমন বীজ ও অঙ্কুর। হেতু হেতু রূপে বর্তমান কিন্তু সেই সম্বন্ধের অবসান করা যেতে পারে।

প্রতিবুদ্ধ হয়ে অগ্নিভূতি তখন ইন্দ্রভূতির মতো তাঁর পাঁচশ জন শিষ্যসহ বর্দ্ধমানের কাছে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

অগ্নিভূতির পরাজয় ও শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণের খবর যখন সোমিলাচার্যের যজ্ঞ শালায় গিয়ে পৌঁছল তখন সেখানে উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সকলেই প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন ও পরে অগ্নিভূতির ছোট ভাই বায়ুভূতিকে অগ্রবর্তী করে সশিষ্য বর্দ্ধমানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

এঁদের মধ্যে ব্যক্ত ছিলেন কোল্লাগ সংনিবেশের ভারদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। শিষ্য সংখ্যা ৫০০। সুধর্মাও ছিলেন কোল্লাগ সন্নিবেশের তবে অগ্নি বৈশ্যায়ন গোত্রীয়। শিষ্য সংখ্যা ৫০০। মণ্ডিক মৌর্য সন্নিবেশের বাশিষ্ঠ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। শিষ্য সংখ্যা ৩৫০। মৌর্যপুত্র মৌর্য সন্নিবেশের কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। শিষ্য সংখ্যা ৩৫০। অকম্পিত মিথিলার গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। শিষ্য সংখ্যা ৩০০। অচলভ্রাতা কোশল নিবাসী হারীত গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। শিষ্য সংখ্যা ৩০০। মেতার্য তুংগিক সন্নিবেশের কৌডিন্য গৌত্রীয় ব্রাহ্মণ। শিষ্য সংখ্যা ৩০০। প্রভাস রাজগৃহের কৌডিন্য গৌত্রীয় ব্রাহ্মণ। শিষ্য সংখ্যা ২০০।

বায়ুভূতির শিষ্য সংখ্যা ছিল ৫০০।

এঁরা বর্দ্ধমানকে পরাস্ত করতে গেলেন তা নয় কারণ ইন্দ্রভূতি ও অগ্নি-ভূতির মতো পণ্ডিত যাঁর কাছে পরাজিত হয়েছেন তাঁকে পরাজিত করার কল্পনা বাতুলতা মাত্র। তাঁরা গেলেন সেই জ্ঞান ও বৈরাগ্যের মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করতে ও জীবাদি বিষয়ে তাঁদের প্রত্যেকের মনে যে যে শঙ্কা ছিল তার নিরসন করতে।

বর্দ্ধমান তাঁদের প্রত্যেককে স্বাগত জানালেন এবং প্রত্যেকের পৃথক পৃথক শঙ্কার নিরসন করে দিলেন। তারপর তাঁরাও সম্বুদ্ধ হয়ে বর্দ্ধমানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এভাবে একদিনে ৪৪১১ জন ব্রাহ্মণ নির্গ্রন্থ ধর্ম গ্রহণ করলেন। বর্দ্ধমান ইন্দ্রভূতি প্রমুখ ১১ জন পণ্ডিতদের তাঁদের নিজ নিজ গণ বা শিষ্যের ওপর সর্বাধিকার দিয়ে তাঁদের গণধর পদে অভিষিক্ত করলেন।

এই ৪৪১১ জন ছাড়াও আর যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে শ্রমণ ধর্ম অঙ্গীকার করলেন। যাঁরা শ্রমণ ধর্ম অঙ্গীকারে অসমর্থ হলেন, তাঁরা শ্রাবক ধর্ম গ্রহণ করলেন। এভাবে মধ্যমা পাবায় বৈশাখ শুক্লা দশমীতে বর্দ্ধমান সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক ও শ্রাবিকা রূপ চতুর্বিধ সংঘের প্রতিষ্ঠা করে তীর্থ প্রবর্তিত করলেন।

এই সভাতেই চন্দনাও তাঁর কাছে সাধ্বী ধর্ম গ্রহণ করলেন। বর্দ্ধমান তাঁকে সাধ্বী সংঘের নেত্রী করে দিলেন।

[ক্রমশঃ

ভগবান মহাবীরের নির্বাণভূমি পাবা

বৌদ্ধদের যেমন কুশীনগর, জৈনদের তেমনি পাবা। কুশীনগরে ভগবান বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন, পাবায় ভগবান মহাবীর। কিন্তু পাবার গুরুত্ব আরো একটী কারণে। কারণ, ভগবান মহাবীর পাবায় প্রথম শিষ্য সংগ্রহ করেন। ইন্দ্রভূতি প্রমুখ তাঁর প্রধান এগারো জন শিষ্য যাঁদের গণধর নামে অভিহিত করা হয়, তাঁরা পাবায় দীক্ষিত হন। পাবা তাই জৈনদের কাছে সারনাথও।

পাবায় মহাসেন উদ্যানে যেখানে ভগবান মহাবীর প্রথম ধর্মোপদেশ দেন এখন সেখানে নূতন সমবসরণ মন্দির নির্মিত হয়েছে। তার আগে সেখানে একটী স্তূপ, কুয়ো ও মহাবীরের চরণ পাদুকা ছিল। সে বেশী দিনের কথা নয়, তখন বছরের একদিন ছাড়া যাত্রীরা এদিকে বড় বিশেষ একটা আসত না। তার কারণ জল মন্দির বা গাঁও মন্দির হতে এর দূরত্ব, দ্বিতীয় নিরাপত্তা। কিম্বদন্তী, রাখাল ছেলেরা গরুবাছুর চরাতে এসে মহাবীরের সেই চরণ পাদুকা কুয়োর জলে ফেলে দিত ও তার জলে পড়ার শব্দ শুনত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে পরদিন সকালে সেই চরণ পাদুকাকে আবার ঠিক আগের জায়গাটিতে পাওয়া যেত। ক্রমে রাখাল ছেলেদের এ একটা মজার খেলা হয়ে পড়ে। যখন এ খবর জানা গেল তখন তীর্থক্ষেত্রের ব্যবস্থাপকরা জল মন্দিরের সামনে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এক সমবসরণ মন্দির নির্মাণ করান ও সেই চরণ সেখানে এনে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই চরণ আজো সেখানে রয়েছে। এই মন্দিরটিকে এখন পূর্ববর্তী স্থানে নূতন সমবসরণ মন্দির নির্মিত হওয়ায় পুরুণো সমবসরণ বলা হয়। পূর্ববর্তী স্থানে নূতন মন্দির নির্মিত হলেও (১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে) সেই স্তূপ ও কুয়ো আজো তেমনি সুরক্ষিত রয়েছে। এই কুয়োর জল সম্পর্কেও আর একটী কিম্বদন্তী আছে। অমাবস্যার রাত্রিতে এর জলে তৈলহীন প্রদীপও নাকি জ্বলত।

এ গেল ভগবান মহাবীর প্রথম যেখানে ধর্মোপদেশ দেন তার কথা। এবারে তাঁর নির্বাণ স্থানের কথা বলি। এখন যেখানে গাঁও মন্দির অবস্থিত সেইটাই নাকি মহাবীরের নির্বাণ স্থান। কল্পসূত্রে লিখিত আছে যে মহাবীর তাঁর অন্তিম চাতুর্মাস্য রাজা হস্তীপালের রজ্জুগশালায় ব্যতীত করেন। সেখানে কার্তিক অমাবস্যায় সূর্যোদয়ের মুখে মুখে ধর্মোপদেশ দিতে দিতে তিনি নির্বাণপ্রাপ্ত হন। তাঁর নির্বাণের পর তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা নন্দীবর্দ্ধন সেখানে একটি মণ্ডপ নির্মাণ করান ও মহাবীরের চরণ প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর সেখানে মন্দির নির্মিত হয়। সময়ে সময়ে সেই মন্দিরের সংস্কারও সাধিত হয়। শিলালিপিতে অতীতের শেষ সংস্কারের খবর পাওয়া যায় ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে সাজাহানের রাজত্বকালের। প্রাচীন জৈন জাতি মহত্তিয়ানরা তখন এখানে প্রভূত পরিমাণে বাস করতেন। মহত্তিয়ান জাতি আজ প্রায় অবলুপ্ত তবে মন্দিরটী যে খুব প্রাচীন তা বেশ বোঝা যায় মাটির নীচের মন্দির নির্মাণের বিভিন্ন স্তর দৃষ্টে।

গাঁও মন্দিরের গর্ভগৃহের মধ্য ভাগে ভগবান মহাবীরের মনোজ্ঞ মর্মর মূর্তি। তাঁর দুদিকে দক্ষিণে ভগবান ঋষভদেব ও বামে ভগবান শান্তিনাথের অনুরূপ প্রস্তর প্রতিমা। তাছাড়া আরো রয়েছে সেখানে ধাতু নির্মিত কয়েকটী পঞ্চতীর্থি ও ছোট ছোট তীর্থংকর মূর্তি। মূলবেদীর দক্ষিণে রয়েছে ভগবান মহাবীরের চরণ যুগল ও বাঁ দিকে তাঁর এগারো জন গণধরের চরণ-পাদুকা ও দেবর্দ্ধি গণি ক্ষমাশ্রমণের হলুদ পাথরের প্রতিমা। মূল বেদীর সামনে কালো পাথরে মহাবীরের অতিসুন্দর চরণ পাদুকা।

এই মন্দিরের চার কোণে গর্ভগৃহের শিখরের অনুরূপ চারটী শিখর ছিল ও এক একটী মন্দির। প্রথম মন্দিরে ভগবান পার্শ্বনাথের প্রতিমা ও মহাবীরের চরণ, দ্বিতীয় মন্দিরে তিনজন প্রখ্যাত দাদা গুরুর চরণ পাদুকা, তৃতীয়টিতে স্থূলিভদ্রের চরণ ও শেষেরটিতে মহাবীরের প্রথম শিষ্যা চন্দনবালার চরণ পাদুকা। কোণের শিখর ও মন্দিরগুলি এখন নেই। মূল মণ্ডপকে আরো বিস্তৃত করবার জন্য তাদের ভেঙে ফেলা হয়েছে। নির্মাণ কাজ শেষ হলে মন্দিরটী এক বিশালরূপ লাভ করবে।

গাঁও মন্দিরকে কেন্দ্র করে চার দিকে ধর্মশালা। যাত্রীরা এখানে এসে

অবস্থান করেন ও মন্দিরে ভগবানের পূজো। মন্দিরটি খুবই পবিত্র ও প্রভাব সম্পন্ন। একটী কিম্বদন্তী আছে যে আজো মন্দির যখন বন্ধ থাকে তখনো সময়ে সময়ে ভেতর হতে আলোর প্রকাশ ও গান বাজনা ও ভজনের ধ্বনি শোনা যায়।

জলমন্দিরই পাবাপুরীর প্রধান মন্দির ও দ্রষ্টব্যস্থান। রাজগৃহের পর্বত-মালার পটভূমিতে বৃহৎ সরোবরের মধ্যস্থিত বিমানাকৃতি মর্মর পাথরের জলমন্দিরটী যেমন নয়নাভিরাম তেমনি নির্মল চারিত্রের প্রতীক।

জলমন্দির এখন যেখানে অবস্থিত, ভগবান মহাবীরের সেখানে অগ্নি সংস্কার করা হয়। মহাবীরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে সেখানে যে বিপুল জনতা একত্রিত হয়েছিল তারাই সেখানকার মাটি একটু একটু করে তুলে নিয়ে যায়, যার ফলে সেখানে এক বৃহৎ 'গহ্বরের সৃষ্টি হয়। সেই গহ্বরই কালক্রমে বর্তমান সরোবরের রূপ পরিগ্রহ করে। মহাবীরের নশ্বর দেহকে যেখানে ভস্মীভূত করা হয় সেখানে তাঁর অগ্রজ নন্দীবর্দ্ধন একটি মন্দির নির্মাণ করান।' পরবর্তী নানা সময়ে তার সংস্কার সাধিত হয়। বর্তমানের এই রূপটি কিছুদিন আগেও ছিল না। একে মর্মর মণ্ডিত করেন কলকাতার এক ধনী ব্যবসায়ী তাঁর সর্বস্ব দান করে। একশ বছর আগেও এই মন্দিরে যেতে হত নৌকোয় করে। তারপর তৈরী হল ৬০০ ফুট লম্বা সেতু। সেই সেতুকে প্রশস্ত করা হল আরো পরে। দু'দিকে লাল পাথরের রেলিং দিয়ে তৈরী হল প্রবেশ পথের নহবৎখানা।

মন্দিরের গর্ভগৃহে ভগবান মহাবীরের অতি প্রাচীন ছোট চরণপাদুকা। উভয় দিকের বেদীতে গণধর গৌতম ও সুধর্ম্ম স্বামীর চরণ। পরিবেশ গম্ভীর ও শান্ত। এমন শান্তির নিলয় বোধহয় সংসারে আর একটিও নেই।

এই মন্দিরটি সম্পর্কেও একটি কিম্বদন্তী আছে। মহাবীরের চরণের ওপর যে তিনটী ছত্র তা কার্তিকী অমাবস্যায় তাঁর নির্বাণের বিশেষ সময়ে আপনা হতেই নড়ে ওঠে। এই নড়া অনেকেই দেখেছেন।

পাবার এইগুলিই প্রধান মন্দির। এছাড়া আরো দু'একটি মন্দির আছে যার মধ্যে মহতাববিবির মন্দির ও দিগম্বর জৈন মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যাত্রীদের জন্য এখানে অনেক ধর্মশালা রয়েছে, দীন দরিদ্রের জন্য দীনশালা। সেখানে দীন দুঃখীদের অন্ন বস্ত্র দান করা হয়।

পাবা পাটনা-রাঁচী রোডের ওপর পাটনা হতে ৪৮ মাইল দূরে অবস্থিত। রাজগৃহ হতে হাঁটাপথে মাত্র ৮ মাইল। যাঁরা রাজগীর নালন্দায় যান তাঁদের সকলের এখানে অবশ্যই আসা উচিত।
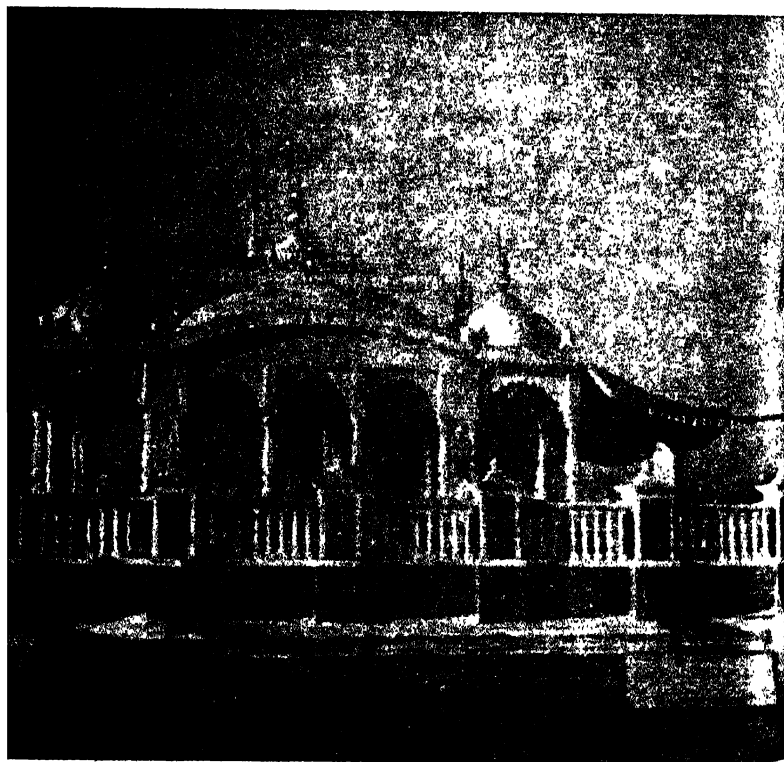
জল মন্দির, পাবাপুরী

মহাবীর সম্পর্কিত সাহিত্য

কুমারী মঞ্জুলা মেহতা

ভগবান মহাবীর জৈন ধর্মের ২৪ সংখ্যক তীর্থংকর। তাঁর নির্বাণের ২৫০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। জৈন আগম ও তার ব্যাখ্যা সাহিত্যে ভগবান মহাবীর সম্পর্কে অনেক বর্ণনা বা উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া তাঁর ওপর অনেক স্বতন্ত্র গ্রন্থও লিখিত হয়েছে। এই সব গ্রন্থ সংস্কৃত আদি প্রাচীন ভাষার অতিরিক্ত আধুনিক ভাষাতেও লিখিত হয়েছে। যে সমস্ত আগম ও তার ব্যাখ্যা সাহিত্যে ভগবান মহাবীরের বিবরণ বিশেষভাবে পাওয়া যায় তাদের নাম: আচারাঙ্গ, স্থানাঙ্গ, সমবায়াঙ্গ, ভগবতীসূত্র, ঔপপাতিক, কল্পসূত্র, আবশ্যক নির্যুক্তি, আবশ্যক চুর্ণি, বিশেষাবশ্যক ভাষ্য।

ভগবান মহাবীর সম্পর্কিত গ্রন্থের স্বতন্ত্র তালিকা নীচে দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা ভগবান মহাবীর সম্পর্কে গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লিখতে চান তাঁদের এগুলি সহায়ক হবে বলে মনে করি।

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	প্রকাশন বর্ষ বা রচনাকাল
জ্ঞাতপুত্র শ্রমণ ভগবান	হীরালাল কাপড়িয়া	১৯৬৯
তীর্থংকর মহাবীর	মহেন্দ্রকুমার	
তীর্থংকর ভগবান মহাবীর	বীরেন্দ্রপ্রসাদ জৈন	১৯৫৯
তীর্থংকর মহাবীর	বিজয়েন্দ্র সূরি	১৯৬২
তীর্থংকর বর্দ্ধমান	শ্রীচন্দ রামপুরিয়া	বী. স. ২৪৮০
তীর্থংকর বর্দ্ধমান	মুনি বিদ্যানন্দ	১৯৭৩
ধর্মবীর মহাবীর ঔর কর্মবীর কৃষ্ণ	সুখলালজী (অনু) শোভাচন্দ্র	১৯৩৪
নির্গ্রন্থ ভগবান মহাবীর	জয়ভিক্ষু	১৯৫৬
বুদ্ধ ঔর মহাবীর	কি. ঘ. মশরুবালা (অনু) জমনালাল জৈন	১৯৫১
ভগবান মহাবীর	গোকুলদাস কাপড়িয়া	১৯৪৯
ভগবান মহাবীর	গোকুল চন্দ্র জৈন	১৯৭৩

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	প্রকাশন বর্ষ বা রচনাকাল
ভগবান মহাবীর	দলসুখ মালবণিয়া	১৯৫১
ভগবান মহাবীর	কৈলাশচন্দ্র শাস্ত্রী	বী. স. ২৪৭৯
ভগবান মহাবীর	জয়ভিক্ষু	১৯৫৭
ভগবান মহাবীর	জয়ভিক্ষু (অনু) সরোজ শাহ	১৯৬৭
ভগবান মহাবীর	কামতাপ্রসাদ জৈন (অনু) হিম্মতলাল	১৯৫৩
ভগবান মহাবীর অনে মাংসাহার	রতিলাল শাহ	বি. স. ২০১৫
ভগবান মহাবীর ঔর উনকা মুক্তি মার্গ	রিষভদাস রাঁকা	১৯৫৩
ভগবান মহাবীর ঔর উনকা সংদেশ	পরমেষ্ঠীদাস জৈন	
ভগবান মহাবীর ঔর উনকী অহিংসা	(প্রকা) প্রেম রেডিয়ো এণ্ড ইলেকট্রিক মার্ট	১৯৭৩
ভগবান মহাবীর ঔর মাংস নিষেধ	আত্মারামজী	১৯৫৭
ভগবান মহাবীর ঔর বিশ্বশান্তি	জ্ঞান মুনি	বি. স. ২০১১
ভগবান মহাবীর ঔর বিশ্বশান্তি (উর্দু)	জ্ঞানমুনি	
ভগবান মহাবীর ঔর উনকা তত্ত্বদর্শন	আচার্য দেশভূষণ	১৯৭৩
ভগবান মহাবীর কা অচেলক ধর্ম	কৈলাশচন্দ্র শাস্ত্রী	
ভগবান মহাবীর কা আদর্শ জীবন	চৌথমল মুনি	বি. স. ১৯৮৯

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	প্রকাশন বর্ষ বা রচনাকাল
ভগবান মহাবীর কা জন্ম কল্যাণ	চৌথমল মুনি	বি. স. ১৯৯৫
ভগবান মহাবীর কী অন্তিম শিক্ষায়েঁ	বর্দ্ধমান মহারাজ	বি. স. ১৯৯৭
ভগবান মহাবীর কী অহিংসা ঔর মহাত্মা গান্ধী	পৃথ্বীরাজ জৈন	১৯৫০
ভগবান মহাবীর কী বোধ কথায়েঁ	অমর মুনি	১৯৬৬
ভগবান মহাবীর কী সাধনা	মধুকর মুনি	বি. স. ২০০৭
ভগবান মহাবীর কী সূক্তিয়াঁ	রাজেন্দ্র মুনি শাস্ত্রী	১৯৭৩
ভগবান মহাবীরকে পাঁচ সিদ্ধান্ত	জ্ঞান মুনি	বি. স. ২০১৫
ভগবান মহাবীরকে প্রেরক সংস্মরণ	মহেন্দ্রকুমার 'কমল'	১৯৭৩
ভগবান মহাবীরনা ঐতিহাসিক জীবননী রূপরেখা	ধীরজলাল শাহ	১৯৬২
মহামানব মহাবীর	ন্যায় বিজয়মুনি	১৯৫৭
মহামানব মহাবীর	রঘুবীরশরণ দিবাকর	১৯৫১
মহাবীর (উর্দূ)	অমর মুনি	১৯৪০
মহাবীর	রতিলাল শাহ'	বি. স. ২০০৬
মহাবীর	ধীরজলাল শাহ	বি. স. ২০০৯
মহাবীর ঔর বুদ্ধ	কামতাপ্রসাদ জৈন	১৯৫৭
মহাবীর কথা	গোপালদাস পটেল	১৯৪১
মহাবীর কা অন্তস্তল	সত্যভক্ত স্বামী	১৯৫৩
মহাবীর কা জীবন দর্শন	রিষভদাস রাঁকা	১৯৫১
মহাবীর কা সর্বোদয় তীর্থ	জুগল কিশোর মুখ্তার	১৯৫৫
মহাবীর কী জীবন দৃষ্টি	ইন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী	১৯৬৭

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	প্রকাশন বর্ষ বা রচনাকাল
মহাবীর চরিত্র	জিনবল্লভ	১১২৯
মহাবীর চরিত্র	হর্ষচন্দ্র (অনু) পী. এন. শাহ	বি. স. ২০০২
মহাবীর চরিত্র (সচিত্র)	ভানুবিজয়জী	বি. স. ২০২২
মহাবীর চরিত্র (গুজরাতী অনু)	গুণচন্দ্র	বি. স, ১৯৯৪
মহাবীর চরিত্র	নেমিচন্দ্র সূরী	বি. স. ১৯৭৩
মহাবীর চরিত্র	মফতলাল সংঘবী	বি. স. ১৯৪৯
মহাবীর চরিত্র	গুণচন্দ্র	১১২৯
মহাবীর চরিত্র	দেবভদ্র সূরি	বি, স. ১১৩৯
মহাবীর জিন স্তুতি	যশোবিজয়জী	১৮৭৮
মহাবীর জীবননী মহিমা	বেচরদাস দোশী	বী. স. ২৪৫৪
মহাবীর জীবন মহিমা	বেচরদাস দোশী	১৯৫৮
মহাবীর জীবন বিস্তার	সুশীল	বী. স. ২৪৭৭
মহাবীরদেবনু জীবন	ভদ্রঙ্কর বিজয়	বি. স. ২০১৩
মহাবীরনা দশ উপাসকো	বেচরদাস দোশী	১৯৩১
মহাবীরনা যুগনী মহাদেবীয়োঁ	সুশীল	বি. স. ২০০২
মহাবীর দেবনো গৃহস্থাশ্রম	ন্যায়বিজয় মুনি	বি. স. ২০১১
মহাবীর প্রবচন	ক্রান্তিমুনি	১৯৫৮
মহাবীর বত্রীশী	জয়শেখর সূরী	১৫ শতক
মহাবীর : মেরী দৃষ্টিমেঁ	রজনীশ	১৯৭১
মহাবীর যুগনা উপাসকোঁ	(প্রকা) জৈন আত্মানন্দ সভা	বি. স. ২০২৭
মহাবীর বর্দ্ধমান	জগদীশচন্দ্র জৈন	১৯৪৫
মহাবীর বাণী	বেচরদাস দোশী	১৯৪২
মহাবীর বাণী (গুজ)	বেচরদাস দোশী	বি. স. ২০১১
মহাবীর বাণী (১-২)	রজনীশ	১৯৭২-৭৩

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	প্রকাশন বর্ষ বা রচনাকাল
মহাবীর : ব্যক্তিত্ব, উপদেশ ঔর আচার মার্গ	রিষভদাস রাঁকা	১৯৭৩
মহাবীর—সিদ্ধান্ত ঔর উপদেশ	অমর মুনি	১৯৬০
মহাবীর স্তবন	যশোবিজয়জী	১৮ শতক
মহাবীর স্তুতি	(প্রকা) ভেঁরোদান জেঠমল	১৯২৫
মহাবীর স্তোত্র	(অনু) দেবীলাল	বী. স. ২৪৪৮
মহাবীর স্তোত্র	জিনবল্লভ সূরি	বি. স. ২০০৯
মহাবীর স্তোত্র	হেমচন্দ্রাচার্য	১৮৯০
মহাবীর স্তোত্র	কল্যাণসাগর সূরি	১৮৭৯
মহাবীর স্তোত্র	জিনপ্রভাচার্য	১৮৭৯
মহাবীর স্বামীনো অন্তিম উপদেশ	গোপালদাস পটেল	১৯৩৮
মহাবীর স্বামীনো আচার ধর্ম	গোপালদাস পটেল	বি. স. ১৯৯২
মহাবীর স্বামীনো সংযম ধর্ম	গোপালদাস পটেল	বি. স. ১৯৯২
মহাবীরাষ্টক	ভাগচন্দ	১৯ শতক
বর্দ্ধমান	অনূপ শর্মা	১৯৫১
বর্দ্ধমান চরিত্ত	অসগ	৯৮৮
বর্দ্ধমান চরিত্ত	সকলকীর্তি	১৫ শতক
বর্দ্ধমান জিন স্তোত্র	জিনপ্রভাচার্য	১৮৭৯
বর্দ্ধমান দ্বাত্রিংশিকা	ধর্মসাগর উপাধ্যায়	১৭ শতক
বর্দ্ধমান দেশনা	শুভবর্দ্ধন	১৬ শতক
বর্দ্ধমান নির্বাণ কল্যাণক স্তবন	জিনপ্রভাচার্য	১৮৭৯
বর্দ্ধমান পঞ্চাশিকা	সুশীল বিজয়	বি. স. ১৯৪৪
বর্দ্ধমান মহাবীর	ব্রজকিশোর নারায়ণ	১৯৫০
বীরায়ণ	ধন্যকুমার জৈন	১৯৬০
বীরকল্প	সোমতিলক	১৩৮
বীরচরিত্র	জিনেশ্বর সূরি	১১ শতক

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	প্রকাশন বর্ষ বা রচনাকাল
বীরচরিত্র	দেবভদ্র সূরি	১২ শতক
বীর জিন স্তুতি	মেরুবিজয়	১৭ শতক
বীরথুই	আত্মারামজী	১৯৪২
বীরনির্বাণ ঔর দীপাবলী	চৌথমল মহারাজ	১৯৬৬
বীরভক্তামর	ধর্মবর্দ্ধন গণি	১৯২৬
বীরবিভূতি	ন্যায়বিজয় মুনি	
বীরস্তব	হরিভদ্র সূরী	৮ম শতক
বীরস্তবন মঞ্জরী	মোহনলাল বাডিয়া	বি. স. ২০১২
বীরস্তুতি	পুষ্প ভিক্ষু	১৯৩৯
বীরস্তুতি	অমর চন্দ্রজী	১৯৪৬
বীরস্তোত্র	জিনপ্রভাচার্য	১৮৭৯
বৈশালীকে রাজকুমার তীর্থংকর ভগবান মহাবীর	নেমিচন্দ জৈন	১৯৭৩
শ্রমণ ভগবান মহাবীর	ধীরজলাল শাহ্	১৯৫১
শ্রমণ ভগবান মহাবীর	কল্যাণ বিজয়	বি. স. ১৯৯৮
শ্রমণ ভগবান মহাবীর তথা মাংসাহার পরিহার	হীরালাল দুগড	১৯৬৪
শ্রীবর্দ্ধমান পুরাণ	নবল শাহ্	বি. স. ১৮২৫
Lord Mahavira	Boolchand	1948
Lord Mahavira	Puranchand Samsookha	1953
Lord Mahavira and Some Other Teachers of His Time	Kamta Prasad Jain	1927
Mahavira	Vallabh Suri	1956
Mahavira	Amar chand	1953
Mahavira & Buddha	Kamta Prasad Jain	1955
Mahavira & Jainism	Jyoti Prasad Jain	1958

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	প্রকাশন বর্ষ বা রচনাকাল
Mahavira and His Philosophy of Life	A. N. Upadhye	1950
Mahavira : His Life and Teachings	B. C. Law	1937
Mahavira : His Life and Teachings	S. Raghavachari	
Mahavira : Life and Teachings	K. C. Lalwani	
Teachings of Lord Mahavira	Ganesh Lalwani	1967
Shramana Bhagavan Mahavira	Ratnaprabha Vijaya	1942-51

শ্রমণ (হিন্দী), বারাণসী, বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৫ হতে সংকলিত

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোনো সংখ্যা থেকে শ্রমণের এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।
- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ১২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
দ্বিতীয় বর্ষ ॥ পৌষ ১৩৮১ ॥ নবম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :
গণেশ লালওয়ানী

বীরভূম মল্লারপুরে সিদ্ধেশ্বরীদেবীর মন্দিরের দক্ষিণ দিকে এই সৌম্য শান্ত আত্ম সমাহিত মূর্তিটি রয়েছে। মূর্তিটি কোন তীর্থংকরের বলেই মনে হয়। লাঞ্ছন না থাকায় কার সেকথা বলা শক্ত। পাদপীঠের দু'দিকে কুকুর থাকায় ভগবান মহাবীরের বলেই অনুমিত হয়। মহাবীর যখন রাঢ়ে অবস্থান করছিলেন তখন কুকুরের অত্যাচারে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত হতে হয়। মূর্তিটি সম্ভবতঃ সেই স্মৃতিকেই বহন করছে।

বর্দ্ধমান মহাবীর

[জীবন চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

মধ্যমা পাবা হতে বর্দ্ধমান এলেন রাজগৃহে।

রাজগৃহ তখন মগধের রাজধানীই ছিল না, ছিল পূর্বভারতের একটি প্রখ্যাত সহর। সেখানে তখন রাজত্ব করছেন শ্রেণিক বিম্বিসার। এই শ্রেণিকের প্রিয় মহিষী ছিলেন চেলনা। তিনি বর্দ্ধমানের মামাতো বোন ছিলেন ও শ্রমণোপাসিকা। তাছাড়া রাজপুত্রদেরও অনেকে ছিলেন শ্রমণোপাসক। পার্শ্বনাথ সম্প্রদায়ের অনেক শ্রাবকও তখন বাস করতেন রাজগৃহে। বর্দ্ধমান তাই রাজগৃহে এসে ঈশান কোণস্থিত গুণশীল চৈত্যে অবস্থান করলেন।

বর্দ্ধমানের আসবার খবর পেয়ে রাজগৃহের লোক গুণশীল চৈত্যে ভেঙে পড়ল। শ্রেণিকও এলেন সপরিকরে।

বর্দ্ধমান নিগ্রন্থ ধর্মের উপদেশ দিলেন। প্রথমে নিরূপণ করলেন মুনিধর্ম। তারপর শ্রাবকাচার। মুনিদের জন্য সর্ববিরতি—তাই অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ মহাব্রত। হিংসা, অসত্য, চৌর্য, অব্রহ্মচর্য ও পরিগ্রহ তাদের সর্বথা পরিত্যাগ করতে হবে। শ্রাবকদের জন্যও অবশ্য সেই নিয়ম তবে তাদের ছুট দেওয়া হল। তাই আংশিক বা দেশ বিরতি—অণুব্রত। তারাও সেই একই ব্রত পালন করবে তবে স্থূলভাবে।

তবে লক্ষ্য সেই এক। তাই শ্রাবকাচারে বর্দ্ধমান আরো যুক্ত করে দিলেন শিক্ষা ও গুণব্রত। গুণব্রতে অণুব্রতকে আরো পরিশুদ্ধ করা ও শিক্ষাব্রতে মুনিধর্ম গ্রহণের জন্য নিজেকে আরো প্রস্তুত করা।

বর্দ্ধমান কুশলী সংগঠক ছিলেন। তাই একসূত্রে গেঁথে দিয়ে গেলেন তাঁর সংঘের দুইটি অঙ্গ : গৃহী ও মুনি, শ্রাবক ও শ্রমণ।

বর্দ্ধমানের উপদেশ অনেককেই আকৃষ্ট করল। আকৃষ্ট করল কারণ, বর্দ্ধমান ধর্মকে মুক্ত করলেন দেববাদের নাগপাশ হতে। মুক্তি দয়ার দান নয়, মুক্তি মানুষের জন্মগত অধিকার, তাকে অর্জন করতে হয় নিজের প্রচেষ্টায়, আত্মার নির্মাণে। সেখানে পুরোহিতের কোন ভূমিকাই নেই।

ধর্মজগতে এ এক রক্তহীন বিপ্লব। মনুষ্যত্বের এ এক নবীন উজ্জীবন। এরই আকর্ষণে মগধবাসীদের অনেকেই সেদিন তাঁর ধর্ম গ্রহণ করল। কেউ শ্রমণ ধর্ম, কেউ শ্রাবক ধর্ম।

শ্রমণ ধর্মগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন রাজপুত্র মেঘকুমার ও নন্দীসেন। দুই বিচিত্র জীবন। এই দুই জীবনকে বর্দ্ধমান যেভাবে পরিচালিত করে ছিলেন তা হতে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাঁর লোক শিক্ষা দেবার পদ্ধতি, যা বাধ্য করে না উদ্বুদ্ধ করে, পরমুখাপেক্ষী করে না, নির্ভরতা আনে।

শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করার পর গুণশীল চৈত্যে রাত্রে শুয়ে আছেন রাজকুমার মেঘ। দীক্ষায় সর্বকনিষ্ঠ তাই সকলের শেষে তাঁর শয্যা।

হঠাৎ পাদস্পৃষ্ট হওয়ায় তাঁর ঘুম ভেঙে গেল।

সেই যে ঘুম ভাঙল, সেই ঘুম তাঁর আর এলো না। তাঁর মাথার মধ্যে নানান চিন্তা ঘুরতে লাগল। ঘুরতে লাগল কারণ তিনি যে রাজকুমার সেকথা তিনি তখনো ভুলতে পারেন নি।

মেঘকুমার ভাবলেন সাধুদের এ ইচ্ছাকৃত অবহেলা। বর্দ্ধমানও কি ইচ্ছা করলে তাঁকে একটু ভালো জায়গায় শুতে দিতে পারতেন না। তা নয় দিয়েছেন সকলের শেষে দরজার কাছে। তাই রাত্রে বয়োবৃদ্ধ সাধুদের কেউ উঠে যখন বাইরে যাচ্ছেন তখন তাকে মাড়িয়ে যাচ্ছেন।

ভাবতে ভাবতে মেঘকুমারের মাথা গরম হয়ে উঠল। তিনি শেষ পর্যন্ত নির্ণয় করলেন এভাবে মুনি ধর্ম পালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তার চাইতে সংসার আশ্রমেই আবার ফিরে যাওয়া ভাল।

মেঘকুমার সেকথা বলবার জন্যই তাই পরদিন সকালে বর্দ্ধমানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

মেঘকুমারের মনোভাব বর্দ্ধমানের অজ্ঞাত ছিল না। তাই তাকে তাঁর কাছে এসে চুপ করে দাঁড়াতে দেখে বলে উঠলেন, মেঘকুমার, তুমি এক দিনেই

সংযম পালনে ধৈর্য হারিয়ে ফেললে? কিন্তু তুমি ত এমন দুর্বলচিত্ত ছিলে না। তোমার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ কর।

মেঘকুমারের চোখের সামনে হতে তখন যেন বিস্মরণের কালো পর্দাটা সরে গেল। সেখানে ফুটে উঠল এক স্নিগ্ধ নীলাভ আলো। সেই নীলাভ আলোয় সে দেখল এক প্রকাণ্ড বন। সেই বনে যেন আগুন লেগেছে। সেই আগুনে বড় বড় গাছ পুড়ছে, ছোট ছোট গাছ, ঝোঁপ ঝাড় জঙ্গল। ক্রমশঃ সেই আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। লাল হয়ে উঠল আকাশ। দেখল বনের পশুরা প্রাণ ভয়ে চারদিকে ছুটছে। প্রথমে হাতীর দল গেল তারপর বুনো মোষ, শিয়াল, হরিণ, এক ঝাঁক বনটিয়া তারপর আর এক ঝাঁক। দেখল তারা সবাই নদীর ধারে এসে ভীড় করেছে। সেখানে স্বল্পপরিসর একটুখানি জায়গা। দেখতে দেখতে তা পশুতে পাখীতে ভরে গেল। সকলের শেষে সে দেখল এলো এক যুথভ্রষ্ট হাতী। জায়গা বলতে তখন আর কিছু ছিল না। সে কোন মতে এক কোণে এসে দাঁড়াল। কিন্তু পা নাড়বার তার উপায় নেই।

অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল তারপর এক সময় গা চুলকোবার জন্যই সে যেন পা তুলল।

সে পা তুলল আর সেই অবসরে যেখানে তার পা ছিল সেখানে এসে আশ্রয় নিল এক অল্পপ্রাণ খরগোস।

গা চুলকিয়ে হাতীটি যখন মাটিতে পা রাখতে যাবে তখন তার চোখে পড়ে গেল সেই খরগোসটি। হাতীর মনে দয়ার উদ্রেক হল। মাটিতে পা রাখলে খরগোসটির মৃত্যু হবে ভেবে সে তিন পায়ে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ সেই আগুন জ্বলল।

তারপর যখন সেই দাবাগ্নি নিভে গেল ও বনের পশুরা নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গেল তখন সে তার পা নাবিয়ে মাটিতে রাখতে গেল। কিন্তু সেই পা সে মাটিতে রাখতে পারল না। তার পা অসাড় হয়ে যাওয়ায় ধপ করে সেখানেই সে পড়ে গেল।

ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হয়ে সেই হাতীটি সেইখানে পড়ে রইল। নদীর জল এতো কাছে তবু সেখানে গিয়ে জল খাবার তার শক্তি নেই। তরুণা—

যদি বৃষ্টি হয়। করুণ চোখে সে তাই আকাশের দিয়ে চেয়ে রইল। কিন্তু এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল না। সে তাই আগুনে পোড়া বনের ধারে নদীর তীরে এভাবে পড়ে রইল। তারপর এক সময় তার মৃত্যু হল।

মেঘকুমারের চোখে জল ভরে এসেছিল। বর্দ্ধমান তার দিকে চেয়ে বললেন, মেঘকুমার পূর্বজন্মে তুমি ওই হাতী ছিলে। অল্পপ্রাণ খরগোসের জন্য তোমার মনে দয়ার উদ্রেক হয়েছিল তাই তুমি এজন্মে রাজপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছ। মেঘের প্রত্যাশা করে তুমি মারা গিয়েছিলে তাই তোমার মায়ের মেঘের দোহদ হয়েছিল যার জন্য তোমার নাম রাখা হয় মেঘকুমার।

মেঘকুমারের চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠল। পশুজীবনে সে যদি একটা নগণ্য প্রাণীর জীবন রক্ষার জন্য এতখানি ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে থাকতে পারে তবে মনুষ্য জীবনে সে কি সামান্য পা মাড়িয়ে দেওয়ায় এতখানি অধৈর্য হয়ে উঠবে?

বর্দ্ধমান মেঘকুমারের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, মেঘকুমার, তুমি কি সংসারাশ্রমে ফিরে যাবে?

মেঘকুমারের সমস্ত ভাবনার তখন জট খুলে গেছে। সে বর্দ্ধমানের চরণ স্পর্শ করে বলল, না ভগবন্, না।

রাজপুত্র নন্দীসেন এসেছে বর্দ্ধমানের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করতে।

বর্দ্ধমান তার দিকে চেয়ে বললেন, নন্দীসেন, তোমার জাগতিক সুখভোগ এখনো বাকী রয়েছে, তা ক্ষয় করে এসো, তোমায় আমি দীক্ষা দেব।

কিন্তু নন্দীসেন সেকথা কানে নিল না। বলল, ভগবন্, আমার সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেছে। জাগতিক সুখভোগে আমার এতটুকু আসক্তি নেই।

বর্দ্ধমান বললেন, নন্দীসেন, তোমায় আমি নিরুৎসাহ করতে চাই না, তবু আর একবার ভেবে দেখো।

নন্দীসেন বলল, আমি সমস্ত ভাবনা শেষ করে এসেছি। আমায় গ্রহণ করুন।

বর্দ্ধমান বললেন, বেশ তবে তাই হবে।

নন্দীসেন চলে যেতে গৌতম প্রশ্ন করলেন বর্দ্ধমানকে। ভগবন্, আপনি

যখন সকলকে চারিত্র গ্রহণ করবার জন্য অনুপ্রাণিত করছেন তখন কেন নন্দীসেনকে নিরস্ত করতে চাইলেন ?

প্রত্যুত্তরে বর্দ্ধমান বললেন, গৌতম, সংসারে তিনরকমের কামী হয়: মন্দকামী, মধ্যকামী ও তীব্রকামী। মন্দকামীর কামবাসনা অল্প। তীব্র নিমিত্ত উপস্থিত না হলে তা জাগ্রত হয় না। সে তাই সহজেই সংযম পালন করতে পারে। স্ত্রীলোক হতে সে যদি দূরে থাকে তবে তার কামবাসনা জাগ্রত হবে না। সে শ্রমণ হতে পারে।

যারা মধ্যকামী তাদের যেমন স্ত্রীলোক হতে দূরে থাকতে হয় তেমনি কঠোর তপশ্চর্যাও করতে হয়। এদেরো শ্রমণ হতে বাধা নেই যদি তারা তপঃনিরত থাকে। সংসারের শতকরা পঁচানব্বুই জনই মধ্যকামী।

কিন্তু যারা তীব্রকামী তাদের ভোগবাসনা ভোগছাড়া উপশান্ত হয় না। তাদের শরীরের গঠনই এই রকম যে ইচ্ছে করলেও তারা কাম বাসনা জয় করতে পারে না, তপশ্চর্যাতেও না। নন্দীসেন তীব্রকামী। তাই তার এখুনি শ্রমণ হওয়া উচিত হয়নি। নন্দীসেনের মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়েছে তবু যখন তার কাম বাসনার উদয় হবে তখন সে নিজেকে দমন করতে পারবে না। তাই তাকে আমি নিষেধ করেছিলাম।

ভদন্ত, তবে তাকে আপনি আবার শ্রমণ সংঘে গ্রহণ করলেন কেন ?

গৌতম, এই জন্যই তাকে গ্রহণ করলাম যে সে চারিত্র হতে বিচ্যুত হলেও তীব্র শ্রদ্ধার জন্য সম্যকত্ব হতে বিচ্যুত হবে না। সেই সম্যকত্বই তাকে একদিন আবার চারিত্রে ফিরিয়ে আনবে।

হোলও ঠিক তাই। নন্দীসেন ভিক্ষাচর্যায় গিয়ে একদিন প্রেমে পড়ে গেল এক গণিকার। গণিকার চোখের জলে তার সংযমের বেড়া রইল না। সে তাই শ্রমণবেশ পরিত্যাগ করে তার সঙ্গে জাগতিক সুখভোগে লিপ্ত হল। লিপ্ত হল কিন্তু সম্যকত্ব হতে সে বিচ্যুত হল না। তাই যেদিন তার ভোগ বাসনা উপশান্ত হল, সেদিন সে আবার বর্দ্ধমানের কাছে ফিরে এল।

তীর্থংকর জীবনের প্রথম চাতুর্মাস্য বর্দ্ধমান রাজগৃহেই ব্যতীত করলেন। তারপর বর্ষাকাল অতীত হতে বিদেহের পথে এলেন ব্রাহ্মণ-কুণ্ডপুর।

এই ব্রাহ্মণ-কুণ্ডপুরেই বাস করেন ব্রাহ্মণ ঋষভদত্ত ও ব্রাহ্মণী দেবানন্দা। এই দেবানন্দার কুক্ষীতেই তিনি প্রথম অবতরণ করেছিলেন।

বর্দ্ধমানের আসবার সংবাদ পেয়ে তাঁকে বন্দনা করতে এলেন ব্রাহ্মণ ঋষভদত্ত ও ব্রাহ্মণী দেবানন্দা। ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুর হতে এল তাঁর জামাতা জমালি ও কন্যা প্রিয়দর্শনা। ভগবানের উপদেশ সভায় তাঁরাও শুনলেন নিগ্রর্ন্থ ধর্মের প্রবচন। হৃদয়ে তাঁদের শ্রদ্ধার উদ্রেক হল। তাঁরা সেই সভাতেই নিগ্রর্ন্থধর্ম গ্রহণ করে শ্রমণ হয়ে গেলেন।

বর্দ্ধমান একবছর বিচরণ করলেন বিদেহ ভূমিতে, বর্ষাবাস করলেন বৈশালীতে। তারপর বর্ষাকাল শেষ হতে গেলেন বৎস ভূমির দিকে নিগ্রর্ন্থ ধর্ম তাঁকে প্রচার করতে হবে। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে কোথাও একস্থানে অবস্থান করবার তাঁর উপায় নেই।

বৎসের রাজধানী তখন কৌশাম্বী। বর্দ্ধমান কৌশাম্বীর বহিঃস্থিত চন্দ্রাবতরণ চৈত্যে এসে অবস্থান করলেন।

কৌশাম্বীতে তখন রাজত্ব করেন উদয়ন। এই সেই উদয়ন যাঁর সম্বন্ধে কালিদাস বলেছিলেন: 'উদয়ন কথাকোবিদ্ গ্রামবৃদ্ধান্'। উদয়ন কথা নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে চারচারটী বিখ্যাত নাটক রচিত হয়েছে: ভাসের 'স্বপ্ন-বাসবদত্তম্', ও 'প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণম্' ও হর্ষের 'প্রিয়দর্শিকা' ও 'রত্নাবলী'।

অবশ্য উদয়ন তখন ছোট ছিলেন। তাই তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর মা মৃগাবতী তখন রাজ্য পরিচালনা করছিলেন।

মৃগাবতী ছিলেন বৈশালী নায়ক চেটকের মেয়ে, সাংসারিক সম্পর্কে বর্দ্ধমানের মামাতো বোন। তাই তাঁর আসবার খবর পেয়ে উদয়নকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তাঁকে বন্দনা করতে এলেন।

সঙ্গে এলেন আরো শ্রমণোপাসিকা জয়ন্তী। জয়ন্তী মৃগাবতীর ননদ, উদয়নের পিসী, স্বর্গীয় রাজা সহস্রানীকের মেয়ে, শতানীকের বোন।

জয়ন্তীও ছিলেন শ্রমণ ধর্মের উপাসিকা ও ভক্তিমতী। তাঁর গৃহের দরজা সাধু ও শ্রমণদের জন্য ছিল সর্বদাই উন্মুক্ত।

বর্দ্ধমান তাঁদের ধর্মোপদেশ দিলেন। বললেন আত্মজয়ের কথা। বললেন,

নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করো, বাইরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে কী লাভ? যে নিজের ওপর জয়লাভ করে সেই যথার্থ সংগ্রাম-বিজয়ী, সেই যথার্থ সুখী।

আরো বললেন, ক্ষমাবান হও, লোভাদি হতে নিবৃত্ত। জিতেন্দ্রিয় হও ও অনাসক্ত। সদাচারী হও ও ধর্মনিষ্ঠ।

সংসার প্রবাহে ভাসমান জীবের জন্য ধর্মই একমাত্র দ্বীপ, আশ্রয় ও শরণ।

বর্দ্ধমানের উপদেশ সবাইকে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে জয়ন্তীকে। তাই যখন সকলে চলে গেল তখনো তিনি বসে রইলেন। নানাবিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন বর্দ্ধমানকে। শেষে এক সময়ে বললেন, ভগবন্, ঘুমিয়ে থাকা ভালো না জেগে থাকা?

বর্দ্ধমান প্রত্যুত্তর দিলেন, কারু ঘুমিয়ে থাকা ভালো, কারু জেগে থাকা।

ভগবন্, সে কি রকম?

জয়ন্তী, যারা অধার্মিক, অধর্ম আচরণ করে, অধর্ম যাদের প্রিয় তাদের ঘুমিয়ে থাকা ভালো। কারণ তারা যদি ঘুমিয়ে থাকে তবে তারা অন্যের দুঃখ, শোক ও পরিতাপের যেমন কারণ হয় না তেমনি নিজেদেরো আরো অধোগতিতে নিক্ষেপ করে না। অপরপক্ষে যারা ধার্মিক, ধর্ম আচরণ করে, ধর্ম যাদের প্রিয়, তাদের জেগে থাকাই ভালো। কারণ তারা যদি জেগে থাকে তবে তারা যেমন অন্যের দুঃখ, শোক ও পরিতাপের কারণ না হয়ে তাদের ধর্মপথে চালিত করে তেমনি নিজেদেরো আরো উন্নতি সাধন করে।

জয়ন্তী বললেন, ভগবন্, জীবের দুর্বল হওয়া ভালো না সবল হওয়া?

বর্দ্ধমান বললেন, জয়ন্তী, কারু দুর্বল হওয়া ভালো কারু সবল হওয়া।

ভগবন্, সে কি রকম?

জয়ন্তী, যারা অধার্মিক, অধর্ম আচরণ করে, অধর্ম যাদের প্রিয়, তাদের দুর্বল হওয়াই ভালো। কারণ তারা যদি দুর্বল হয় তবে তারা অন্যের দুঃখ, শোক ও পরিতাপের যেমন কারণ হয় না তেমনি নিজেদেরো আরো অধোগতিতে নিক্ষেপ করে না। অপরপক্ষে যারা ধার্মিক, ধর্ম আচরণ করে, ধর্ম যাদের প্রিয় তাদের সবল হওয়াই ভালো। কারণ তারা যদি সবল হয় তবে তারা যেমন অন্যের দুঃখ, শোক ও পরিতাপের কারণ না হয়ে তাদের ধর্মপথে চালিত করে তেমনি নিজেদেরো আরো উন্নতি সাধন করে।

জয়ন্তী বললেন, ভগবন্, জীবের অলস হওয়া ভালো না উত্তমী ?

বর্দ্ধমান বললেন, জয়ন্তী, কারু অলস হওয়া ভালো কারু উত্তমী।

সে কি রকম ?

জয়ন্তী, যারা অধার্মিক, অধর্ম আচরণ করে, অধর্ম যাদের প্রিয় তাদের অলস হওয়াই ভালো। কারণ তারা যদি অলস হয় তবে তারা যেমন অন্যের দুঃখ, শোক ও পরিতাপের কারণ হয় না তেমনি নিজেদেরো আরো অধোগতিতে নিক্ষেপ করে না। অপরপক্ষে যারা ধার্মিক, ধর্ম আচরণ করে, ধর্ম যাদের প্রিয় তাদের উত্তমী হওয়াই ভালো। কারণ তারা যদি উত্তমী হয় তবে তারা যেমন অন্যের দুঃখ, শোক ও পরিতাপের কারণ না হয়ে তাদের ধর্মপথে চালিত করে তেমনি নিজেদেরো আরো উন্নতি সাধন করে।

জয়ন্তী এ ধরণের আরো বহু প্রশ্ন করলেন, বর্দ্ধমানও তার সদুত্তর দিলেন।

প্রশ্ন, দুই-ই কি করে ভালো হয় ? জেগে থাকাও ভালো, ঘুমিয়ে থাকাও ভালো, দুর্বলতাও ভালো, সবলতাও ভালো, আলস্যও ভালো, উত্তমও ভালো।

এইখানে বর্দ্ধমানের জীবন দর্শন। সত্য একরূপী নয়, বহুরূপী। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে যাচাই করলেই তবে সত্যের সত্যিকার রূপ ধরা পড়ে।

প্রশ্ন তাই কোন অপেক্ষায় সত্য ?

একই জায়গায় যখন গাছকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি তখন গাছ অচল কিন্তু যখন দেখি তার শাখাপ্রশাখা পত্রপল্লবের বিস্তার, মাটির নীচে শেকড়ের তলবীথি তখন গাছ চঞ্চল।

গাছ চঞ্চল না অচল ?

দুই-ই। কোন একটি অপেক্ষায় !

এই বর্দ্ধমানের অনেকান্ত দর্শন।

অনেকান্ত দর্শনই জৈন দর্শন, জৈন দর্শনই অনেকান্ত দর্শন।

বিভিন্ন ধর্ম, মত ও মতবাদের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার এক অভিনব সূত্র। বর্দ্ধমানের যুগান্তকারী অবদান। বিংশ শতাব্দীর সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রথম উদ্‌ঘোষণা।

[ক্রমশঃ

জৈন-মূর্তিতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পূরণচাঁদ নাহার

[স্বর্গত পূরণচাঁদ নাহারের (১৫ মে ১৮৭৫—৩১ মে ১৯৩৬) জৈন-মূর্তিতত্ত্ব রাধানগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশনের (১৩৩১) দ্বিতীয় দিবসে (৭ই বৈশাখ) ইতিহাস শাখায় পঠিত হয়। উল্লিখিত অধিবেশনের কার্যবিবরণে 'পঠিত প্রবন্ধাদির সারাংশ' অধ্যায়ে লেখা হয় :

'৬। জৈন-মূর্তিতত্ত্ব। লেখক—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম এ, বি এল।

এই প্রবন্ধে জৈন দেবদেবীগণের মূর্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। জৈনগণ তাঁহাদের উপাস্য দেবদেবী ও ধর্মাচার্যগণের মূর্তি নির্মাণ করিয়া উপাসনা করেন। দেবগণের মধ্যে আবার নানাবিধ বিভাগ আছে। উর্দ্ধলোক, অধোলোক ও তির্যকলোক-ভেদে এই সকল দেবগণ ১৯৮ প্রকার বিভাগে বিভক্ত। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় প্রথমেই এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। পরে মূর্তি প্রস্তুতের উপাদান, মূর্তির স্থাপন-প্রণালী, শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ভেদে মূর্তির আভরণ পার্থক্য, দেশভেদে মূর্তি ও তাহার অর্চনা প্রণালীর পার্থক্য, সম্প্রদায় ভেদে মূর্তি-স্থাপনের পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিয়া 'প্রবচন সারোদ্ধার' নামক গ্রন্থ হইতে তীর্থংকরগণের শাসন-যক্ষযক্ষিণীর বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বিবরণে চতুর্বিংশতি যক্ষ ও চতুর্বিংশতি যক্ষিণীর নাম, আকার, বর্ণ, বাহন, আয়ুধ প্রভৃতির বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।'—কার্যবিবরণ, পৃঃ ৬৯।

দীর্ঘকাল পরে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার পঁয়ত্রিশ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (মাঘ-চৈত্র, ১৩৩৫) জৈন-মূর্তিতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রথম মুদ্রিত হয়।

—সম্পাদক, শ্রমণ]

এদেশের মূর্তিতত্ত্ব (Iconography ও Iconology) সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিদ্বানেরা যেরূপ গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করিতেছেন, তাহার তুলনায় আধুনিক কয়েকখানি গ্রন্থ ব্যতীত এ বিষয়ের এযাবৎ উল্লেখযোগ্য কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস বা বিবরণ এদেশে প্রকাশিত হয় নাই। আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর মহাশয়, যিনি এই সম্মিলনীর ইতিহাস-শাখার সভাপতির স্থান অলঙ্কৃত করিতেছেন, তিনি আমাকে জৈন-মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিবার জন্য কয়েকবার বলিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। এবার তাঁহারই আগ্রহে আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি লিখিবার প্রয়াস করিয়াছি। আমার এই প্রথম উদ্যমের ত্রুটি সহৃদয় পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

যে দেবতাকে ভক্তি ও পুজা করা আবশ্যক, সেই দেবতার প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া ইষ্ট সিদ্ধ করাই মূর্তিতত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য। জৈনেরা তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতার ও ধর্মাচার্যদিগের প্রতিমা ব্যতীত চরণ ও চরণ-চিহ্নেরও অর্চনা করিয়া থাকেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সাধারণতঃ যে কয়প্রকার জৈন দেবমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইবে।

জৈন-মূর্তি তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে জৈন দেবতত্ত্ব জানা আবশ্যক। তজ্জন্য আশাকরি, তাঁহাদিগের উপাস্য তীর্থংকর অর্থাৎ অর্হন্ত দেবগণ ব্যতীত জৈন মতে দেব ভেদ সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জৈন শাস্ত্রানুসারে সর্বপ্রকার দেবতাগণের বিভাগ এইরূপ বর্ণিত আছে: উর্ধ্বলোকে—(১) বৈমানিক বারপ্রকার, (২) কিল্‌বিষ তিন প্রকার, (৩) লোকান্তিক নয় প্রকার, (৪) গ্রৈবেয়ক নয় প্রকার, (৫) অনুত্তরবিমান পাঁচ প্রকার। অধোলোকে—(১) ভুবনপতি দশ প্রকার, (২) পরমাধার্মিক পনের প্রকার, (৩) ব্যন্তর ও বানব্যন্তর যোল প্রকার। তির্যক্‌লোকে— (১) জ্যোতিষ্ক দশ প্রকার ও (২) তির্যক্ জৃম্ভক দশ প্রকার; মোট ৯৯ প্রকার এবং পর্যাপ্ত ও অপর্যাপ্তভেদে সর্বসমষ্টি ১৯৮ প্রকার দেববিভাগ আছে। উপরি উক্ত দেববিভাগের ব্যন্তর বিভাগে যক্ষ ও যক্ষিণীরাই তীর্থংকর-দেবের বিশেষ-ভাবে সেবা করিয়া থাকেন বলিয়া জৈন মন্দিরে ঐ সেবক ও সেবিকা দেব-দেবীদিগের মূর্তি স্থাপন পূর্বক পুজা হইয়া থাকে।

উপরি উক্ত দেব-বিভাগের মধ্যে বৈমানিক দেবগণের নাম যথাক্রমে এই : (১) সৌধর্ম, (২) ঈশান, (৩) সনৎকুমার, (৪) মাহেন্দ্র, (৫) ব্রহ্ম, (৬) লান্তক, (৭) মহাশুক্র, (৮) সহস্রার, (৯) আনত, (১০) প্রাণত (১১) আরণ, (১২) অচ্যুত।

ভুবনপতি দেবগণের বিভাগ যথাক্রমে এইরূপ : (১) অসুরকুমার, (২) নাগকুমার, (৩) সুবর্ণকুমার, (৪) বিদ্যুৎকুমার, (৫) অগ্নিকুমার, (৬) দ্বীপ-কুমার, (৭) উদধিকুমার, (৮) দিক্‌কুমার, (৯) বস্থকুমার ও (১০) স্তনিত-কুমার।

ব্যন্তর দেবগণের নাম যথাক্রমে এইরূপ : (১) পিশাচ, (২) ভূত, (৩) ঋষিবাদী, (৪) ভূতবাদী, (৫) কন্দী, (৬) মহাকন্দী (৭) কোহণ্ডি, (৮) পয়ঙ্গি।

উপরিউক্ত পিশাচ, ভূত, ও যক্ষাদিরও অনেক প্রকার বিভাগ আছে। যথা, পিশাচ পনের প্রকার, ভূত নয় প্রকার, যক্ষ তের প্রকার, রাক্ষস সাত প্রকার, কিন্নর দশ প্রকার, কিম্পুরুষ দশ প্রকার, মহোরগ দশ প্রকার, গন্ধর্ব বার প্রকার।

জ্যোতিষ্ক দেবগণের—(১) সূর্য, (২) চন্দ্র, (৩) গ্রহ, (৪) নক্ষত্র ও (৫) তারকা, এই পাঁচটি প্রধান বিভাগ পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত দেবগণের বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহণী সূত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু সাধারণতঃ জৈন মন্দিরে উপরিউক্ত সামান্য দেবগণের মূর্তি থাকে না। যে সমস্ত মূর্তি সচরাচর পাওয়া যায়, তাহাই নিয়ে আলোচনা করিতেছি।

জৈনশাস্ত্রোক্ত বর্ণনানুসারে মূর্তি প্রস্তুতপূর্বক প্রতিষ্ঠা করাইয়া, দেবালয় অথবা অপর পবিত্র স্থানে বিধিমত স্থাপন করিয়া, শ্রাবক ও শ্রাবিকারা ভক্তি-পূর্বক পূজা ও উপাসনা করিয়া থাকেন। সচরাচর জৈনমূর্তিগুলি স্ফটিক, মরকত ইত্যাদি রত্নের ও নানাপ্রকার পাষাণ, ধাতু ও কাষ্ঠ ইত্যাদি উপাদানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। জৈন মন্দিরে বর্তমান যুগের ২৪ জন তীর্থংকরের মধ্যে কোন একজন তীর্থংকরের মূর্তি 'মূলনায়ক' করিয়া বেদীর সর্বোচ্চস্থানে স্থাপন করা হয় ও অন্যান্য তীর্থংকরের মূর্তি বেদীর অন্যান্য স্থানে স্থাপন করা হয়। হিন্দুদিগের দেবমূর্তি প্রধানতঃ চল, অচল ও চলাচল, এই তিন ভাগে বিভক্ত।

কিন্তু জৈনমূর্তির এরূপ বিভাগ নাই। তাহাদের মধ্যে আবশ্যক হইলে সমস্ত-গুলিই চল এবং অনুষ্ঠান দ্বারা সেই ভাবে স্থাপনা করিলে সর্বপ্রকার বিগ্রহই অচল হইতে পারে।

জৈন তীর্থংকর অর্থাৎ অর্হন্ত মূর্তিগুলি প্রধানতঃ পদ্মাসন-মুদ্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। তীর্থংকরদিগের কায়োৎসর্গমুদ্রার বিগ্রহ অর্থাৎ দণ্ডায়মান মূর্তিও প্রচলিত আছে। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের জৈনমূর্তিগুলির মধ্যে প্রভেদ এই যে, দিগম্বর জৈনদিগের তীর্থংকর মূর্তিগুলি বস্ত্রহীন অর্থাৎ দিগম্বর, শ্বেতাম্বর মূর্তিগুলির কটিদেশে সূত্রচিহ্ন ও কৌপীনের চিহ্ন থাকে। এতদ্ব্যতীত ভারতের দক্ষিণপ্রান্তের কোন কোন জৈন মন্দিরে তীর্থংকরের অর্দ্ধপদ্মাসন মূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের জৈন মন্দিরে তীর্থংকরগণের আর একপ্রকার চতুর্মুখ বিগ্রহ পূজা হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে এই চতুর্মুখের, অর্থাৎ সম্মুখে ও পশ্চাদ্ভাগে, দক্ষিণে ও বামভাগে চারিটি তীর্থংকরদেবের মূর্তিগুলির মধ্যভাগে একটি অশোকবৃক্ষ স্থাপন করা হয়। শ্বেতাম্বর মন্দিরে সহস্র-কূটমূর্তি অর্থাৎ একটি ফলকে শতাধিক তীর্থংকর মূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। দুই পার্শ্বে দুইটি কায়োৎসর্গমুদ্রার উপরিভাগ, দুইটি পদ্মাসন ও মধ্যে আর একটি পদ্মাসন, এই পাঁচটি মূর্তি সাধারণতঃ অষ্টধাতুতে প্রস্তুত করা হয়, ইহার নাম পঞ্চতীর্থ। এই ২৪টি তীর্থংকরের মূর্তি অষ্টধাতুতে থাকিলে তাহাকে চৌবিশী পট্ট অর্থাৎ চতুর্বিংশতি পট্ট বলা হয়। প্রায় সমস্ত জৈন মন্দিরে সিদ্ধচক্র বা নবপদের পূজা হইয়া থাকে। ইহাতে (১) অর্হন্ত ও সিদ্ধের দুইটি পদ্মাসনমুদ্রায় মূর্তি, (২) আচার্য, উপাধ্যায় ও সাধু এই তিনটি উপদেশমুদ্রার মূর্তি ও (৩) চারিটি প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ ঈশান, অগ্নি, নৈঋত ও বায়ুকোণে যথাক্রমে দর্শন, জ্ঞান, চারিত্র্য ও তপ—এই চারিটির স্থাপনা থাকে। প্রাচীন জৈন মূর্তি মধ্যে কল্পবৃক্ষসহ পূর্বযুগের যুগলিক মূর্তিও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক মন্দিরেই দুইটি বা ততোধিক ইন্দ্রদেবের বা ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর মূর্তি, মূল মন্দির-দ্বারের উভয় পার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্তিগুলির হস্তে সচরাচর চামর থাকে। কোন কোন স্থলে দ্বার রক্ষক দেবতাদিগের হস্তে স্থূল যষ্টি ও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রত্যেক শ্বেতাম্বর জৈনমন্দিরে এক বা ততোধিক ভৈরব বা দ্বারপালের

স্থাপনা থাকে। দ্বারপাল চারি প্রকার: পূর্বে কুমুদ, দক্ষিণে অঞ্জন, পশ্চিমে বামন ও উত্তর দিকে পুষ্পদন্ত। সাধারণতঃ কেবল একটি নারিকেল বসাইয়া তৈল ও সিন্দুর দ্বারা ক্রমে ক্রমে আয়তন বর্দ্ধিত করা হয়। দিগম্বর সম্প্রদায়েরা তাঁহাদিগের মন্দিরে ভৈরবের স্থাপন কি পূজা করেন না; তীর্থংকরের মাতা-গণের মূর্তিও কোন কোন মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত হিন্দুমূর্তিগুলির ন্যায় জৈনমন্দিরে সরস্বতী ও লক্ষ্মীদেবীর মূর্তিপূজাও দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্ট মাঙ্গলিক (স্বস্তিক, নন্দ্যাবর্ত, মৎস্যযুগল, দর্পণ, সিংহাসন, কুম্ভকলস, শ্রীবৎস ও সম্পুট) অধিকাংশ শ্বেতাম্বর মূল মন্দিরের দ্বারের শিরোভাগে খোদিত থাকে। কোথাও বা এই দ্বারের মধ্যভাগে একটি পদ্মাসনের জিনমূর্তিও থাকে—যাহাকে মঙ্গলমূর্তি বলা হয়। চতুর্দশ শুভ ও উৎকৃষ্ট স্বপ্ন (যাহা তীর্থংকরের মাতারা গর্ভরাত্রে দেখিয়া থাকেন, যথা: হস্তী, বৃষভ, ইত্যাদি) প্রায় শ্বেতাম্বর মন্দিরে উপযুক্ত স্থানে অঙ্কিত পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত কেবলী, শ্রুত-কেবলী, প্রাচীন ও আধুনিক প্রাভাবিক আচার্যগণের কোথাও বা মূর্তি, কোথাও বা চরণ রক্ষিত ও পূজিত হইয়া থাকে। জৈন উপাস্য দেবীদিগের মধ্যে ষোড়শ বিদ্যাদেবীরও পূজা হইয়া থাকে। তাঁহারা ভুবনপতি দেবজাতীয়, কিন্তু তির্যকলোকে বাস করেন। তাঁহাদিগের নাম যথাক্রমে: (১) রোহিণী, (২) প্রজ্ঞপ্তি, (৩) বজ্রশৃঙ্খলা, (৪) বজ্রাঙ্কুশা, (৫) চক্রেশ্বরী, (৬) পুরুষদত্তা, (৭) কালী, (৮) মহাকালী, (৯) গৌরী, (১০) গান্ধারী, (১১) সর্বাস্ত্রমহাজ্বালা, (১২) মানবী, (১৩) বৈরোট্যা, (১৪) অচ্ছুপ্তা, (১৫) মানসী, (১৬) মহামানসী। বলাবাহুল্য, হিন্দুদিগের মত জৈনদিগের পূজাতেও নবগ্রহ ও ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্ম ও নগ এই দশ দিক্‌পাল ও সোম, যম, বরুণ, কুবের এই চারিটি লোকপালেরও স্থাপনা করিয়া পূজা হইয়া থাকে। দিক্‌পালগণও ভুবনপতি দেবশ্রেণীর অন্তর্ভূত। এতদ্ব্যতীত নয়টি নিধান-দেবতা ও ৪টি বীর-দেবতার পূজা দেওয়া হয়। নবনিধান ও বীরদেবগণ ব্যন্তর শ্রেণীভুক্ত। নবনিধান দেবগণের নাম যথাক্রমে: (১) নৈসর্প, (২) পাণ্ডুক, (৩) পিঙ্গল, (৪) সর্বরত্ন, (৫) মহাপদ্ম, (৬) কাল, (৭) মহাকাল

(৮) মানব ও (৯) শঙ্খ। বীর-দেবগণের নাম : (১) মানভদ্র, (২) পূর্ণভদ্র (৩) কপিল ও (৪) পিঙ্গল।

প্রসিদ্ধ Indian Antiquary নামক পত্রিকার Vol. XIII এর ২৭৬ পৃষ্ঠায় ডাঃ বার্জেস সাহেব লিখিয়াছেন যে, জৈনদিগের প্রত্যেক তীর্থংকরের দুইটি করিয়া সেবিকাদেবী (একটি যক্ষিণী ও একটি দেবী) থাকে, ইহা ঠিক নহে। এ বিষয়ে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতভেদ নাই। কেবলমাত্র কয়েকটি নামের ও চিহ্নের ইতরবিশেষ আছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় মতে প্রত্যেক তীর্থংকরের একটি করিয়া যক্ষ ও একটী করিয়া যক্ষিণী থাকে, যক্ষিণী ও দেবী পৃথক্ নহে। ইঁহাদিগকে শাসন-যক্ষ ও শাসন-যক্ষিণী বা দেবী বলা হয়।

পরিশেষে জৈনদিগের একখানি প্রামাণিক ও প্রসিদ্ধ প্রবচনসরোদ্ধার নামক গ্রন্থ হইতে তীর্থংকরগণের শাসন-যক্ষ-যক্ষিনীর বিবরণ, মূল সংস্কৃত ও তাহার বঙ্গানুবাদসহ পাঠকগণের গোচরার্থ উদ্ধৃত করা হইল।

উক্ত গ্রন্থের ষড়্‌বিংশতি ও সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদে এই বর্ণনা আছে। এতদ্ব্যতীত জৈন-মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্বেতাম্বর দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থে বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বারান্তরে তাহা প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

[ক্রমশঃ

জৈন রামায়ণ

রামকথা ভারতবর্ষে যত জনপ্রিয়, এমন বোধ হয় আর কোনো কথাই নয়। তাই রামকথা অবলম্বনে এখানে এক বিরাট সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বাল্মীকির কথা আমরা সকলেই জানি। তিনি প্রথম রামায়ণ রচনা করেন বলে বলা হয়। বাল্মীকি শুধু যে প্রথম রামায়ণ রচনা করেন তাই নয়, তিনি আদি কবি, এবং রামায়ণ সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম কাব্য। এরপর সেই কথাই সামান্য পরিবর্তনে মহাভারত, ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বায়ু-পুরাণ প্রভৃতি পুরাণে গৃহীত হয়েছে। সময়ে সময়ে বিশিষ্ট সম্প্রদায়গুলিও রামকথাকে নিজেদের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছে যার ফলে যোগবাশিষ্ঠ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, আনন্দ রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থের সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীকালের সংস্কৃতি কবিরাও রামকথা অবলম্বনে রঘুবংশ, ভট্টিকাব্য, উদার-রাঘব, প্রতিমা-নাটক, মহাবীরচরিত, উত্তর-রামচরিতের মতো কাব্য নাটকাদি রচনা করেছেন। তামিল তেলেগু, মলয়ালম, কাশ্মীরী, অসমিয়া, বাঙলা, উড়িয়া, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী এমন কি উর্দু, ফারসী প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষাতেও রামায়ণ রচিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের বাইরেও আবার রামকথার প্রচলন দেখা যায়। সিংহল, তিব্বত, খোটান, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশও রাম-কথাবলম্বনে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতবর্ষের কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতেই যে রামায়ণ রচিত হয়েছে তা নয়, বৌদ্ধ ও জৈন শ্রমণ সংস্কৃতিতেও রামায়ণ রচিত হয়েছে। বৌদ্ধ দশরথ জাতকের কথা হয়ত অনেকের জানা আছে, কারণ তা এককালে পণ্ডিত মহলে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। সেইটিই নাকি প্রচালত রামায়ণের আদিতম রূপ। কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্যে পরবর্তীকালে রামকথা তেমন আর রচিত হয়নি। জৈন সাহিত্যে কিন্তু ঠিক এর বিপরীত দেখা যায়। সেখানে রামকথাবলম্বনে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে সে সাহিত্যও ব্রাহ্মণ্য রামায়ণ

সাহিত্যের মতোই বেশ বড়। অথচ সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধি খুব বেশী নয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তাই জৈন রামায়ণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

দশরথ জাতকে ভগবান বুদ্ধকে রামচন্দ্রের পুনরাবতার বলা হয়েছে। পূর্বজন্মে শুদ্ধোধন ছিলেন রাজা দশরথ, রাণী মহামায়া রামের মা, রাহুল মাতা সীতা, প্রধান শিষ্য আনন্দ ভরত, ও সারিপুত্র লক্ষ্মণ। জৈন সাহিত্যে অবশ্য রামকে তীর্থংকর গোত্রের মর্যাদা দেওয়া হয়নি তবে ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষের একজন শলাকাপুরুষ রূপে স্বীকার করা হয়েছে। শলাকাপুরুষ বলতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। চব্বিশ জন তীর্থংকর, বারো জন চক্রবর্তী, নয় জন বলদেব, নয় জন বাসুদেব ও নয় জন প্রতি-বাসুদেব এই নিয়ে জৈনদের ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষ। জৈন সাহিত্যে রাম, লক্ষ্মণ ও রাবণ যথাক্রমে অষ্টম বলদেব, বাসুদেব ও প্রতি-বাসুদেব। নবম বা শেষ বলদেব, বাসুদেব ও প্রতিবাসুদেব বলরাম, কৃষ্ণ ও জরাসন্ধ।

জৈনরা কালচক্রকে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারটি ভাগে ভাগ না করে দুটি ভাগে ভাগ করেন। এক উৎসর্পিণী, দুই অবসর্পিণী। উৎসর্পিণী ক্রমিক অভ্যুদয়ের যুগ, অবসর্পিণী ক্রমিক অবনতির। উৎসর্পিণী ও অব সর্পিণী প্রত্যেককে আবার ছ'টি অর বা ভাগে ভাগ করা হয়। জৈন মান্যতা অনুসারে উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণীর তৃতীয় ও চতুর্থ অরে ২৪ জন তীর্থংকর, ১২ জন চক্রবর্তী, ৯ জন বলদেব, ৯ জন বাসুদেব ও ৯ জন প্রতি-বাসুদেব জন্ম গ্রহণ করেন। বলদেব, বাসুদেব ও প্রতি-বাসুদেব প্রায় একই সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বাসুদেব তাঁর বড় ভাই বলদেবের সাহায্যে প্রতি-বাসুদেবকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করে ভারতবর্ষের তিনটি খণ্ডের ওপর আধিপত্য লাভ করেন ও অর্দ্ধচক্রবর্তী রাজা হন। (চক্রবর্তী রাজা ভারতবর্ষের ছ'টি খণ্ডের ওপর আধিপত্য করেন।*) মৃত্যুর পর বাসুদেব প্রতি-বাসুদেবকে হত্যা

---

* জৈন ভূগোলে ভারতবর্ষ হিমবান পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত ও অর্দ্ধ চন্দ্রাকার লবণ সমুদ্র দ্বারা তিন দিকে বেষ্টিত। বৈতাঢ্য পর্বত (বিন্ধ্য) প্রথমতঃ ভারতবর্ষকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুটী ভাগে ভাগ করে। তারপর হিমবান পর্বত নির্গত সিন্ধু ও গঙ্গা বৈতাঢ্য পর্বত অতিক্রম করে পশ্চিম ও পূর্ব লবণ সমুদ্রে পতিত হয়। এভাবে উত্তর ভারতের তিনটী ও দক্ষিণ ভারতের তিনটী মোট ছ'টি ভাগ পাওয়া যায়।

করার জন্য নরকে যান (যেমন লক্ষ্মণ ও কৃষ্ণ)। বলদেব নিজের ভাইয়ের মৃত্যুতে শোকাকুল হয়ে সংসার পরিত্যাগ করেন ও শ্রমণ দীক্ষা নিয়ে তপশ্চর্যায় কর্মক্ষয় করে মৃত্যুর পর মোক্ষপ্রাপ্ত হন (যেমন রাম ও বলরাম)। প্রতি-বাসুদেব বাসুদেবের চক্রে নিহত হন (যেমন রাবণ ও জরাসন্ধ)।

জৈন রামায়ণের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে রাক্ষস ও বানরদের বিদ্যাধর-বংশোদ্ভূত বলা হয়েছে। এরা পশু যোনীর অন্তর্গত বা বীভৎস জীব নন। প্রাচীন বৌদ্ধগাথা, কথাসরিৎসাগর ও মহাভারতে দেখা যায় যে বিদ্যাধরেরা আকাশচারী ও কামরূপী ছিলেন। বোধহয় এই অলৌকিক শক্তির জন্য সেখানে তাঁদের দেবযোনীর অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। কিন্তু জৈন সাহিত্যে তাঁরা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হলেও মানুষমাত্র। এদের উৎপত্তি সম্বন্ধে পউম চরিয়ে যে আখ্যান বিবৃত হয়েছে তা এরূপ: আদি তীর্থংকর ঋষভদেব যখন সংসার পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন তখন তিনি তাঁর রাজ্য তাঁর শত পুত্রের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে যান ও জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসনে স্থাপন করেন। (এই ভরত হতেই আসমুদ্র-হিমাচল এই ভূখণ্ডের নাম হয় ভারতবর্ষ।) পরে তাঁর শ্যালকপুত্রদের দুজন নমি ও বিনমি তাঁর কাছে গিয়ে রাজলক্ষ্মী প্রার্থনা করায় তিনি তাঁদের কতকগুলি বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে বৈতাঢ্য পর্বতে গিয়ে তাঁদের রাজ্য স্থাপনা করতে বলেন। এই নমি ও বিনমি হতে বিদ্যাধর-বংশের উদ্ভব হয়। বিদ্যাধর নামের কারণ এরা কতকগুলি বিদ্যাকে ধারণ করেছিলেন। যে সমস্ত বিদ্যাধরদের গৃহ বা ধ্বজাদিতে বানর চিহ্ন অঙ্কিত থাকত তাঁদের বানর বংশী বিদ্যাধর বলা হত। তাই রামায়ণে যাঁদের বানর বলা হচ্ছে তাঁরাও বিদ্যাধর বংশীয় মানুষ।

ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে যেমন রামায়ণের প্রধানতঃ দুটি রূপ পাওয়া যায়: (১) বাল্মীকি রামায়ণের (২) অদ্ভুত রামায়ণের, জৈন সাহিত্যেও তেমনি দুটি রূপ পাওয়া যায়। (বৌদ্ধ দশরথ জাতকের রূপটী এগুলি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।) প্রথমটি বিমল সূরীর পউম চরিয়ের, দ্বিতীয়টি গুণভদ্রাচার্যের উত্তরপুরাণের। তবে জৈনদের মধ্যে বিমল সূরীর পউম চরিয়েরই প্রচলন বেশী। কারণ এই রূপটি জৈন দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর উভয় সম্প্রদায়ে প্রচলিত। গুণভদ্রের উত্তর পুরাণের প্রচলন কেবলমাত্র দিগম্বরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

বিমলসূরি তাঁর পউম চরিয়ে লিখছেন যে যে পদ্মচরিত (জৈন সাহিত্যে রামের অপর নাম পদ্ম) আচার্য পরম্পরায় প্রচলিত ছিল এবং নামাবলী নিবদ্ধ ছিল তিনি সেই বিষয়বস্তু অবলম্বনে তাঁর পউম চরিয় রচনা করছেন। পউম চরিয়ের রচনাকাল জৈন মতে খৃষ্টীয় ৭২ অব্দ। কিন্তু ভাষার দৃষ্টিতে ডঃ জেকোবি মনে করেন যে পউম চরিয় খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতকের রচনা। সে যা হোক, বাল্মীকি যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের আদি কবি, বিমল সূরী তেমনি প্রাকৃত সাহিত্যের আদি কবি এবং তাঁর পউম চরিয় প্রাকৃত সাহিত্যের প্রথম কাব্য। পউম চরিয়ের ভাষা মহারাষ্ট্রী জৈন প্রাকৃত। এরই রূপান্তর রবিষেণাচার্যকৃত সংস্কৃত পদ্মচরিত (৬০ খৃষ্টাব্দ)। রবিষেণ তাঁর রচনায় মৌলিকত্বের পরিচয় না দিলেও সংস্কৃত ভাষার জন্য রবিষেণের পদ্মচরিতই পরবর্তীকালের জৈন কবিরা আদর্শ রূপে গ্রহণ করেন। হেমচন্দ্রাচার্য তাঁর ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিতের অন্তর্গত রামায়ণে মুখ্যতঃ বিমল সূরী ও রবিষেণকেই অনুসরণ করেছেন। বিমলসূরী ও রবিষেণের অনুসরণে যে জৈন রামকথা মূলক সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে তা এরূপ :

(ক) প্রাকৃত :

(১) বিমলসূরীর পউম চরিয় (খৃঃ ৩-৪ শতক)।

(২) শীলাচার্যকৃত চউপন্নমহাপুরিসচরিয়-র অন্তর্গত রামলক্ষ্মণচরিয়ম্ খৃঃ ৯ম শতক)।

(৩) ভদ্রেশ্বরকৃত কহাবলীর অন্তর্গত রামায়ণম্ (খৃঃ ১১শ শতক)।

(৪) ভুবনতুঙ্গসূরী রচিত সীয়াচরিয় ও রামলক্ষ্মণচরিয়।

(খ) সংস্কৃত :

(১) রবিষেণকৃত পদ্মচরিত (খৃঃ ৬৬০ অব্দ)।

(২) হেমচন্দ্রাচার্যকৃত ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিতের অন্তর্গত জৈন রামায়ণ (খৃঃ ১২ শ শতক)।

(৩) হেমচন্দ্রাচার্যকৃত যোগশস্ত্রের টীকার অন্তর্গত সীত-রাবণ কথানকম্।

(৪) জিনদাসকৃত রামায়ণ বা রামদেব পুরাণ (খৃঃ ১৫শ শতক)।

(৫) পদ্মদেব বিজয়গণিকৃত রামচরিত্র (খৃঃ ৬ষ্ঠ শতক)।

(৬) সোমসেনকৃত রামচরিত (খৃঃ ১৬শ শতক)

(৭) আচার্য সোমপ্রভকৃত লঘুত্রিশষ্টিশলাকাপুরুষচরিত।

(৮) মেঘবিজয়গণিকৃত লঘুত্রিশষ্টিশলাকাপুরুষচরিত (খৃঃ ১৭শ শতক)।

এছাড়া জিনরত্নকোষে চন্দ্রাকীর্তি, চন্দ্রসাগর, শ্রীচন্দ্র, পদ্মনাভ প্রভৃতি রচিত বিভিন্ন পদ্মপুরাণ ও রামচরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলির অধিকাংশই আজো অপ্রকাশিত।

(গ) অপভ্রংশ :

(১) স্বয়ম্ভূরচিত পউম চরিউ বা রামায়ণ পুরাণ (খৃঃ ৮ম শতক)।

(২) রঘুকৃত পদ্মপুরাণ অথবা বলভদ্রপুরাণ (খৃঃ ১৫শ শতক)।

(ঘ) কন্নড় :

(১) নাগচন্দ্ররচিত পদ্মরামায়ণ বা রামচন্দ্রচরিতপুরাণ (খৃঃ ১১শ শতক)।

(২) কুমুদেন্দুকৃত রামায়ণ (খৃঃ ১৬ শতক)।

(৩) দেবপ্পকৃত রামবিজয় চরিত (খৃঃ ১৬ শতক)।

(৪) দেবচন্দ্রকৃত রামকথাবত্তার (খৃঃ ১৮শ শতক)।

(৫) চন্দ্রসাগর বর্ণীকৃত জিন রামায়ণ (খৃঃ ১৯শ শতক)

এছাড়া রাজস্থানী ভাষাতে সীতারাম রাস চৌপাই ইত্যাদি নিয়ে খৃঃ ষোড়শ শতক হতে একাল অবধি যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে তার সংখ্যাও পঞ্চাশের ওপর।

জৈন কথানক সাহিত্যে সংঘদাসকৃত বাসুদেব হিণ্ডিতেও (বাসুদেব ভ্রমণ) সংক্ষিপ্ত রামকথা পাওয়া যায়। তবে তার বিষয়বস্তু অনেকটা বাল্মীকি রামায়ণের মতো। তাই তার নাম উপরোক্ত তালিকায় দেওয়া হয় নি। হরিষেণকৃত কথাকোষেও রামায়ণ কথানকম্, সীতাকথানকম্ লিপিবদ্ধ হয়েছে। সংস্কৃত ললিত সাহিত্যের মতো মৈথিলী কল্যাণ, অঞ্জনা পবনঞ্জয় প্রভৃতি নাটকাদিও জৈন সাহিত্যে রচিত হয়েছে। জৈন রামায়ণ সাহিত্য তাই বলা যায় যে ব্রাহ্মণ্য রামায়ণ সাহিত্যের মতো স্বতন্ত্র আলোচনার দাবী রাখে।

[ক্রমশঃ

সরাক জাতি

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সন ১৩২৫ সাল বোধ হয়। ১৩২৪-ও হইতে পারে। আমি বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির পক্ষে বীরভূম ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ কার্যে বীরভূম ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। রামপুর হাটের পশ্চিমে 'আয়ন' গ্রামের নাম শুনিয়া লৌহ সম্বন্ধীয় কিছু আছে মনে করিয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম পূর্বে সেখানে পাথর হইতে লোহা তৈরী হইত। তাহার নানারকম প্রক্রিয়ার কথা শুনিলাম। লোহা তৈরীর পর যে পোড়া পাথর জমিত তাহার প্রকাণ্ড ধ্বংস স্তূপ দেখিলাম। যাহারা 'শালে' লোহা তৈরী করিত তাহাদের নাম ছিল শালুই। বহু লোকের জীবিকা নির্বাহিত হইত। লোহা বেচিয়া অনেকেরই অবস্থা ফিরিয়াছিল। বিদেশ হইতে লোহা আসিয়া ইহাদের ভাতে ধূলা দিয়াছে। এই লোহা তৈরীর ব্যাপারে পাথরের উপরে যে মাটীর লেপন দেওয়া হইত সেই মাটী আনিতে হইত 'খড়বোনা-কান্দুরী' গ্রাম হইতে। খড়বোনা গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মাটী দেখিলাম।

একটী জাতির কয়েক ঘর মাত্র লোক দেখিলাম, নাম 'সরাক'। তাঁত বুনিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। বিধবাদের বিবাহ হয় না। তাহারা একাদশী করে। আশ্চর্যের বিষয় শিশু ছেলে মেয়ে যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা কেহ মাছ মাংস পিঁয়াজ ডিম খায় না। সম্পূর্ণ নিরামিষাশী জাতি। ইহারা লাঙ্গল ধরে না, চাষ করে না। শূদ্র যাজক ব্রাহ্মণে ইহাদের যজন যাজন করেন।

আমি জানিতাম বৌদ্ধদের দুটী সম্প্রদায় শ্রমণ ও শ্রাবক। আমি বীরভূম বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিলাম ইহারা বৌদ্ধ ছিল। শ্রাবক হইতে শরাক বা সরাক হইয়াছে। লোকে বলে সরাকি তাঁত। পরে জানিয়াছি ইহারা জৈন ছিল। বৌদ্ধগণ মাছ মাংস খাইত, তান্ত্রিক আচার পালন করিত। জৈনগণ সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার করে, ইহাদের উপাধি ছিল সরাওগী। সরাওগী হইতে সরাক হইয়াছে। সংখ্যাল্পতার জন্য হিন্দুদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। বৈবাহিক আদান প্রদানের অসুবিধায় জাতিটা লোপ পাইবে এই আশঙ্কাও প্রকাশ করিয়াছিলাম। জানি না খড়বোনায় এখন 'সরাক' সম্প্রদায় আছে কি না। থাকিলে কয়েক ঘর কি অবস্থায় আছে তাহাও জানি না।

সমরাদিত্য কথা

হরিভদ্র সূরী

[কথাসার]

গুণসেন নিজের পিতামাতার যেমন অত্যন্ত প্রিয় পুত্র ছিল তেমনি ছিল নিজের প্রজাপুঞ্জের একান্ত প্রিয় যুবরাজ। সংযম ও বিনয় তাকে যেন জন্ম হতেই বরণ করে নিয়েছিল। হঠকারী মিত্র ও খোসামোদী পারিষদবর্গ হতে সে থাকত শত যোজন দূরে। কিন্তু তার মধ্যে একটি মাত্র দুর্বলতা ছিল এবং সে দুর্বলতা তার কৌতুকপ্রিয়তা।

জীবনে আনন্দ কৌতুকের স্থান অবশ্যই আছে, এবং থাকাও উচিত। অনেকের অভিমত এই যে আনন্দ হতেই এই সংসারের উদ্ভব হয়েছে এবং আনন্দেই তা বিলীন হবে। কিন্তু সত্য ত এই যে সে আনন্দ নির্দোষ হওয়া চাই। সে আনন্দ যেন অন্যের পীড়াদায়ক না হয় বা তার বৈরবৃত্তিকে যেন জাগ্রত না করে।

কিন্তু গুণসেন একদিন আনন্দের এই সীমারেখার কথা ভুলে গেল। অগ্নিশর্মা নামক এক ব্রাহ্মণ যুবককে দেখা মাত্র তার কৌতুক প্রবৃত্তি এত উদগ্র হয়ে উঠল যে অগ্নিশর্মাও মানুষ—মাটীর পুতুল নয়, তারও ইষ্ট শোক, স্বাভিমান ও প্রতিষ্ঠা বোধ আছে সেকথা তার মনে রইল না।

অগ্নিশর্মাকে দেখা মাত্র গুণসেন তার দিকে আকৃষ্ট হল। এর একটা কারণ এই যে সে অত্যন্ত কুরূপ ছিল। কিন্তু সে তো অগ্নিশর্মার দোষ নয়। অন্য ভাবে দেখলে সে এক অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের পুত্র ছিল। পূর্ব জন্মের কোন কর্মের জন্য তার দেহ এমন আকার লাভ করেছিল যেখানে পশু ও মানব দেহের অদ্ভুত সংমিশ্রণ হয়েছিল। সেই দেহ অন্যের কৌতুক প্রবৃত্তিকে যে জাগ্রত করবে তা স্বাভাবিকই।

তেকোণা মাথার মধ্যে হলুদ রঙের দুটো চোখ তার জ্বল জ্বল করত। নাক তার এত চ্যাপ্টা ছিল যে মনে হত বিধাতা ভুল করে থাপ্পড় মেরে

নাকের দাঁড়াটাকে যেন ভেতরে বসিয়ে দিয়েছেন। কানের জায়গায় ছিল মাত্র দুটো ছিদ্র। তার দাঁত দিনের বেলাতেও ভীতি উৎপন্ন করত। হাত ছিল বাঁকা ও ছোট। পেট মোটা ও গোল। এবং গলা ছিল না বললেই চলে।

কুমার বা ছুতোর মাটি বা কাঠ দিয়ে এর চাইতে আরো যুতসই প্রতিকৃতি অবশ্যই তৈরী করতে পারত। তাই প্রথম দিন তাকে দেখা মাত্রই গুণসেন হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর তার কথায় যখন সে দুলে দুলে নাচল তখন গুণসেন তার পেছনে প্রায় পাগল হয়ে গেল।

তাকে দেখে তার সামনে কেউ হাসে বা মজা করে অগ্নিশর্মার তা একদম পছন্দ ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল তাই এখন সে আর রাগ করত না। সে যেখানে যেখানে যেত বা যে পথ দিয়ে যেত সেখানে তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা হত। অগ্নিশর্মা এখন সে সব শান্ত ভাবে সহ্য করে। সহ্য করে তার কারণ এর প্রতিকারের তার কাছে কোন পথই ছিল না। তার পিতা যজ্ঞদত্তেরও তা ভাল লাগত না। কিন্তু সেই রাজাশ্রিত ব্রাহ্মণের না ছিল শাপ দেবার ক্ষমতা বা অন্য কোন শক্তি। এবং লোকে সে-কথা বেশ ভালো ভাবেই জানত।

প্রথম কিছুদিন অগ্নিশর্মাকে নাচিয়ে রাগিয়ে গুণসেন ও তার বন্ধুরা আনন্দ করল তারপর যখন সে আনন্দ পুরুনো হয়ে গেল তখন তাকে আর কী ভাবে উত্যক্ত করা যায় সেকথা তারা ভাবতে লাগল।

একজন বলল, শর্মাকে যদি গাধার পিঠে চড়িয়ে নগর ভ্রমণ করান যায় ত বেশ মজা হয়। নগরের লোক এমন দৃশ্য কোথায় ও কবে আর দেখবে ?

আর একজন এতে আর একটু রঙ চড়িয়ে বলল, তবে ত শর্মাকে ভালো করে সাজাতেও হবে। মাথা ত মুড়োনোই রয়েছে তাই সেই কষ্ট আর করতে হবে না, তবে গলায় ফুলের মালা পরাবার ভার আমিই নিচ্ছি। যদিও সে ফুলের মালার কথাই বলল কিন্তু তার বলবার তাৎপর্য ছিল পুরুনো ছেঁড়া জুতোর মালা এবং সেকথা ইঙ্গিতে তারা সকলেই বুঝে নিয়েছিল।

তারপর যেমন যেমন সাজের কথা উঠল তা যাতে অগ্নিশর্মার রূপ ও সৌন্দর্যের অনুকূল হয় সকলে সেই সেই রকম অভিমত ব্যক্ত করতে লাগল।

তারপর সর্ব সম্মতিতে এ প্রস্তাব গৃহীত হল। গুণসেনও এই প্রস্তাবে খুব আনন্দ ও উল্লাস ব্যক্ত করল।

তারপর যখন অগ্নিশর্মাকে নিয়ে শোভাযাত্রা বেরুল তখন ছেলেদের দঙ্গলকে দঙ্গল তার পিছু হয়ে গেল। গাধার পিঠে বসা অগ্নিশর্মার জন্য ভাঙা কুলোর ছাতা ও ফুটো ঢোলকও এসে উপস্থিত হল। এই শোভাযাত্রা নগরের সর্বত্র পরিভ্রমণ করল। অগ্নিশর্মার এতে একটুও সম্মতি ছিল না কিন্তু যে রাজ্যে সে বাস করে, তার যুবরাজেরই যখন এতে সম্মতি রয়েছে, শুধু তাই নয়, অগ্রণী হয়ে হয়ে যখন সে অংশ গ্রহণ করছে সে ক্ষেত্রে এক গরীব ব্রাহ্মণ কিই বা করতে পারে?

ক্ষত্রিয়ের বীর্য সেদিন দীন ভিক্ষাজিবী ব্রাহ্মণত্বকে দমিত করে রেখেছিল। ক্ষত্রিয়ই ছিল সেদিন মানবতার রক্ষক। ব্রাহ্মণ বড়জোর যাগ যজ্ঞ করাত, দক্ষিণারূপ মোটা দান গ্রহণ করে কর্মকাণ্ডে নিজের জীবন ব্যতীত করত। অন্যায়ের প্রতিকার করার তার না ছিল শক্তি বা সামর্থ।

তাছাড়া যজ্ঞদত্ত এক সামান্য পুরোহিত মাত্র ছিল। তার ছেলের এরূপ বিড়ম্বনায় সে দুঃখের গভীর নিঃশ্বাস ফেলত। অগ্নিশর্মাও যুবরাজের এই কৌতুকপ্রিয়তায় অত্যন্ত ক্ষিন্ন ছিল। এক নগর পরিত্যাগ করে যাওয়া ছাড়া এর প্রতিকারের তার কাছে আর কোনো পথ ছিল না।

এই ঘটনার পর গুণসেন যেদিন আবার তার খোঁজ করল সেদিন সে জানতে পারল যে অগ্নিশর্মা তার রাজ্য পরিত্যাগ করে অন্যত্র কোথাও চলে গেছে।

শিশু যেমন খেলনা হারিয়ে দুঃখিত হয়, গুণসেনও সেরূপ দুঃখিত হল কিন্তু অগ্নিশর্মাকে খুঁজে বার করা এখন আর তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

যদি একবার সে তার হাতে পড়ে যায় তবে তাকে পশুর মতো সে বেঁধে রাখবে, বাইরে কোথাও যেতে দেবে না সে সঙ্কল্প সে মনে মনে করে নিয়েছিল কিন্তু অগ্নিশর্মাও প্রাণ থাকতে সেই নগরে ফিরে আসবেনা এই দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়েই গিয়েছিল। তাই গুণসেন তাকে আর খুঁজে পেল না।

॥ ২ ॥

একমাস পর অগ্নিশর্মা এক রমনীয় তপোবনে এসে উপস্থিত হল। এখানে তাকে উৎপীড়িত বা বিরক্ত করতে কোন রাজপুত্র বা শ্রেষ্ঠীপুত্র ছিল না। এখানে ছিল অশোক, বকুল, নাগ ও পুন্নাগ গাছের সমারোহ। আর ছিল ছোট ছোট নদী ও ঝরণা। তাদের কলকল ধ্বনি তপস্বীদের নির্দোষ আনন্দ দিত। আশ্রমবাসীদের কেউ কেউ ছিলেন যাজ্ঞিক। ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করবার যজ্ঞই সনাতন ও সর্বোত্তম পথ বলে তাঁরা মনে করতেন। অন্যরা ছিলেন কঠোর তপস্বী। তপশ্চর্যাকেই তাঁরা জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় বলে মনে করতেন। এই তপোবনের কুলপতি ছিলেন আর্জব কৌডিন্য। তিনি তপস্বীদের তীর্থস্বরূপ ছিলেন।

এক সময় এই ধরণের তপোবন ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। তপস্যা ছাড়া সিদ্ধিলাভ করা যায় না ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির এইটাই শাশ্বত ও সনাতন সূত্র। এই সংসারের বন্ধন হতে মুক্তি পেতে চাও ত তপস্যা করো, আত্মার অনন্ত শক্তির যদি বিকাশ করতে চাও ত তপস্যা করো, মানব-জাতির যদি কল্যাণ করতে চাও ত তপস্যা করো।

ইতিহাসের মুখোজ্জ্বলকারী কত কত মহাপুরুষেরা কি কি কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং তার প্রভাবে আর্যাবর্ত আজো কত গৌরবের অধিকারী সে সব কথা আমরা জানি।

তপোবনে কত কত তাপস ও ঋষি কতভাবে তপশ্চর্যা করতেন কতভাবে দেহ দমন করতেন। সমস্ত তপস্যাই যে ফলপ্রদ হত সেকথা বলা যায় না। কারণ তার কতক কষ্ট সহন মাত্রেই পর্যবসিত হত। তপশ্চর্যার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্শুদ্ধিরও প্রয়োজন আছে সে কথা কম তপস্বীই বুঝতেন। পঞ্চাগ্নির তাপ সহ্য করা, শীত ও বর্ষার উপদ্রবের সম্মুখীন হওয়া বা এক হাত উঁচু করে বা এক পায়ে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রের আসন কম্পিত করাকেই তাঁরা কৃতকৃত্যতা বলে মনে করতেন।

তপোবনে অন্যভাবে দুঃখী ও উদাসীনও স্থান পেয়ে যেত। সত্যি বলতে কি অগ্নিশর্মার এই জায়গাটি খুব ভালো লেগে গেল। সে সংসারী হয়েও ত প্রায় অসংসারীই ছিল। সংসারে তার ঘর ও বাবা মা ছাড়া আর কেউ ছিল

না। যেখানেই সে যেত সেখানে সে উপহাসের বা কৌতূহলের পাত্র হত। তার শরীরের গঠনই এরকম ছিল যে সে নিরুপায় ছিল। লোকের ঠাট্টা তামসায় সে প্রায় তিক্ত-বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। এই তপোবনে অধিকাংশ সংযমী পুরুষই বাস করতেন। তাই কাউকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করবেন সেরকম প্রবৃত্তি সেখানে কারু মধ্যে ছিল না।

আচার্য আর্জব কৌডিন্য এই নূতন অতিথিকে সাদরে গ্রহণ করলেন। তিনি তার মুখে বিষাদের গাঢ় কালিমাই দেখলেন না, আরো জেনে নিলেন এই মানুষটিকে আজ পর্যন্ত কেউ মমতা দিয়ে নিজের করে নেয়নি। নিঃসঙ্গতা তার প্রতিটি অঙ্গ হতে ঝরে পড়ছিল। অনেক দিনের ক্ষুধার্ত মানুষ যেমন ভয়ঙ্কর দেখায় তেমনি স্নেহ মমতা বঞ্চিত অগ্নিশর্মাকেও তাঁর কঠিন পাথরের মতো বলেই মনে হল।

আচার্য তাকে শান্ত ও মিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্র, তুমি কোথা হতে আসছ ! তারপর তার কাছ হতে একে একে সমস্ত কথা জেনে নিলেন। শেষে 'ক্লেশতপ্তানাম্ হি তপোবনম্' বলে সেই আশ্রমে তাকেও এক পর্ণকুটির নির্মাণের আদেশ দিলেন।

অগ্নিশর্মাও তার সমস্ত মন দিয়ে গুরুর সেবা করতে আরম্ভ করল। আচার্য কৌডিন্যের সত্যিকার সেবাকারী শিষ্যের কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু অগ্নিশর্মা তাদের থেকেও নিজেকে অনন্য বলে প্রমাণ করে দিল। যত দূর সম্ভব সে তার গুরুর কাছ থেকে দূরে থাকত না এবং তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করত।

আচার্য নিজেও তপস্বী ছিলেন। তাই তাঁর কাছে যারা আসত তাঁদের তিনি আহার-বিহার ও আমোদ-প্রমোদ হতে দূরে থাকতে বলতেন। বলতেন জিহ্বার স্বাদ-লোলুপতা মানবত্বকে বিনষ্ট করে, আমোদ-প্রমোদ তাকে মদোন্মত্ত করে দেয়। এছাড়া তাঁর কাছে বলবার আর কিছুই ছিল না। যারা শুনত তাদের মনে হত শাস্ত্রের এই মাত্রই সার নিষ্কর্ষ।

অল্পদিনের পরিচয়েই, অগ্নিশর্মার জীবনে এক সংস্কার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠল। তার বিশ্বাস হল সংসারের প্রাণী মাত্রই নিজ কর্মানুযায়ী ফল ভোগ করে। সেই কর্মকে বিনষ্ট করার তপস্যা ছাড়া আর অন্য কোনো সাধন নেই।

দুঃখ-গর্ভিত বৈরাগ্যের মাটিতে অগ্নিশর্মা এক কল্পবৃক্ষ অঙ্কুরিত করবার সাধনা প্রারম্ভ করে দিল। অন্য তাপসদের মতো ছোট ছোট সাধনার পুষ্প-বৃক্ষ রোপণে তার মনই ভরল না। রোগ নিবারণের উপায় যখন পাওয়া গেছে তখন পুরোপুরি ওষুধ পান করার সঙ্কল্পও সে গ্রহণ করে নিল। দিনের পর দিন অন্ন জল গ্রহণ না করা বা শীতোষ্ণতাকে এক ভাবে গ্রহণ করা অগ্নিশর্মার পক্ষে কোন কঠিন কাজ ছিল না। আজ পর্যন্ত তার সমস্ত জীবন সে এই ধরণের কষ্ট সহ্য করেইত ব্যতীত করেছে।

কালান্তরে অগ্নিশর্মার উগ্র তপশ্চর্যাই এই আশ্রমকে দেদীপ্যমান করে দিল। তার তপশ্চর্যার খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। শেষে অগ্নিশর্মা এক এক মাসের উপবাস করতে আরম্ভ করল। উপবাসের পারণের দিন ভিক্ষার জন্য সে মাত্র একজন গৃহস্থের ঘরে যেত এবং সেখানে যদি সে ভিক্ষা না পেত তাহলে অনাহারেই সেদিন ব্যতীত করত এবং তার পর দিন হতেই আবার আর এক মাসের উপবাস করতে আরম্ভ করে দিত।

অগ্নিশর্মার তপশ্চর্যার কথা শুনে লোকে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেত। উগ্র তপস্যার এ যেন এক পরাকাষ্ঠা। এক মাসের উপবাসের পর মাত্র একজন গৃহস্থের ঘর হতে ভিক্ষা নেবার আগ্রহ লোকদের চিন্তিত করে তুলল।

তার বিরূপ দেহের কথা এখন লোকে আর মনে করে না। অগ্নিশর্মাকে দেখে যারা একদিন হাসি ঠাট্টা করত তারাই এখন তাকে দেখলে হাত জোড় ও মাথা নীচু করে প্রণাম করতে আরম্ভ করল। তপশ্চর্যার দিব্যশক্তি যেন তার মধ্যে এক নূতন লাবণ্য এনে দিয়েছে, লোকে সেরকমই এখন মনে করতে লাগল।

রূপহীন অগ্নিশর্মা তাই এখন উগ্র তপস্যার প্রভাবে লোকের বন্দনীয় হয়ে উঠল। তার চোখ, মুখ, মাথা ও বাহ্য আকৃতি এখন নগণ্য হয়ে গেল। ভক্তদের চোখে সে তপস্যার তেজে দীপ্ত কোনো স্বর্গীয় দেবতা বলেই মনে হতে লাগল। তাপ যেমন স্বর্ণকে নির্মল করে তেমনি তপস্যাও যে বিকৃতিকে দূর করতে সমর্থ অগ্নিশর্মা তা প্রমাণিত করে দিল।

[ক্রমশঃ

আমাদের কথা

তথাগত বুদ্ধের মতো ভগবান মহাবীরও ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। খৃষ্টজন্মের ৫৯৯ বছর আগে ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল সিদ্ধার্থ। তিনি জ্ঞাতৃবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁর মা ছিলেন ত্রিশলা। তিনি বৈশালী গণতন্ত্রের অধিনায়ক চেটকের বোন ছিলেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল বর্দ্ধমান। জ্ঞাতৃবংশীয় বলে জ্ঞাতপুত্র বা নাতপুত্ত বলেও তিনি অভিহিত হয়েছেন।

বুদ্ধ হতে যেমন বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়েছে মহাবীর হতে যে সেরকম জৈন ধর্মের উদ্ভব হয়েছে সেকথা বলা যায় না। জৈন ধর্ম মহাবীরের পূর্বেও বর্তমান ছিল। তাঁর পূর্ববর্তী তীর্থংকর পার্শ্বনাথের শিষ্য সম্প্রদায় মহাবীরের সময় বর্তমান ছিলেন জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাবীরের পিতামাতা ভগবান পার্শ্বের অনুযায়ী ছিলেন।

পার্শ্বনাথের পূর্ববর্তী তীর্থংকর অরিষ্ট নেমি। তাঁর পূর্বে আরো ২১ জন তীর্থংকর হয়েছেন। প্রথম বা আদি তীর্থংকর ভগবান ঋষভ। ঋষভ সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ ছিলেন যখন সভ্যতার প্রথম বিকাশ হতে আরম্ভ হয়। ঋষভের নাম বেদে ও পুরাণে পাওয়া যায়। সেখানে তাঁকে বাতরশন মুনিদের প্রমুখ বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর লাঞ্ছন ছিল বৃষ। সিন্ধু সভ্যতার বৃষ সম্ভবতঃ তাঁর স্মৃতিকেই বহন করে।

মহাবীর তাই এক অতি প্রাচীন ধর্মের ধারক ও বাহক ছিলেন।

মহাবীরের শৈশব জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। জানা যায় না গৌতম-বুদ্ধের মতো তাঁর জীবনে এমন কোনো সন্ধিক্ষণ এসেছিল কিনা যেখানে রুগ্ন, জরাগ্রস্ত, মৃত ও সন্ন্যাসীর দিব্যকান্তি দর্শনে সংসার পরিত্যাগে তিনি উদ্বুদ্ধ হন। পূর্ববর্তী তীর্থংকরদের জীবনেও এ ধরণের সন্ধিক্ষণের উল্লেখ আছে। ঋষভের নিলাঞ্জনার মৃত্যু দর্শনে বৈরাগ্য জাগ্রত হয়। অরিষ্টনেমি তাঁর বিবাহে উপস্থিত রাজন্যবর্গের জন্য পশু হত্যা করা

হবে শুনে তৎক্ষণাৎ সংসার পরিত্যাগ করেন। কিন্তু মহাবীরের জীবনে সেরকম কোনো কিছুর উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই তাঁর সংসার পরিত্যাগ কোনো একটী বিশেষ আবেগের মুহূর্তে হয় নি। তার পেছনে ছিল দীর্ঘ দিনের চিন্তন, মনন ও অনুশীলন। তিনি এর প্রয়োজনীয়তা মনে মনে অনুভব করেছিলেন। এবং সে প্রয়োজনীয়তা ছিল শ্রমণ আদর্শের পুনরুজ্জীবনের।

মহাবীর ৩০ বছর বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তারপর দীর্ঘ ১২ বছর দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান। এমন কি আর্য পরিধির সীমা অতিক্রম করে অনার্য ও আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলেও তিনি প্রব্রজন করেন। এই প্রব্রজনের পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে যেমন পরিচয় করা তেমনি নিজেকে সেই মহান দায়িত্ব যাতে যথাযথ ভাবে পালন করতে পারেন তার জন্য প্রস্তুত করা। সেই সময় ক্রিয়াবাদ, অক্রিয়াবাদ, অজ্ঞানবাদ, বিনয়বাদ আদি বহু মতবাদ প্রচলিত ছিল যাদের নেতা ছিলেন অজিত কেশকম্বলী, প্রকুধ কাচ্চায়ন, সংজয় বেলট্‌ঠীপুত্ত, পূরণ কাশ্যপ, মংখলীপুত্র গোশালক আদি। তিনি সেগুলোকে আত্মসাৎ করেছেন। তারপর যখন নিজেকে প্রস্তুত পেয়েছেন তখন ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। দীর্ঘ ৩০ বছর তিনি ধর্ম প্রচার করেছেন। কোনো নূতন ধর্মমত নয়, সেই প্রাচীন ধর্ম, নূতন পরিবেশে, নূতন শৈলীতে, যে ধর্ম সাম্য ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সাম্য কেবল-মাত্র মানুষে মানুষে নয়, এ সাম্য বিশ্বের প্রত্যেকটী জীবের সঙ্গে। শ্রমণ ধর্ম জাতি ও বর্ণের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে না; গুরু যে কেউ হতে পারে, যদি সে সদাচারী ও শীল সম্পন্ন হয়।

ভগবান মহাবীরের প্রচারের মূল্যাঙ্কন আজো হয় নি। হয় নি তার কারণ তাঁর অনুযায়ীরা তাঁকে দেবতায় পরিণত করে তাঁর পূজার্চনায় নিরত হয়েছেন আর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তাঁকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। এমন কি তাঁদের সাহিত্যে মহাবীরের নাম পর্যন্ত কোথাও উল্লিখিত হয় নি। কিন্তু তাঁর প্রচার যে সুদূর প্রসারী হয়েছিল ও তার প্রভাব এত বিস্তৃত যে মহাভারত রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাসকে তাকে পূর্ব পক্ষরূপে উপস্থিত করতে

হয়েছে। মহাভারত যে আকারে আমরা পাই তা পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের মতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের রচনা। অবশ্য খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের অশ্বলায়ন সূত্রে মহাভারতের উল্লেখ পাই। তবে তখন তা কি আকারে প্রচলিত ছিল সেকথা বলা আজ কঠিন। কিন্তু বর্তমান প্রচলিত মহাভারতের সর্বত্র শ্রমণ আদর্শকেই মহর্ষি বেদব্যাস খণ্ডন ও মণ্ডন করবার চেষ্টা করেছেন। অহিংসা সর্বশ্রেষ্ঠ, শত যজ্ঞানুষ্ঠানের যে ফল অহিংসা পালনের সেই ফল সেকথা স্বীকার করেও বেদবিহিত যজ্ঞে পশুবলি সমর্থনযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু মহর্ষির সেই প্রয়াস ফলবতী হয় নি। মানুষ শ্রমণ ধর্মের আদর্শকেই গ্রহণ করেছে। বেদের আদর্শকে নয়। তাই তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে গীতায় আত্মযজ্ঞের কথা বলাতে হয়েছে যেখানে অর্পণ (স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র) ব্রহ্ম, ঘৃত ব্রহ্ম, হোমকর্তা ব্রহ্ম ও তৎ কর্তৃক ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে হোমও ব্রহ্ম। অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে জীবাত্মাকে আত্মা দ্বারাই হোম করতে হবে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এতখানি পশ্চাদপসরণের পর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পক্ষে মহাবীরকে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যা আমাদের গৌরবের তা এই যে মহাবীরের এই আন্দোলনের ফলেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে নূতন রূপ দান করতে হয়েছে যার পরিণাম স্বরূপ উপনিষদের আত্মবাদই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যে উপনিষদের প্রবক্তা ব্রাহ্মণ নয়, তীর্থংকরদের মতোই ক্ষত্রিয়।

ভগবান মহাবীরের নির্বাণের আজ ২৫০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আজ তাই সময় হয়েছে সেই সত্য উদ্ঘাটনের যাতে ভগবান মহাবীরের সত্যকার মূল্যাংকন হয়। এর জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের গবেষণা মূলক অধ্যয়ন। আশাকরি আমাদের দেশের বিদগ্ধ সমাজ এ বিষয়ে প্রযত্নশীল হবেন।

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।
- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ মাঘ ১৩৮১ ॥ দশম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :
গণেশ লালওয়ানী

মল্লীনাথ, লক্ষ্ণৌ মিউজিয়াম

বর্দ্ধমান-মহাবীর

[জীবন-চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

বৎস হতে বর্দ্ধমান গেলেন উত্তর কোশলের দিকে। তারপর অনেক গ্রাম ও নগর বিচরণ করে এলেন শ্রাবস্তী। শ্রাবস্তীতে কোষ্ঠক চৈত্যে তিনি অবস্থান করলেন। সেখানে তাঁর উপদেশে আকৃষ্ট হয়ে অনেকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল।

কোশল হতে তিনি আবার ফিরে এলেন বিদেহে। বিদেহের বাণিজ্য-গ্রামে তিনি বর্ষার চার মাস ব্যতীত করবেন।

এই বাণিজ্যগ্রামের বহির্ভাগে কোল্লাগ সন্নিবেশে থাকেন গৃহপতি আনন্দ যাঁর চার কোটি স্বর্ণমুদ্রা মাটিতে প্রোথিত থাকত, চার কোটি স্বর্ণমুদ্রা বৃদ্ধিতে, চারকোটি স্বর্ণমুদ্রা সম্পত্তিতে ও প্রত্যেক ব্রজে দশ হাজার করে চারটী গোব্রজ ছিল।

এই আনন্দ যখন বর্দ্ধমানের আসার খবর পেলেন তখন তিনি শ্রদ্ধাপ্লুত মন নিয়ে বাণিজ্যগ্রামের মধ্য দিয়ে পদব্রজে দুইপলাশ চৈত্যে যেখানে বর্দ্ধমান অবস্থান করছিলেন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ও বর্দ্ধমানের মুখে নিগ্রন্থ প্রবচন শুনলেন।

প্রবচন শুনে তাঁর মনে শ্রদ্ধার উদয় হল। প্রবচন অন্তে তাই তিনি উঠে দাঁড়ালেন ও বর্দ্ধমানকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে বললেন, ভগবন্, নিগ্রন্থ প্রবচনে আমার শ্রদ্ধা হয়েছে। নিগ্রন্থ প্রবচনে আমি বিশ্বাস করি। নিগ্রন্থ প্রবচন আমার রুচিকর। শ্রমণ ধর্ম গ্রহণ করি সে যোগ্যতা আমার নেই তাই আমাকে শ্রাবকের পাঁচটি অণুব্রত ও সাতটি শিক্ষা ও গুণ ব্রত প্রদান করুন।

বর্দ্ধমান বললেন, আনন্দ, তোমার যেমন অভিরুচি। তুমি শ্রাবক ব্রত গ্রহণ কর।

শ্রাবক ব্রতের পঞ্চম অণুব্রত পরিগ্রহ-পরিমাণে সম্পত্তির সীমা নির্ণয় করে নিতে হয় ; কি পরিমাণ সম্পত্তি আমি রাখব, কি পরিমাণ অর্থ।

পরিগ্রহ-পরিমাণের ধর্মীয় উদ্দেশ্য ভোগোপভোগের পরিমাণ সীমিত করা যাতে সে অহিংসা ব্রতকে পরিশুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু আনন্দের ক্ষেত্রে এর পরিণাম হল সুদূরপ্রসারী ; শুধু ধর্ম জীবনেই নয়, সমাজ জীবনেও।

আনন্দ ব্যবসায়ী ছিলেন। তাই এই ব্রত গ্রহণের ফলে সেই নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত যে অর্থ অর্জিত হত তা ব্যয়িত হতে লাগল জন-কল্যাণে। কারণ তা রাখবার অধিকার তাঁর আর ছিল না।

বর্দ্ধমান ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে চেয়ে ছিলেন সমাজের সংস্কারও। তাঁর লক্ষ্য ছিল সর্বোদয়। সর্বোদয়ের জন্ম সাম্য। সব মানুষ সমান বললেই হবে না, দেখতে হবে সেখানে যেন আর্থিক বৈষম্যও না থাকে। তার জন্য পরিগ্রহ-পরিমাণ। সঞ্চয়ের সীমা নির্দ্ধারণ। এই সীমা নির্দ্ধারণ, রাষ্ট্রের নির্দেশে, দণ্ডের ভয়ে নয় ; স্বেচ্ছায়, ব্রত গ্রহণে।

আর্থিক বৈষম্য ধনিকদের মধ্যে যেমন আনে নৈতিক পতন, দরিদ্র, শোষিতদের মধ্যে তেমনি অসন্তোষ ও বিক্ষোভ, যার পরিণাম দ্বন্দ্ব, সংঘাত, মৃত্যু। সে অবস্থা সর্বোদয়ের পরিপন্থীই নয়, গণতন্ত্রেরও।

বাণিজ্যগ্রাম হতে বর্দ্ধমান গেলেন মগধ ভূমির দিকে। মগধের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করে তিনি শেষে এলেন রাজগৃহে। রাজগৃহের গুণশীল চৈত্যে তিনি এবারের চাতুর্মাস্য যাপন করবেন।

রাজগৃহে অনেককেই তিনি দীক্ষিত করলেন, অনেকে শ্রাবক ব্রত গ্রহণ করল।

যাঁদের এবার তিনি দীক্ষিত করলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রেষ্ঠী শালিভদ্র ও ধন্য।

শালিভদ্র ছিলেন গোভদ্র শ্রেষ্ঠীর পুত্র। অপরিমিত ধনের অধিকারী। তাঁর যত ধন ছিল বোধহয় মগধের রাজকোষেও তত ধন ছিল না।

একবারের কথা। শ্রেণিকের রাজসভায় নেপাল হতে বণিক এলো রত্ন কম্বল নিয়ে যার এক একটীর মূল্য এক লক্ষ কার্ষাপণ।

শ্রেণিক সে রত্ন কম্বল কিনতে পারলেন না। সে রত্ন কম্বল কিনে নিলেন

শালিভদ্রের মা ভদ্রা। একটা নয়, ষোলটা। বত্রিশটা তিনি কিনতে চেয়েছিলেন তাঁর বত্রিশ পুত্রবধূর জন্য কিন্তু বণিকদের কাছে আর রত্ন কম্বল ছিল না।

এ খবর যখন শ্রেণিকের কানে গেল তখন তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন। মনে মনে ভাবলেন, শালিভদ্র এত কি ধনী। কিন্তু আশ্চর্য হবার তখনো তাঁর বাকী ছিল।

রানী চেলনার আগ্রহাতিশয্যে শ্রেণিক ষোলটা রত্ন কম্বলের একটা রত্ন কম্বল চেয়ে পাঠালেন ভদ্রার কাছ হতে, অর্থের বিনিময়ে। জবাব এলো অর্থের কোনো প্রশ্নই নেই কিন্তু সেই রত্ন কম্বলই আর ঘরে নেই। তাঁর পুত্রবধূরা এক দিন মাত্র ব্যবহার করে তা ফেলে দিয়েছে।

শুনে শ্রেণিক আবারো ভাবলেন, শালিভদ্র এত কী ধনী! তিনি এবারে শালিভদ্রকে দেখতে চাইলেন। তাঁকে রাজসভায় ডেকে পাঠালেন।

ভদ্রা বলে পাঠালেন, সম্ভব নয়। যদি শালিভদ্রকে দেখতে হয় তবে শ্রেণিককেই আসতে হবে তাঁর প্রাসাদে। তাঁর অভ্যার্থনার কোনো ত্রুটি হবে না।

তাই শ্রেণিকই গেলেন ভদ্রার ঘরে।

শালিভদ্রের সাত মহলা বাড়ী। শালিভদ্র থাকেন সপ্তম মহলে।

সেই সপ্তম মহল হতে তিনি কখনো নিচে নামেন নি, চন্দ্র সূর্যের মুখ দেখেন নি। ব্যবসা বাণিজ্যের সমস্ত কাজই দেখতেন তাঁর মা ভদ্রা।

শ্রেণিক শালিভদ্রের প্রাসাদ দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। প্রথম মহল হতে দ্বিতীয় মহলে, দ্বিতীয় মহল হতে তৃতীয় মহলে এলেন। তারপর বললেন, আমি বুড়ো মানুষ, আর পারি না; শালিভদ্রকে এখানে ডাক।

ভদ্রা তখন কি করেন। শালিভদ্রকে ডাকতে গেলেন। বললেন, রাজা এসেছেন, নিচে চল।

শালিভদ্র বললেন, তা আমি কি করব। তুমি ত সমস্ত কেনাকাটি কর। তুমিই তাকে কিনে নাও।

শুনে ভদ্রা হাসলেন। বললেন, শ্রেণিক কিনবার বস্তু নয়। তিনি রাজা, দেশের অধিপতি, সকলের স্বামী।

স্বামী! আমারো?

হাঁ হাঁ। তাঁর কথা অমান্য করতে নেই।

শালিভদ্র নিচে নেমে এলেন।

শ্রেণিক শালিভদ্রকে দেখে ফিরে গেলেন। কিন্তু শালিভদ্রের মনে এক ভাবনা রেখে দিয়ে গেলেন। আমি আমার স্বামী নই, আমারও একজন স্বামী আছে।

শালিভদ্রের সংসার তখন অসার বলে মনে হতে লাগল। তাঁকে নিজের স্বামী হতে হবে।

শুনে ভদ্রা চোখের জলের মধ্যে দিয়ে হাসলেন। বললেন, পাগল।

ভদ্রার স্বামী গোভদ্র এই ভাবেই একদিন সংসার পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন। ভদ্রা তাই শালিভদ্রকে এতদিন আগলে রেখেছিলেন বাইরের সমস্ত সংস্রব হতে। কিন্তু শ্রেণিক একদিন এসে সব কিছু ওলটপালট করে দিয়ে গেলেন। তাঁকে আর ধরে রাখা সম্ভব হল না।

তবু ভদ্রা শেষ চেষ্টা করতে ছাড়লেন না। বললেন, শালিভদ্র, এত দিনের সংসার কি একদিনে ছাড়া যায়। তুমি একটু একটু করে ছাড়।

শালিভদ্র তখন তাঁর স্ত্রীর এক একজনকে পরিত্যাগ করতে লাগলেন।

শালিভদ্রের বোন সুন্দরী। শ্রেষ্ঠী ধন্যের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল।

সুন্দরী তখন স্বামীর পরিচর্যা করছিলেন। হঠাৎ শালিভদ্রের বৈরাগ্যের কথা মনে হওয়ায় তাঁর চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

ধন্য তাই দেখে তাঁর দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

সুন্দরী তখন সব কথা খুলে বললেন। শুনে ধন্য হাহা করে হেসে উঠলেন। বললেন, এমন অদ্ভুত কথা ত জীবনে কখনো শুনিনি। বৈরাগ্য যখন হয় তখন সংসার একেবারেই চলে যায়। একটু একটু করে যায় না।

সেকথা শুনে সুন্দরী ভাবলেন যে ধন্য তাঁর ভাইকে তাচ্ছিল্য করছেন। তাই বললেন, মুখে বলা সহজ, কাজে করা শক্ত। একবারে তুমি ছাড় দেখি।

এই ছাড়লাম বলে ধন্য সেই মুহূর্তেই সংসার পরিত্যাগ করে চলে গেলেন।

ধন্য সংসার পরিত্যাগ করেছেন শুনে শালিভদ্রও তখন সংসার পরিত্যাগ

করে বেরিয়ে এলেন। তারপর তাঁরা দু'জনে বর্দ্ধমানের কাছে গিয়ে শ্রমণ ধর্ম গ্রহণ করলেন।

শালিভদ্রের সেই এক জীবন আর এই এক জীবন। ভোগের চরম সীমা হতে চলে এলেন ত্যাগের চরম সীমায়। তপস্যায় যে শরীর ফুলের মতো কোমল ছিল তাকে শুষ্ক করলেন।

বহুদিন পরের কথা। গ্রামানুগ্রাম বিচরণ করতে করতে সেবারো বর্দ্ধমান এসেছেন রাজগৃহে।

আট দিনের উপবাসের পর পারণ করবেন বলে ভিক্ষা চর্যায় যাবার মুখে বর্দ্ধমানের আদেশ নিতে এসেছেন শালিভদ্র। বর্দ্ধমান বললেন, শালিভদ্র, আজ মা'র কাছ হতে ভিক্ষা নিয়ে এস।

শালিভদ্র মার কাছে ভিক্ষে নিতে গেলেন। কিন্তু ধন্য ও শালিভদ্রের শরীরের এত পরিবর্তন হয়েছিল যে ভদ্রা তাঁদের চিনতেই পারলেন না। তাছাড়া অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁদের ভিক্ষাও দিলেন না।

সেই সময় সেই পথ দিয়ে এক গোয়ালিনী দই নিয়ে বাজারে চলেছিল। শালিভদ্রকে দেখে তার মনে বাৎসল্য ভাবের উদয় হল। সে তখন মুনিদের বন্দনা করে তাঁদের দই ভিক্ষা দিল।

শালিভদ্র দই নিয়ে বর্দ্ধমানের কাছে ফিরে এলেন। বললেন, ভগবন্, আমি মার কাছে ভিক্ষা পেলাম না।

বর্দ্ধমান বললেন, শালিভদ্র, তুমি তোমার মার কাছেই ভিক্ষা পেয়েছ। তবে ইহ জন্মের মা নয়, পূর্বজন্মের মা। সে জীবনে দরিদ্রের ঘরে তোমার জন্ম হয়। তোমার মায়ের এত সঙ্গতি ছিল না যে তোমায় রোজ দুধ দই খাওয়ায়। একবার তুমি পায়েস খেতে চাওয়ায় চেয়ে চিন্তে তোমার মা তোমার জন্য একটুখানি দুধ নিয়ে আসে। পায়েস রান্না করে। তুমি সেই পায়েস নিজে না খেয়ে সে সময় সাধুরা হঠাৎ এসে উপস্থিত হলে তাঁদের ভিক্ষা দিয়ে দাও। শালিভদ্র, তোমার সেই পুণ্যকাজের ফলে তুমি ইহ জন্মে ধনী শ্রেষ্ঠীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছ ও তোমার পূর্বজন্মের মা দুধ দই খাওয়াতে চেয়েছিল বলে গোয়ালিনী হবে।

ভদ্রা যখন জানতে পারলেন যে ধন্য ও শালিভদ্র তাঁর কাছে ভিক্ষে নিতে

গিয়ে ভিক্ষে না পেয়ে ফিরে এসেছেন তখন চোখের জল আর রাখতে পারলেন না। তিনি তখন তাদের দেখতে গেলেন বিপুলাচল পাহাড়ে যেখানে তারা অবস্থান করছিল।

চাতুর্মাস্য শেষ হতে রাজগৃহ হতে বর্দ্ধমান এলেন চম্পায়।

চম্পায় তখন রাজত্ব করেন রাজা দত্ত। বর্দ্ধমানের প্রবচনে মুগ্ধ হয়ে এই দত্তের পুত্র মহাচন্দ্র শ্রমণ ধর্ম গ্রহণ করলেন।

বর্দ্ধমান যখন চম্পায় অবস্থান করছিলেন তখন সিন্ধু সৌবীরের রাজা উদায়ন যিনি নিগ্রন্থ শ্রাবক ছিলেন একদিন পৌষধ শালায় বসে বসে চিন্তা করছিলেন: সেই গ্রাম, সেই জনপদ ধন্য যেখানে শ্রমণ ভগবান বর্দ্ধমান বিচরণ করছেন, তারাই ভাগ্যশালী যাঁরা প্রত্যহ তাঁর সাক্ষাৎ লাভ ও বন্দনা করে ধন্য হচ্ছেন। যদি তিনি আমার ওপর অনুগ্রহ করে বিতভয় পত্তনে এসে মৃগবন উদ্যানে অবস্থান করেন তবে তাঁর পরিচর্যা করে আমিও ধন্য হই।

চম্পা নগরীর পূর্ণভদ্র চৈত্যে বসে বর্দ্ধমান উদায়নের সেই মনোভাব অবগত হলেন। তাঁর ওপর অনুগ্রহ করে চম্পা হতে বিতভয় পত্তনের দিকে প্রস্থান করলেন। চম্পা হতে বিতভয় পত্তনের দূরত্ব ছিল কম করেও ৫০০ ক্রোশের ওপর। তাছাড়া পথের মধ্যে ছিল রাজস্থানের বিস্তৃত মরুভূমি। কিন্তু পথের দূরত্ব, যাত্রার কষ্ট বর্দ্ধমানকে কবে নিরস্ত করেছে। বর্দ্ধমান তাই সেই কঠিন পথ অতিক্রম করে একদিন বিতভয় পত্তনে এসে উপস্থিত হলেন ও উদায়নকে শ্রমণ দীক্ষায় দীক্ষিত করলেন।

বিতভয় পত্তনে বর্দ্ধমান কিছুকাল অবস্থান করলেন তারপর আবার বিদেহের দিকে ফিরে গেলেন।

সেই দীর্ঘ মরুভূমির পথেই প্রত্যাবর্তন। তার ওপর গ্রীষ্ম ঋতু। ক্রোশের পর ক্রোশ ধূ ধূ করা মরুভূমি ছাড়া কোথাও কোনো জনবসতি নেই। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কাঁটা গাছ ছাড়া আর কোনো ছায়া নেই। তাই ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে শ্রমণদের পথ অতিক্রম করতে হল।

এমনি এক দিনের কথা। ক্ষুধায় যখন তারা কাতর তখন পথের মধ্যে তাঁদের দেখা হল একদল সার্থবাহের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে তিল ছিল। সেই তিল তারা শ্রমণদের দিতেও চাইল। যখন আর কিছু নেই তখন তিল

দিয়েই তারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করুক। কিন্তু না। শ্রমণের চর্যায় তার ব্যতিক্রম হয়। যে অন্ন অপক্ক, বীজরূপ তা শ্রমণ গ্রহণ করতে পারে না।

বর্দ্ধমান নিয়মে কঠোর।

কঠোর তাই আর একদিন যখন পিপাসায় সকলে কাতর, যখন জলেরও সন্ধান পাওয়া গেল, বর্দ্ধমান বললেন, না। শ্রমণের অপক্ক জল খেতে নেই। তাই জলের কূয়ো পেছনে ফেলে তাদের এগিয়ে যেতে হল।

তারপর একদিন সেই দুঃখের পথও শেষ হল। তিনি ফিরে এলেন বিদেহের বাণিজ্যগ্রামে। বাণিজ্যগ্রামেই তিনি সেই বর্ষাকাল ব্যতীত করবেন।

চাতুর্মাস্য শেষ হতে বর্দ্ধমান গেলেন বারাণসীর দিকে। সেখানে ঈশান কোণ স্থিত কোষ্ঠক চৈত্যে অবস্থান করলেন।

বারাণসীতেও বর্দ্ধমান অনেক শিষ্য সংগ্রহ করলেন যাদের প্রমুখ ছিলেন চুলনীপিতা ও তাঁর স্ত্রী শ্যামা, সুরাদেব ও তাঁর স্ত্রী ধন্যা।

বারাণসী হতে রাজগৃহের পথে বর্দ্ধমান এলেন আলভিয়া। আলভিয়ায় শংখবন উদ্যানে তিনি কিছুকাল অবস্থান করলেন।

এই শংখবন উদ্যানের কাছেই থাকেন তপস্বী পোগ্‌গল, কঠিন তপশ্চর্যার জন্য যিনি বিভঙ্গ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এই বিভঙ্গ জ্ঞানে ব্রহ্মদেব লোক পর্যন্ত দেবতাদের গতি ও স্থিতিকে তিনি প্রত্যক্ষ দেখতে লাগলেন।

সেই বিভঙ্গ জ্ঞান লাভ করাতেই পোগ্‌গলের মনে হল যে তিনি শুদ্ধ কেবল জ্ঞান লাভ করে ফেলেছেন। তাঁর আর কিছু জানবার বা দেখবার বাকী নেই। পোগ্‌গল আলভিয়ায় রাজপথে দাঁড়িয়ে সেকথা সবাইকে বলতে লাগলেন।

ভিক্ষাচর্যায় গিয়ে সেকথা শুনে এলেন ইন্দ্রভূতি গৌতম। ফিরে এসেই তিনি বর্দ্ধমানকে প্রশ্ন করলেন, ভগবন্‌, এখন আলভিয়ায় পোগ্‌গলের জ্ঞান ও সিদ্ধান্তের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। পোগ্‌গল নাকি বলেছে যে ব্রহ্মলোক পর্যন্তই দেবলোক তারপর দেবলোক নেই। তাদের আয়ু দশ হাজার বছর হতে দশ সাগরোপম পর্যন্ত। ভগবন্‌, সে কি সত্য?

বর্দ্ধমান বললেন, না গৌতম। পোগ্‌গলের জ্ঞান অবাধ জ্ঞান নয়। তা সীমিত। ব্রহ্মলোকের পরও দেবতাদের বাসভূমি আছে। সর্বশেষ অনুত্তর

বিমান যেখানে দেবতাদের আয়ু দশ হাজার বছর হতে তেত্রিশ সাগরোপম পর্যন্ত।

বর্দ্ধমানের এই স্পষ্টীকরণ আলভিয়াবাসীরা যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তারাও শুনল। তারা বর্দ্ধমানের কথা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। শেষে সেকথা পোগ্‌গলের কানে গেল।

বর্দ্ধমান সর্বজ্ঞ, বর্দ্ধমান তীর্থংকর, বর্দ্ধমান মহাতপস্বী পোগ্‌গল সেকথা আগেই শুনেছিল। তাই বর্দ্ধমানের কথায় সে শঙ্কিত হয়ে উঠল ও সত্য নির্ণয়ের জন্য তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

পোগ্‌গল বর্দ্ধমানকে বন্দনা ও নমস্কার করে আসন গ্রহণ করল। তারপর বলল, ভগবন্, আমি যে দেবলোকের অবধি পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি তা আপনি স্বীকার করেন না। আপনিই বলুন এরপর আর কোন কোন দেবলোক রয়েছে?

বর্দ্ধমান বললেন, পোগ্‌গল, তুমিই তার আগে বল, তুমি যে শেষ দেবলোক দেখতে পাচ্ছ সে কি রকম?

ভগবন্, সেখানে সকলেই সুখী, সকলেই আনন্দময়।

পোগ্‌গল, সেই দেবলোকের কি ইন্দ্র রয়েছেন?

হাঁ ভগবন্।

পোগ্‌গল, ইন্দ্রের সেবার জন্য সেখানে কি দাসদাসী দেবতারা নিযুক্ত রয়েছে?

হাঁ ভগবন্।

ইন্দ্র ও তাঁর পরিজন ছাড়া অন্য যে দেবতা রয়েছে ও দাসদাসী দেবতা, তাদের সংখ্যা কত?

সাধারণ দেবতা ও দাসদাসীদের সংখ্যা ইন্দ্র ও তাঁর পরিজনের সংখ্যার চাইতে অনেক বেশী।

পোগ্‌গল, তা হলে তুমি একথা কি করে বলছ যে সেখানে সকলেই সমান সুখী, সকলেই সমান আনন্দময়। তুমি যে দেবলোক দেখছ সেখানে সামান্য দেবতাই সুখী; সাধারণ ও দাসদাসী দেবতা সুখী নয়। তাই তা সর্বশেষ স্বর্গ হতে পারে না। সর্বশেষ স্বর্গে সকলেই সমান সুখী, সকলেই সমান

আনন্দময়। পোগ্গল, তুমি যখন সেই দেবলোক দেখতে পাচ্ছ না তখন তুমি কি করে বলছ যে তুমি সর্বশেষ দেবলোক দেখতে পাচ্ছ?

ভগবন্, আপনি ঠিকই বলছেন। আপনি আমায় সেই অন্তিম দেবলোকের কথা বলুন।

পোগ্গল, স্বর্গ দুই রকমের। এক কল্পোৎপন্ন, দুই কল্পাতীত। যেখানে ইন্দ্র আছেন ও তাঁর প্রজা, দাসদাসী তা কল্পোৎপন্ন। সেখানে মর্ত্যের পৃথিবীর চাইতে সুখ অনেক বেশী কিন্তু সেই সুখই চরম সুখ নয়। কারণ সেখানে একজন যেমন বেশী সুখী, সেই পরিমাণে অন্যরা বেশী দুঃখী। কিন্তু যেমন যেমন উর্দ্ধতর দেবলোকে যাওয়া যায় তেমন তেমন পরিগ্রহের পরিমাণ কমতে থাকে ও দুঃখী দেবতাদের সংখ্যাও কম হতে থাকে। দ্বাদশ সংখ্যক দেবলোক অচ্যুত। নীচের এগারোটি দেবলোকের চাইতে সেখানে অনেক বেশী সুখ। কিন্তু পোগ্গল, তারপরও এমন দেবলোক রয়েছে যেখানে সকলে সুখী। সে কল্পাতীত দেবলোক। সেখানে দাসদাসী নেই, না রাজা প্রজা, সেখানে সকলেই ইন্দ্র। তাই তাদের অহমিন্দ্র বলা হয়। তাদের প্রয়োজনও কম। যতটুকু প্রয়োজন হয় তা আপনা হতেই পূর্ণ হয়ে যায়। এই কল্পাতীত দেবলোকে নয় গ্রৈবেয়ক ও পাঁচ অনুত্তর বিমান। সর্বশেষ বিমান সর্বার্থসিদ্ধি।

ভগবন্, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার দৃষ্টি সীমিত। আপনি আমায় শ্রমণ সংঘে গ্রহণ করুন।

পোগ্গল, তোমার যেমন অভিরুচি।

পোগ্গলের বর্দ্ধমানের কাছে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণের খবর মুহূর্তে সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে গেল।

বর্দ্ধমানের লোকোত্তর প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে আলভিয়ার বহু সংখ্যক জন সমুদায় তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। এঁদের মধ্যে ছিলেন কোটিপতি গৃহস্থ চুল্লশতক ও তাঁর স্ত্রী বহুলা। তাঁরা শ্রাবক ধর্ম গ্রহণ করলেন।

আলভিয়া হতে বর্দ্ধমান এলেন রাজগৃহ।

রাজগৃহেই তিনি বর্ষাবাস যাপন করলেন।

বর্ষাবাসের পরও বর্দ্ধমান রাজগৃহেই রয়ে গেলেন। কারণ মগধাধিপ

শ্রেণিক তখন ঘোষণা করেছিলেন যে, যে শ্রমণ ধর্ম গ্রহণ করবে তার পরিবার পরিজন প্রতিপালনের ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করবে। শ্রেণিকের সেই ঘোষণার প্রভাবে বহু লোক সেদিন শ্রমণ সংঘে প্রবেশ করতে এগিয়ে এসেছিল। তাঁদের মধ্যে যেমন ছিল রাজপুত্র, রাজমহিষী, তেমনি ছিল সাধারণ মানুষ—তন্তুবায়, কুমোর, রথিক।

[ক্রমশঃ

জৈন-মূর্তিতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পূরণচাঁদ নাহার

[পূর্বানুবৃত্তি]

চতুর্বিংশতি যক্ষ

(১)

গোমুখোযক্ষঃ স্বর্ণবর্ণো গজবাহনশ্চতুর্ভুজো বরদাক্ষমালিকাযুতদক্ষিণকরদ্বয়ো মাতুলিঙ্গপাশান্বিতবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ১ ॥

গোমুখ যক্ষ—স্বর্ণবর্ণ, হস্তিবাহন, চতুর্ভুজ, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অক্ষমালা এবং বামকরদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ (ফল বিশেষ, হিন্দী নাম বিজোরা, অনেকটা মোচার মত) ও পাশ শস্ত্র।

(২)

মহাযক্ষশ্চতুর্মুখঃ শ্যামবর্ণঃ করিবাহনোঽষ্টপাণির্বরদমুদ্গরাক্ষসূত্রপাশান্বিত-দক্ষিণপাণিচতুষ্কো মাতুলিঙ্গাভয়াঙ্কুশশক্তিযুক্তবামকরচতুষ্টয়শ্চ ॥ ২ ॥

মহা যক্ষ—চতুর্মুখ, শ্যামবর্ণ, হস্তিবাহন ও অষ্টপাণি, ইঁহার দক্ষিণের চারিটি হস্তে ক্রমান্বয়ে বরমুদ্রা, মুদ্গর, অক্ষসূত্র ও পাশ আছে। চারিটি বাম হস্তে ক্রমশঃ মাতুলিঙ্গ, অভয়মুদ্রা, অঙ্কুশ (শস্ত্রবিশেষ) ও শক্তি (অস্ত্র)।

(৩)

ত্রিমুখোযক্ষস্ত্রিবদনস্ত্রিনেত্রঃ শ্যামবর্ণো ময়ূরবাহনঃ ষড়্ভুজো নকুলগদাভয়-যুতদক্ষিণকরত্রয়ো মাতুলিঙ্গনাগাক্ষসূত্রযুতবামপাণিত্রয়শ্চ ॥ ৩ ॥

ত্রিমুখ যক্ষ—ত্রিমুখ, ত্রিনেত্র, শ্যামবর্ণ, ময়ূরবাহন, ষড়্ভুজ। দক্ষিণ হস্তত্রয়ে নকুল (অস্ত্র বিশেষ), গদা ও অভয়মুদ্রা এবং বাম করত্রয়ে মাতুলিঙ্গ, নাগ ও অক্ষসূত্র।

(৪)

ঈশ্বরোযক্ষঃ শ্যামকান্তির্গজারূঢ়শ্চতুর্ভুজো মাতুলিঙ্গাক্ষসূত্রযুতদক্ষিণকরদ্বয়ো নকুলাঙ্কুশান্বিতবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ৪ ॥

ঈশ্বর যক্ষ—শ্যামকান্তি, হস্তিবাহন ও চতুর্ভুজ। দক্ষিণকরদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও অক্ষসূত্র এবং বামপাণিদ্বয়ে নকুল ও অঙ্কুশ।

(৫)

তুম্বুরুঃ শ্বেতবর্ণো গরুড়ারূঢ়শ্চতুর্ভুজো বরদশক্তিযুতদক্ষিণকরদ্বয়ো গদানাগ-পাশযুতবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ৫ ॥

তুম্বুরু যক্ষ—শ্বেতবর্ণ, গরুড়বাহন, চতুর্ভুজ। দক্ষিণভুজ দুইটিতে বরমুদ্রা ও শক্তি অস্ত্র এবং বাম হস্ত দুইটিতে গদা ও নাগপাশ।

(৬)

কুসুমোযক্ষঃ নীলবর্ণকুরঙ্গবাহনশ্চতুর্ভুজঃ ফলাভয়যুত দক্ষিণপাণিদ্বয়ো নকুলাক্ষসূত্রযুক্তবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ৬ ॥

কুসুম যক্ষ—নীলবর্ণ, কুরঙ্গবাহন, চতুর্ভুজ। দক্ষিণ করদ্বয়ে ফল ও অভয়মুদ্রা এবং বাম করদ্বয়ে নকুল ও অক্ষসূত্র।

(৭)

মাতঙ্গোযক্ষঃ নীলবর্ণো গজারূঢ়শ্চতুর্ভুজো বিল্বপাশযুতদক্ষিণপাণিদ্বয়ো নকুলাঙ্কুশযুতো বামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ৭ ॥

মাতঙ্গ যক্ষ—নীলবর্ণ, গজবাহন, চতুর্ভুজযুক্ত। দক্ষিণকরদ্বয়ে বিল্ব (ফলবিশেষ) ও পাশ এবং বাম হস্তদ্বয়ে নকুল এবং অঙ্কুশ।

(৮)

বিজয়োযক্ষঃ হরিদ্বর্ণস্ত্রিলোচনো হংসারূঢ়ো দ্বিভুজঃ সচক্রদক্ষিণহস্তঃ সমুদ্গরবামহস্তশ্চ ॥ ৮ ॥

বিজয় যক্ষ—হরিদ্বর্ণ, ত্রিলোচন, হংসবাহন, দ্বিভুজ, দক্ষিণ হস্তে চক্র ও বাম হস্তে মুদগর।

(৯)

অজিতোযক্ষঃ শ্বেতবর্ণঃ কূর্মারূঢ়শ্চতুর্ভুজো মাতুলিঙ্গাক্ষসূত্রযুতদক্ষিণপাণিদ্বয়ো নকুলকুন্তকলিতবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ৯ ॥

অজিত যক্ষ—শ্বেতবর্ণ, কূর্মবাহন, চতুর্ভুজ। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও অক্ষসূত্র এবং বাম হস্তদ্বয়ে নকুল ও কুন্তশোভিত।

(১০)

ব্রহ্মাযক্ষশ্চতুর্মুখস্ত্রিনেত্রঃ সিতবর্ণঃ পদ্মাসনাষ্টভুজো মাতুলিঙ্গমুদ্গরপাশকাভয় যুতদক্ষিণপাণিচতুষ্টয়ো নকুলগদাঙ্কুশাক্ষসূত্রযুতবামপাণিচতুষ্টয়শ্চ ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মা যক্ষ—চতুর্মুখ, ত্রিনেত্র, সিতবর্ণ, পদ্মাসন, অষ্টভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে মাতুলিঙ্গ, মুদগর, পাশ ও অভয়মুদ্রা এবং বামপাণিচতুষ্টয়ে নকুল, গদা, অঙ্কুশ ও অক্ষসূত্র।

(১১)

মনুজোযক্ষো মতান্তরেণেশ্বরো ধবলবর্ণস্ত্রিনেত্রো বৃষভবাহনশ্চতুর্ভুজো মাতুলিঙ্গগদাযুতদক্ষিণপাণিদ্বয়ো নকুলাক্ষসূত্রযুতবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥১১॥

মনুজ যক্ষ, মতান্তরে ঈশ্বর যক্ষ—শুভ্রকান্তি, ত্রিনেত্র, বৃষভবাহন, চতুর্ভুজ। দক্ষিণ করদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও গদা এবং বাম পাণিদ্বয়ে নকুল ও অক্ষসূত্র।

(১২)

অসুরকুমারো যক্ষঃ শ্বেতবর্ণোহংসবাহনশ্চতুর্ভুজো বীজপূরকবীণান্বিতদক্ষিণকরদ্বয়ো নকুলকধনুর্যুক্তবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥১২॥

অসুরকুমার যক্ষ—শ্বেতবর্ণ, হংসবাহন, চতুর্ভুজ। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বীজপূরক ও বীণা এবং বাম হস্তদ্বয়ে নকুলক ও ধনু।

(১৩)

ষণ্মুখোযক্ষ শ্বেতবর্ণঃ শিখিবাহনো দ্বাদশভুজঃ ফলচক্রবাণখড়্গপাশাক্ষসূত্রযুতদক্ষিণপাণিষট্‌কো নকুলচক্রধনুঃফলকাঙ্কুশাভয়যুতবামপাণিষট্‌কশ্চ ॥১৩॥

ষণ্মুখ যক্ষ—শ্বেতবর্ণ, ময়ূরবাহন, দ্বাদশভুজযুক্ত। দক্ষিণ ছয়টি হাতে ফল, চক্র, বাণ, খড়্গ, পাশ ও অক্ষসূত্র এবং বাম হস্ত ছয়টিতে ক্রমশঃ নকুল, চক্র, ধনু, ফলক, অঙ্কুশ ও অভয়মুদ্রা।

(১৪)

পাতালোযক্ষস্ত্রিমুখো রক্তবর্ণো মকরবাহনো ষড়্‌ভুজঃ পদ্মখড়্গপাশযুক্তদক্ষিণপাণিত্রয়ো নকুলফলকাক্ষসূত্রযুক্তবামপাণিত্রয়শ্চ ॥১৪॥

পাতাল যক্ষ—ত্রিমুখ, রক্তবর্ণ, মকরবাহন, ষড়্‌ভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তত্রয়ে ক্রমান্বয়ে পদ্ম, খড়্গ ও পাশ এবং বাম হস্তত্রয়ে নকুল, ফলক ও অক্ষসূত্র আছে।

(১৫)

কিন্নরোযক্ষস্ত্রিমুখো রক্তবর্ণঃ কূর্মবাহনঃ ষড়্‌ভুজো বীজপূরকগদাভয়যুক্ত দক্ষিণপাণিত্রয়ো নকুলপদ্মাক্ষমালাযুক্তবামপাণিত্রয়শ্চ ॥১৫॥

কিন্নর যক্ষ—ত্রিমুখ, রক্তবর্ণ, কচ্ছপবাহন, ষড়্‌ভুজযুক্ত দক্ষিণ হস্তত্রয়ে বীজপূরক, গদা ও অভয়মুদ্রা এবং বাম হস্তত্রয়ে নকুল, পদ্ম ও অক্ষমালা আছে।

(১৬)

গরুড়োযক্ষো বরাহবাহনঃ ক্রোড়বদনঃ শ্যামরুচিশ্চতুর্ভুজো বীজপূরক-পদ্মান্বিতদক্ষিণকরদ্বয়ো নকুলাক্ষসূত্রযুক্তবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥১৬॥

গরুড় যক্ষ—বরাহবাহন, বরাহবদন, শ্যামরুচি (শ্যামবর্ণ), চতুর্ভুজযুক্ত। দক্ষিণ করদ্বয়ে বীজপূরক ও পদ্মফুল এবং বামকরদ্বয়ে নকুল ও অক্ষমালা আছে।

(১৭)

গন্ধর্বোযক্ষঃ শ্যামবর্ণো হংসবাহনশ্চতুর্ভুজো বরদাপাশকান্বিতদক্ষিণপাণিদ্বয়ো মাতুলিঙ্গাঙ্কুশাধিষ্ঠিতবামকরদ্বয়শ্চ ॥১৭॥

গন্ধর্ব যক্ষ—শ্যামবর্ণ, হংসবাহন, চতুর্ভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে ক্রমান্বয়ে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বাম পাণিদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও অঙ্কুশ আছে।

(১৮)

যক্ষেন্দ্রোযক্ষঃ ষণ্মুখস্ত্রিনেত্রঃ শ্যামবর্ণঃ শিখিবাহনো দ্বাদশভুজো বীজপূরক-বাণখড়্গামুদ্গরপাশকাভয়যুক্তদক্ষিণকরষট্‌কো নকুলধনুশ্চর্মফলকশূলাঙ্কুশাক্ষসূত্র-যুক্তবামপাণি ষট্‌কশ্চ ॥১৮॥

যক্ষেন্দ্র যক্ষ,—ষণ্মুখ, ত্রিনেত্র, শ্যামবর্ণ, ময়ূরবাহন, দ্বাদশ হস্তযুক্ত। দক্ষিণ ছয় হস্ত ক্রমান্বয়ে বীজপূরক, বাণ, খড়্গ, মুদ্গর, পাশ ও অভয়মুদ্রাযুক্ত, বাম ছয় হস্তে নকুল, ধনু, চর্মফলক (ঢাল), শূল, অঙ্কুশ ও অক্ষসূত্র আছে।

(১৯)

কূবরো যক্ষশ্চতুর্মুখ ইন্দ্রায়ুধবর্ণো গজবাহনোঽষ্টভুজো বরদপরশুশূলাভয়যুক্ত-দক্ষিণপাণিচতুষ্টয়ো বীজপূরকশক্তিমুদ্গরাক্ষসূত্রযুতবামপাণিচতুষ্টয়শ্চ ॥১৯॥ (কূবর স্থানে কুবেরমাহুঃ।)

কূবর যক্ষ—চতুর্মুখ, ইন্দ্রায়ুধবর্ণ, গজবাহন, অষ্টভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্ত-চতুষ্টয়ে ক্রমশঃ বরমুদ্রা, পরশু (অস্ত্রবিশেষ), শূল ও অভয় এবং বামপাণি-চতুষ্টয়ে বীজপূরক, শক্তি, মুদ্গর ও অক্ষসূত্র আছে।

(২০)

বরুণোযক্ষশ্চতুর্মুখস্ত্রিনেত্রোঽসিতবর্ণো বৃষভবাহনো জটামুকুটভূষিতোঽষ্ট-ভুজো বীজপূরকগদাবাণশক্তিযুক্তদক্ষিণকরকমলচতুষ্কোণকুলপদ্মধনুপরশুযুক্ত-বামপাণিচতুষ্টয়শ্চ ॥২০॥

বরুণ যক্ষ—চতুর্মুখ, ত্রিনেত্র, কৃষ্ণবর্ণ, বৃষভবাহন, জটামুকুটভূষিত, অষ্টভুজ-যুক্ত। দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে ক্রমান্বয়ে বীজপূরক, গদা, বাণ ও শক্তি এবং বাম হস্তচতুষ্টয়ে নকুল, পদ্ম, ধনু ও পরশু আছে।

(২১)

ভৃকুটিযক্ষশ্চতুর্মুখস্ত্রিনেত্রঃ সুবর্ণবর্ণো বৃষভবাহনোঽষ্টভুজো বীজপূরকশক্তি-মুদ্গরাভয়যুক্তদক্ষিণকরচতুষ্টয়ো নকুলপরশুবজ্রাক্ষসূত্রযুক্তবামকরচতুষ্টয়শ্চ ॥২১॥

ভৃকুটি যক্ষ—চতুর্মুখ, ত্রিনেত্র, সুবর্ণবর্ণ, বৃষভবাহন, অষ্টভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে বীজপূরক, শক্তি, মুদ্গর ও অভয়মুদ্রা এবং বাম করচতুষ্টয়ে ক্রমান্বয়ে নকুল, পরশু, বজ্র ও অক্ষসূত্র আছে।

(২২)

গোমেধোযক্ষস্ত্রিমুখঃ শ্যামকান্তিঃ পুরুষবাহনঃ ষড়্‌ভুজো মাতুলিঙ্গপরশু-চক্রান্বিতদক্ষিণকরত্রয়োনকুলশূলশক্তিযুক্তবামপাণিত্রয়শ্চ ॥২২॥

গোমেধ যক্ষ—ত্রিমুখ, শ্যামকান্তি, পুরুষবাহন (নরবাহন), ষড়ভুজযুক্ত। দক্ষিণ করত্রয়ে মাতুলিঙ্গ, পরশু ও চক্র এবং বাম করত্রয়ে নকুল, শূল ও শক্তি আছে।

(২৩)

বামনোযক্ষো মতান্তরেণ পার্শ্বনামা গজমুখ উরগফণামণ্ডিতশিরঃ শ্যামবর্ণঃ কূর্মবাহনশ্চতুর্ভুজো বীজপূরকোরগযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়ো নকুলভুজগযুক্তবাম-পাণিযুগশ্চ ॥২৩॥

বামন, মতান্তরে পার্শ্ব যক্ষ, গজমুখাকৃতি, সর্পফণাশির, শ্যামবর্ণ, কচ্ছপবাহন ও চতুর্ভুজযুক্ত। দক্ষিণ ভুজদ্বয়ে বীজপূরক ও সর্প এবং বাম বাহুদ্বয়ে নকুল ও সর্প আছে।

(২৪)

মাতঙ্গো যক্ষঃ শ্যামবর্ণো গজবাহনো দ্বিভুজো নকুলযুক্তদক্ষিণভুজো বামকরধৃতবীজপূরকশ্চেতি ॥২৪॥

মাতঙ্গ যক্ষ—শ্যামবর্ণ, গজবাহন, দ্বিভুজযুক্ত, দক্ষিণ হস্তে নকুল এবং বাম হস্তে বীজপূরক আছে।

চতুর্বিংশতি যক্ষিণী

(১)

আদিজিনস্য চক্রেশ্বরী দেবী মতান্তরেণাপ্রতিচক্রা সুবর্ণবর্ণা গরুড়বাহনা অষ্টকরা বরদবাণচক্রপাশযুক্তদক্ষিণপাণিচতুষ্টয়া ধনুর্বজ্রচক্রাঙ্কুশযুক্তবামপাণিচতুষ্টয়া চ ॥১॥

চক্রেশ্বরী দেবী, মতান্তরে অপ্রতিচক্রা দেবী—সুবর্ণবর্ণা, গরুড়বাহনা, অষ্টভুজা। দক্ষিণপাণিচতুষ্টয়ে বরমুদ্রা, বাণ, চক্র ও পাশ এবং বাম করচতুষ্টয়ে ধনু, বজ্র, চক্র ও অঙ্কুশ আছে।

(২)

শ্রীঅজিতজিনস্যাজিতাঽজিতবলা বা দেবী গৌরবর্ণা লোহাসনাধিরূঢ়া চতুর্ভুজা বরদপাশকাধিষ্ঠিতদক্ষিণকরদ্বয়া বীজপূরকাঙ্কুশালঙ্কৃতবামপাণিদ্বয়া চ ॥২॥

অজিতা দেবী বা অজিতবলা দেবী—গৌরবর্ণা, লোহাসনাধিরূঢ়া, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বাম হস্তদ্বয়ে বীজপূরক ও অঙ্কুশ আছে।

(৩)

শ্রীসম্ভবস্য দুরিতারিদেবী গৌরবর্ণা মেষবাহনা চতুর্ভুজা বরদাক্ষসূত্রভূষিতদক্ষিণভুজদ্বয়া ফলাভয়ান্বিতবামকরদ্বয়াচ ॥৩॥

দুরিতারি দেবী—গৌরবর্ণা, মেষবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অক্ষসূত্র এবং বাম হস্তদ্বয়ে ফল ও অভয়মুদ্রা আছে।

(৪)

শ্রীঅভিনন্দনস্য কালীনাম্না দেবী শ্যামকান্তিঃ পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বরদপাশাধিষ্ঠিতদক্ষিণকরদ্বয়ানাগাঙ্কুশালঙ্কৃতবামপাণিদ্বয়া চ ॥৪॥

কালী দেবী—শ্যামকান্তি, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বাম করদ্বয়ে নাগ ও অঙ্কুশ আছে।

(৫)

শ্রীসুমতের্মহাকালী দেবী সুবর্ণবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বরদপাশাধিষ্ঠিত-দক্ষিণকরদ্বয়া মাতুলিঙ্গাঙ্কুশযুক্তবামপাণিদ্বয়া চ ॥৫॥

মহাকালী দেবী—স্বর্ণবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বাম করদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও অঙ্কুশ আছে।

(৬)

শ্রীপদ্মপ্রভস্যাচ্যুতা মতান্তরেণ শ্যামাদেবী শ্যামবর্ণা নরবাহনা চতুর্ভুজা বরদবাণান্বিতদক্ষিণকরদ্বয়া কার্মুকাভয়যুক্তবামপাণিদ্বয়া চ ॥৬॥

অচ্যুতা, মতান্তরে শ্যামা দেবী—শ্যামবর্ণা, নরবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বরমুদ্রা ও বাণ এবং বাম করদ্বয়ে কার্মুক ও অভয় মুদ্রা আছে।

(৭)

শ্রীসুপার্শ্বস্য শান্তা দেবী সুবর্ণবর্ণা গজবাহনা চতুর্ভুজা বরদাক্ষসূত্রযুক্ত-দক্ষিণকরদ্বয়া শূলাভয়যুক্তবামহস্তদ্বয়া চ ॥৭॥

শান্তা দেবী—সুবর্ণবর্ণা, গজবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অক্ষসূত্র এবং বাম হস্তদ্বয়ে শূল ও অভয়মুদ্রা আছে।

(৮)

শ্রীচন্দ্রপ্রভস্য জ্বালা মতান্তরেণ ভৃকুটির্দেবী পীতবর্ণা বরালকাখ্যজীববিশেষ-বাহনা চতুর্ভুজা খড়্গমুদ্গরভূষিতদক্ষিণকরদ্বয়া ফলকপরশুযুতবামপাণিদ্বয়া চ ॥৮॥

জ্বালা, মতান্তরে ভৃকুটিদেবী—পীতবর্ণা, বরালক (জীববিশেষ)-বাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করযুগলে খড়্গ ও মুদ্গর এবং বাম করযুগলে ফলক ও পরশু আছে।

(৯)

শ্রীসুবিধেঃ সুতারাদেবী গৌরবর্ণা বৃষভবাহনা চতুর্ভুজা বরদাক্ষসূত্রযুত-দক্ষিণকরদ্বয়া কলশাঙ্কুশান্বিতবামপাণিদ্বয়া চ ॥৯॥

সুতারা দেবী—গৌরবর্ণা, বৃষভবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ ভুজদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অক্ষসূত্র এবং বাম ভুজদ্বয়ে কলশ ও অঙ্কুশ আছে।

(১০)

শ্রীশীতলস্যাশোকাদেবী নীলবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বরদপাশযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়া ফলকাঙ্কুশযুক্তবামপাণিদ্বয়া চ ॥১০॥

অশোকা দেবী—নীলবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ বাহুযুগলে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বাম বাহুযুগলে ফলক ও অঙ্কুশ আছে।

(১১)

শ্রীশ্রেয়াংসস্য শ্রীবৎসাদেবী মতান্তরেণ মানবী গৌরবর্ণা সিংহবাহনা চতুর্ভুজা বরদপাশযুক্তদক্ষিণকরদ্বয়া কলশাঙ্কুশযুক্তবামপাণিদ্বয়া চ ॥১১॥

শ্রীবৎসা দেবী, মতান্তরে মানবী দেবী—গৌরবর্ণা, সিংহবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বামকরদ্বয়ে কলশ ও অঙ্কুশ আছে।

(১২)

শ্রীবাসুপূজ্যস্য প্রবরাদেবী মতান্তরেণ চণ্ডা শ্যামবর্ণা, তুরগবাহনা চতুর্ভুজা বরদশক্তিযুতদক্ষিণকরযুগা পুষ্পগদাযুতবামকরদ্বয়া চ ॥১২॥

প্রবরা বা চণ্ডা দেবী—শ্যামবর্ণা, তুরগবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বরমুদ্রা ও শক্তি এবং বাম করদ্বয়ে পুষ্প ও গদা আছে।

(১৩)

শ্রীবিমলস্য বিজয়া মতান্তরেণ বিদিতা দেবী হরিতালবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বাণপাশযুক্তদক্ষিণকরদ্বয়া ধনুর্নাগযুতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ১৩ ॥

বিজয়া, মতান্তরে বিদিতা দেবী—হরিতালবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বাণ ও পাশ এবং বাম হস্তদ্বয়ে ধনু ও নাগ আছে।

(১৪)

শ্রীঅনন্তজিনস্য অঙ্কুশাদেবী গৌরবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা খড়্গপাশযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়া ফলকাঙ্কুশযুক্তবামকরদ্বয়া চ ॥ ১৪ ॥

অঙ্কুশা দেবী—গৌরবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে খড়্গ ও পাশ এবং বাম হস্তদ্বয়ে ফলক ও অঙ্কুশ আছে।

(১৫)

শ্রীধর্মস্য পন্নগাদেবী মতান্তরেণ কন্দর্পা গৌরবর্ণা মৎস্যবাহনা চতুর্ভুজা উৎপলাঙ্কুশযুক্তদক্ষিণ পাণিদ্বয়া পদ্মাভয়াযুতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ১৫ ॥

পন্নগা দেবী, মতান্তরে কন্দর্পা দেবী—গৌরবর্ণা, মৎস্যবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে পদ্ম ও অঙ্কুশ এবং বাম পাণিদ্বয়ে পদ্ম ও অভয় মুদ্রা আছে।

(১৬)

শ্রীশান্তিনাথস্য নির্বাণীদেবী কনকরুচি পদ্মাসনা পুস্তকোৎপলযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়া কমণ্ডলুকমলকলিতবামকরদ্বয়া চ ॥ ১৬ ॥

নির্বাণীদেবী— স্বর্ণবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে পুস্তক ও পদ্ম এবং বাম করদ্বয়ে কমণ্ডলু ও কমল আছে।

(১৭)

শ্রীকুন্থোরচ্যুতাদেবী মতান্তরেণ বলাভিধানা কনকচ্ছবির্ময়ূরবাহনা চতুর্ভুজা বীজপূরকশূলাহিতদক্ষিণপাণিদ্বয়া মুষুণ্ডিপদ্মান্বিতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ১৭ ॥

অচ্যুতা, মতান্তরে বলা দেবী—কনকছবি, ময়ূরবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বীজপূরক ও শূল এবং বাম পাণিদ্বয়ে মুষুণ্ডি ও পদ্ম আছে।

(১৮)

শ্রীঅরজিনস্য ধারণী দেবী নীলবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা মাতুলিঙ্গোৎপলযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়া পদ্মাক্ষসূত্রান্বিতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ১৮ ॥

ধারণী দেবী—নীলবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও পদ্ম এবং বাম পাণিদ্বয়ে পদ্ম ও অক্ষসূত্র আছে।

(১৯)

শ্রীমল্লিজিনস্য বৈরোট্যা দেবী কৃষ্ণবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বরদাক্ষসূত্রযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়া বীজপূরকশক্তিযুত বামপাণিদ্বয়া চ ॥ ১৯ ॥

বৈরোট্যা দেবী—কৃষ্ণবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অক্ষসূত্র এবং বাম করদ্বয়ে বীজপূরক ও শক্তি আছে।

(২০)

শ্রীমুনিসুব্রতস্য অচ্ছুপ্তাদেবী মতান্তরেণ নরদত্তা কনকরুচির্ভদ্রাসনারূঢ়া চতুর্ভুজা বরদাক্ষসূত্রযুতদক্ষিণ ভুজদ্বয়া বীজপূরকশূলযুক্তবামকরদ্বয়া চ ॥ ২০ ॥

অচ্ছুপ্তাদেবী, মতান্তরে নরদত্তা—কনকবর্ণা, ভদ্রাসনারূঢ়া, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অক্ষসূত্র এবং বাম করদ্বয়ে বীজপূরক ও শূল আছে।

(২১)

শ্রীনমিজিনস্য গান্ধারী দেবী শ্বেতবর্ণা হংসবাহনা চতুর্ভুজা বরদখড়্গযুক্ত দক্ষিণকরদ্বয়া বীজপূরককুন্তকলিতবামকরদ্বয়া চ॥ ২১ ॥

গান্ধারী দেবী—শ্বেতবর্ণা, হংসবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও খড়্গ এবং বাম হস্তদ্বয়ে বীজপূরক ও কুন্ত (বর্শাবিশেষ) আছে।

(২২)

শ্রীনেমিজিনস্য অম্বাদেবী কনককান্তিরুচিঃ সিংহবাহনা চতুর্ভুজা আম্রলুম্বিপাশযুক্ত দক্ষিণকরদ্বয়া পত্রাঙ্কুশাসক্তবামকরদ্বয়া চ ॥২২॥

অম্বা দেবী—স্বর্ণবর্ণা, সিংহবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে আম্রলুম্বি ও পাশ এবং বাম করদ্বয়ে পুত্র ও অঙ্কুশ আছে।

(২৩)

শ্রীপার্শ্বজিনস্য পদ্মাবতীদেবী কণকবর্ণা কুর্কুটসর্পবাহনা চতুর্ভুজা পদ্মপাশান্বিতদক্ষিণকরদ্বয়া ফলাঙ্কুশাধিষ্ঠিত বামকরদ্বয়া চ ॥২৩॥

পদ্মাবতী দেবী—কনকবর্ণা, কুর্কুটসর্পবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে পদ্ম ও পাশ এবং বাম করদ্বয়ে ফল ও অঙ্কুশ আছে।

(২৪)

শ্রীবীরজিনস্য সিদ্ধায়িকাদেবী হরিদ্বর্ণা সিংহবাহনা চতুর্ভুজা পুস্তকাভয়যুক্তদক্ষিণকরদ্বয়াবীজপূরকবীণাভিরামবামকরদ্বয়া চেতি ॥২৪॥

সিদ্ধায়িকা দেবী—হরিদবর্ণা, সিংহবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করযুগলে ক্রমান্বয়ে পুস্তক ও অভয়মুদ্রা এবং বাম করযুগলে বীজপূরক এবং বীণাযন্ত্র আছে।

জৈন রামায়ণ

[পূর্বানুবৃত্তি]

এবারে আমরা জৈন রামায়ণের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বিবৃত করব। তাতে প্রচলিত রামায়ণের সঙ্গে তার সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্য দুইই চোখে পড়বে। প্রথমে আমরা বিমল স্থরীর পউম চরিয়ের আখ্যান বিবৃত করছি।

বিমলস্থরীর পউম চরিয়—মগধের রাজা শ্রেণিক (বিম্বিসার) মহাবীর শিষ্য গৌতমের কাছে যথার্থ রামায়ণ শুনবার বাসনা প্রকট করায় গৌতম রামচরিত্র বিবৃত করছেন। প্রথমে তিনি বিদ্যাধর লোক, রাক্ষস বংশ ও বানর বংশের পরিচয় দিচ্ছেন। ১-২০ পর্বকে তাই রাবণ চরিত্র এই আখ্যা দেওয়া যায়। রাবণ চরিত্র বাল্মীকি রামায়ণে উত্তরাকাণ্ডে বিবৃত হয়েছে কিন্তু বাস্তবে সেই বিবরণের সঙ্গে এই বিবরণের কোনো মিল নেই।

রাক্ষসরাজ রত্নশ্রবা ও কেকসীর তিন পুত্র ও এক কন্যা: দশমুখ (রাবণ), ভানুকর্ণ (কুম্ভকর্ণ), বিভীষণ ও চন্দ্রনখা (স্থর্পনখা)। রত্নশ্রবা যখন প্রথম পুত্রমুখ দেখেন তখন তিনি তার গলায় এক দিব্য মালা পরিয়ে দেন। সেই দিব্যমালার মণিতে নবজাতকের নয়টী মুখ প্রতিবিম্বিত হয় এজন্য রাক্ষসরাজ পুত্রের নাম দেন দশমুখ। দশ মুখ বড় হয়ে নিজের মাসতুতো ভাই বৈশ্রমণের (কুবের) ঐশ্বর্য দেখে ঈর্ষ্যান্বিত হন ও বিদ্যালাভের জন্য ভাইদের নিয়ে তপশ্চর্যায় যান। তপস্যায় সিদ্ধকাম হয়ে মন্দোদরী প্রভৃতি ৬০০০ বিদ্যাধর কন্যাকে বিবাহ করে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এরপর যুদ্ধে বৈশ্রমণ ও যমকে পরাস্ত করে তিনি পুষ্পক রথ প্রাপ্ত হন।

রাবণ ও বালি সংক্রান্ত যে বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা এরূপ —রাবণ বালির কাছে এই বলে দূত প্রেরণ করছেন যে বালি (১) তাঁকে এসে প্রণাম করবে ও (২) তাঁর বোন শ্রীপ্রভাকে তাঁকে দান করবে। বালি জীবনে এক তীর্থংকর ছাড়া আর কারু কাছে মাথা নত করেন নি। তাই

তিনি সুগ্রীবকে রাজ্য দিয়ে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করে ঋষভদেবের নির্বাণ স্থান অষ্টাপদে (কৈলাশ) তপস্যা করতে চলে গেলেন আর সুগ্রীব সুপ্রভাকে রাবণের হাতে সম্প্রদান করে তাঁকে প্রণাম করে গেলেন।

বালি কর্তৃক রাবণ পরাজয়ের বৃত্তান্তও লিপিবদ্ধ হয়েছে। তা এরূপ— এক সময়ে রাবণ অষ্টাপদে ভরত নির্মিত ঋষভদেবের মন্দির উল্লংঘন করে যাচ্ছিলেন। সে সময় হঠাৎ তাঁর বিমান রুদ্ধ হয়ে যায়। রাবণের দৃষ্টি নীচে পতিত হয় ও তিনি সেখানে ধ্যান নিরত বালিকে দেখতে পান। বালি তাঁর বিমানের গতি রুদ্ধ করেছেন ভেবে তিনি বালিসহ সমগ্র অষ্টাপদকে তুলে ফেলতে যান। বালি তখন ভগবান ঋষভদেবের মন্দিরের ক্ষতি হবে ভেবে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে অষ্টাপদকে চেপে ধরেন। রাবণ তখন ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার করে দশ মুখে রোদন করতে সুরু করলেন। দশ মুখে রোদন করেছিলেন বলে তাঁর নাম হল রাবণ। এই বিবরণের সঙ্গে প্রচলিত রামায়ণের শিব কর্তৃক কৈলাস পর্বত চেপে ধরার বিবরণের বেশ মিল আছে।

এরপর রাবণ সহস্রকিরণ, নলকুবের, ইন্দ্র, বরুণ এদের পরাস্ত করছেন তবে যম, ইন্দ্র, বরুণ কেউই দেবতা নন—এঁরা সকলেই মর্ত্যের মানুষ, সাধারণ রাজা। রাবণ বিদ্যাধর কুমার খরদূষণের সঙ্গে বোন চন্দ্রনখার বিবাহ দেন। খরদূষণের শম্বুক ও অনঙ্গকুসুমা নামে এক পুত্র ও এক কন্যা হয়।

রাবণের চরিত্র চিত্রণও বাল্মীকি রামায়ণ হতে স্বতন্ত্র। রাবণের চরিত্র অনেকটা ধর্মভীরু জৈন শ্রাবকের মতো। তিনি তীর্থংকরদের উপাসনা করেন, ভগ্নমন্দিরাদির সংস্কার করেন, যেখানে পশুবলি দওয়া হয় সেই সব যজ্ঞ পণ্ড করেন। ধর্মভয়ে নলকুবেরের স্ত্রী উপরম্ভার প্রেম তিনি প্রত্যাখ্যান করছেন এবং অনন্তবীর্যের ধর্মোপদেশ শুনে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করলে সেই নারী সম্ভোগ হতে বিরত থাকবেন এই ব্রত গ্রহণ করছেন।

হনুমান চরিত্রও বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়েছে। তিনি পবনঞ্জয় ও অঞ্জনার পুত্র। বরুণের বিরুদ্ধে রাবণকে যুদ্ধে সাহায্য করায় তিনি খরদূষণের কন্যা অনঙ্গকুসুমাকে পত্নীরূপে লাভ করছেন। অনঙ্গকুসুমা ছাড়াও হনুমানের আরো অনেক বিবাহ বর্ণিত হয়েছে।

২১-৩২ পর্বে রামসীতার জন্ম ও বিবাহ। দশরথের বংশাবলী দিয়ে এই অংশের প্রারম্ভ। দশরথের দুই স্ত্রী—অপরাজিতা ও সুমিত্রা। একদিন নারদ দশরথকে এসে বললেন যে কোন দৈবজ্ঞ রাবণকে নাকি বলেছে যে জনক-কন্যা সীতার জন্য দশরথপুত্র সাগর লঙ্ঘন করে এসে তাঁকে বধ করবে। তাই তাঁকে ও জনককে বধ করবার জন্য রাবণ বিভীষণকে প্রেরণ করছেন। নারদ জনককে গিয়েও সেই কথা বললেন। সেকথা শুনে মন্ত্রীদের পরামর্শে নিজেদের প্রতিরূপ প্রাসাদে রেখে জনক ও দশরথ উভয়েই দেশ পর্যটনে বার হয়ে গেলেন। বিভীষণও সেই অবসরে এসে তাঁদের প্রতিমূর্তির মস্তকচ্ছেদন করে দেশে ফিরে গেলেন। দেশ পর্যটন কালে দশরথ কৈকেয়ীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হন ও কৈকেয়ীর বরমাল্য লাভ করেন। উপস্থিত অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে দশরথের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কৈকেয়ী দশরথের সারথ্য করে তাঁর বর লাভ করেন। কৈকেয়ী বর তখন তখনই প্রার্থনা না করে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেন। দশরথের সন্ততি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে অপরাজিতার গর্ভে রাম বা পদ্মের জন্ম হয়। সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণের। ভরত ও শত্রুঘ্ন কৈকেয়ীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (রবিষেণের পদ্মচরিতে শত্রুঘ্ন সুপ্রভা নামে অন্য এক মহিষীর পুত্র।)

জনকের ঔরসে বিদেহার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। পুত্রের নাম ভামণ্ডল, কন্যার নাম সীতা। ভামণ্ডল জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কোন অপদেবতা কর্তৃক অপহৃত হন। তিনি তাঁকে বৈতাঢ্য পর্বতে ফেলে দিয়ে যান। সেখানে বিদ্যাধরদের রাজা চন্দ্রগতি তাঁকে প্রাপ্ত হন ও পুত্রের মতো লালন পালন করেন। এদিকে সীতাও বড় হয়ে উঠেছেন। রাম জনককে ম্লেচ্ছদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করায় সীতাকে পত্নীরূপে পাবার বাগদান প্রাপ্ত হন।

কোনো কারণে জনক প্রাসাদে নারদ অপমানিত হওয়ায় তিনি ভামণ্ডলের কাছে গিয়ে সীতার রূপ বর্ণনা করেন। ভামণ্ডল সীতাকে প্রার্থনা করে জনকের কাছে দূত পাঠান। জনক বাগদানের কথা বলেন কিন্তু ভামণ্ডল সেকথা কানে নেন না। তিনি এক দৈব ধনুক পাঠিয়ে দিয়ে বলে পাঠালেন যে, যে এই ধনুক ভঙ্গ করবে সেই সীতাকে লাভ করবে। যদি কেউ সেই ধনুক

ভাঙতে না পারে তবে বিদ্যাধরেরা সীতাকে তুলে নিয়ে যাবে। রাম কিন্তু সেই ধনুক ভাঙতে সমর্থ হন ও সীতাকে লাভ করেন। ভামণ্ডলও সেখানে এসে নিজের যথার্থ পরিচয় জানতে পারেন। তিনি কিছুদিন জনকের গৃহে বাস করে বৈতাঢ্য পর্বতে ফিরে যান।

এরপর দশরথের বৈরাগ্য, রামকে রাজ্য দেবার বাসনা প্রকাশ, কৈকেয়ীর ভরতের জন্য রাজ্য কামনা করে বর প্রার্থনা ও রামের সীতা ও লক্ষ্মণসহ দাক্ষিণাত্যের দিকে গমন বর্ণিত হয়েছে। দশরথ শ্রমণ দীক্ষা নিয়ে কঠোর তপশ্চর্যায় নিরত হলে অনুতপ্তা কৈকেয়ী রামকে ফিরিয়ে আনবার জন্য ভরতকে প্রেরণ করছেন। কিন্তু রাম ফিরতে স্বীকৃত হচ্ছেন না, এমন কি কৈকেয়ীর অনুরোধেও না। ভরত তাই ফিরে এসে রাজ্যভার গ্রহণ করছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করছেন রাম ফিরে এলে রাজ্য পরিত্যাগ করে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করবেন।

৩৩-৪২ পর্ব বন ভ্রমণ। কিন্তু এর সঙ্গে বাল্মীকি রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের কোনো মিল নেই। এই সময়ে লক্ষ্মণ বজ্রকর্ণ-বিরোধী সিংহোদরকে, কল্যাণ মালিনীর পিতাকে অবরোধকারী ম্লেচ্ছরাজকে এবং ভরত বিরোধী অতিবীর্যকে পরাস্ত করছেন। যুদ্ধ জয়ের জন্য তিনি বজ্রকর্ণের ৮ এবং সিংহোদরাদির ৩০০ মেয়েকে লাভ করছেন। এঁদের অতিরিক্ত বনমালা, রতিমালা ও জিতপদ্মাকেও তিনি লাভ করছেন।

কপিল নামক ব্রাহ্মণ ও দেবভূষণ ও পদ্মভূষণ নামক মুনির সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকার বর্ণিত হয়েছে। রামের আজ্ঞায় রাজা সুরপ্রভ বংশ পর্বতে অনেক জৈন মন্দির নির্মাণ করাচ্ছেন যার জন্য বংশ পর্বতের নাম হচ্ছে রামগিরি।

৪৩-৫৩ পর্বে সীতা হরণ ও সীতানুসন্ধান বর্ণিত হয়েছে। সেই বৃত্তান্ত এই রকম—খরদূষণপুত্র শম্বুক সূর্যহাস নামক দৈব খড়্গ পাবার জন্য ১২ বছরের তপস্যায় নিরত হয়েছেন। সেই তপস্যায় খড়্গও উৎপন্ন হয়েছে। তবে তপস্যা শেষ হতে তখনো তিন দিন বাকী। ঠিক সেই সময়ে সেখানে লক্ষ্মণ এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং আশ্চর্য দৈব খড়্গ দেখে তার ধার পরীক্ষা করতে গিয়ে বংশ দণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে তপস্যা নিরত শম্বুকের

শিরশ্ছেদ করছেন। লক্ষ্মণের এতে অনুতাপ হচ্ছে ও তিনি সমস্ত ঘটনা রামকে গিয়ে নিবেদন করছেন। রাম তাঁকে সাবধান হবার উপদেশ দিচ্ছেন। ওদিকে চন্দ্রনখা পুত্রের তত্ত্বাবধান করতে এসে তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছেন। তিনি তখন বিলাপ করতে করতে রাম লক্ষ্মণ যেখানে রয়েছেন সেখানে এসে উপস্থিত হচ্ছেন ও তাঁদের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাঁদের প্রেম ভিক্ষা করছেন। রাম লক্ষ্মণ অস্বীকৃত হলে তিনি খরদূষণকে পুত্রের মৃত্যু ও রাম লক্ষ্মণের হাতে নিজের অপমানের কথা বলছেন। রাবণকেও সেই খবর পাঠান হচ্ছে। রাবণ সেখানে এসে সীতাকে দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন। লক্ষ্মণ ওদিকে একাই খরদূষণের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। রাবণ অবলোকিনী বিদ্যা-প্রভাবে সংকেতের কথা জানতে পেরে সংকেতানুরূপ সিংহনাদ করছেন এবং রাম সেই সংকেত পেয়ে লক্ষ্মণের সাহায্যের জন্য যুদ্ধে যাচ্ছেন। সেই অবসরে রাবণ সীতাকে হরণ করছেন।

সুগ্রীবের কাহিনীও প্রচলিত রামায়ণ হতে সম্পূর্ণ-ই ভিন্ন। সাহসগতি সুগ্রীবের রূপ ধারণ করে সুগ্রীবের রাজ্য ও স্ত্রী অধিকার করেন। রাম সাহসগতিকে পরাস্ত করে সুগ্রীবকে রাজ্য ফিরিয়ে দিচ্ছেন। বিনিময়ে সুগ্রীব রামকে নিজের তেরটী মেয়ে দান করছেন। কিন্তু সীতা বিরহে তাঁদের সাহচর্যেও রামের সুখ হচ্ছে না। তখন সুগ্রীব সীতানুসন্ধানের জন্য চারিদিকে বিদ্যাধরদের প্রেরণ করছেন। সুগ্রীব রত্নজটীর কাছে জানতে পারছেন যে রাবণ সীতাকে হরণ করেছেন। রাবণের কথা শুনে বিদ্যাধরেরা ভয়ে রামকে সাহায্য করতে অস্বীকার করছেন। তখন সুগ্রীবের মনে পড়ে যায় যে অনন্ত-বীর্য বলেছিলেন যিনি কোটি-শীলা তুলতে পারবেন তিনি রাবণকে বধ করবেন। তখন সকলে মিলে বিমানে করে কোটি-শীলার কাছে যাচ্ছেন। লক্ষ্মণ কোটি-শীলাকে তুলছেন, তবু বিদ্যাধরদের ভয় যাচ্ছে না। তাঁরা হনুমানকে রাবণের কাছে দূত রূপে পাঠাতে বলছেন। হনুমান বিভীষণের সাহায্যে রাবণকে বোঝাবেন। হনুমান পথে মহেন্দ্রাদিকে পরাস্ত করে বিভীষণ নির্মিত প্রাচীর উত্তীর্ণ হয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করছেন। সীতা ও বিভীষণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হচ্ছে। পরে উদ্যানাদি বিনষ্ট করায় ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক ধৃত হয়ে তিনি রাবণের সম্মুখে নীত হচ্ছেন। নিজেই বন্ধন

মুক্ত হয়ে রাবণকে তিরস্কার করে তিনি রামের কাছে আবার ফিরে আসছেন।

এরপর ৫৪ হতে ৭৭ পর্ব যুদ্ধ কথা। এখানে সেতু বন্ধের পরিবর্তে প্রথমেই সমুদ্র নামক রাজা কর্তৃক বিদ্যাধর সৈন্যদের পথরোধ ও নল কর্তৃক সমুদ্র রাজার পরাজয় বর্ণিত হয়েছে। পরাজিত হয়ে রাজা সমুদ্র লক্ষ্মণকে চার কন্যা দান করছেন।

বিভীষণ সীতাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য রাবণকে পরামর্শ দিচ্ছেন। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণ বিভীষণকে নির্বাসিত করছেন। নির্বাসিত বিভীষণ হংসদ্বীপে গিয়ে সসৈন্যে রামের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন। সেই সময় সীতার ভাই ভামণ্ডলও তাঁর সৈন্য নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হচ্ছেন।

রাম ও লক্ষ্মণের পরিবর্তে সুগ্রীব ও ভামণ্ডল ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক নাগপাশে বদ্ধ হচ্ছেন। গরুড়কেতু লক্ষ্মণ তাঁদের নাগপাশ হতে মুক্ত করছেন।

ইন্দ্রজিৎ ও ভানুকর্ণ যুদ্ধে বন্দী হচ্ছেন।

লক্ষ্মণ শক্তিশেলে আহত হলে দ্রোণ কন্যা বিশল্যা তাঁর চিকিৎসা করে তাঁকে সুস্থ করে তুলছেন। লক্ষ্মণের সঙ্গে বিশল্যার বিবাহ হচ্ছে।

রাবণ দূত প্রেরণ করে সন্ধির প্রস্তাব করছেন। রাবণ তাঁর রাজ্যের একাংশ রামকে ছেড়ে দেবেন ও ৩০০ কন্যা দান করবেন। পরিবর্তে রাম সীতাকে পরিত্যাগ করবেন ও ইন্দ্রজিৎ ও ভানুকর্ণকে মুক্তি দেবেন।

রাবণ বহুরূপা নামক বিদ্যা আয়ত্ব করবার জন্য শান্তিনাথ জিনালয়ে গিয়ে ধ্যান নিরত হচ্ছেন। বিদ্যাধরেরা তাঁর ধ্যান ভাঙবার বিফল প্রযত্ন করছে। রাবণ বিদ্যালাভ করতে সমর্থ হচ্ছেন ও সীতাকে গিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন যে তিনি রামকে বধ করে তাঁকে বিবাহ করবেন। সীতা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ছেন। রামের প্রতি সীতার অটুট অনুরাগ দেখে রাবণ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করছেন যে যুদ্ধে রাম ও লক্ষ্মণকে পরাজিত করে তিনি রামকে সীতা ফিরিয়ে দেবেন।

যুদ্ধে লক্ষ্মণ (বাসুদেব) রাবণকে (প্রতি-বাসুদেব) চক্র দিয়ে বধ করছেন।

যুদ্ধান্তে ভানুকর্ণ ও ইন্দ্রজিৎ, মেঘবাহনাদি রাবণপুত্রেরা মুক্তি লাভ

করছেন। তাঁরা সংসার বিরক্ত হয়ে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করছেন। মন্দোদরী, চন্দ্রনখা আদি মহিলারাও সাধ্বীধর্ম গ্রহণ করছেন।

রাম লঙ্কায় প্রবেশ করে সীতাকে গ্রহণ করছেন। সন্দেহ বা অগ্নি পরীক্ষার কোনো কথাই এখানে নেই।

রাম লক্ষ্মণ বন ভ্রমণের সময় যে সমস্ত কন্যাদের লাভ করেছিলেন তাঁদের সকলকে লঙ্কায় ডেকে পাঠাচ্ছেন। রাম লক্ষ্মণ লঙ্কায় ছয় বছর বাস করছেন।

উত্তর চরিত ৭৮ হতে ১১৮ পর্ব। নারদ রামের কাছে এসে রাম মাতা অপরাজিতার দুর্দশার কথা বলছেন। রামের অদর্শনে তাঁর দিন যেন আর কিছুতেই কাটতে চাইছে না। রাম তখন সাকেতে ফিরে যাওয়া স্থির করছেন। তাঁরা ফিরে গেলে ভরত রাজ্য পরিত্যাগ করে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করছেন। লক্ষ্মণের রাজ্যাভিষেক হচ্ছে ও তিনি বিদ্যাধর রাজাদের ওপর জয়লাভ করে অর্দ্ধ চক্রবর্তী রাজা হচ্ছেন। সীতা পরিত্যাগের কাহিনী মোটামুটি বাল্মীকির অনুরূপ। সীতার পুত্রদের নাম লবণ (অনঙ্গ-লবণ) ও অংকুশ (মদনাঙ্কুশ)। নারদ কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে তাঁরা রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। যুদ্ধশেষে সুগ্রীব, হনুমান ও বিভীষণের পরামর্শে রাম সীতাকে ডেকে পাঠাচ্ছেন। সীতা অগ্নি পরীক্ষা দিচ্ছেন। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সংসারাশ্রমে আর ফিরে আসছেন না, সাধ্বীধর্ম গ্রহণ করছেন।

রাম ও লক্ষ্মণের প্রণয় পরীক্ষার জন্য কোন দেবতা লক্ষ্মণকে এসে বলছেন যে, রামের মৃত্যু হয়েছে। রামের মৃত্যু সংবাদে শোকাতুর লক্ষ্মণের মৃত্যু হচ্ছে ও তিনি নরকে গমন করছেন। লক্ষ্মণের মৃত্যুতে সংসার বিরক্ত হয়ে রাম শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করছেন ও ১৭০০০ বছর তপস্যা করে মোক্ষলাভ করছেন।

জৈন রামায়ণের দ্বিতীয় রূপটী গুণভদ্রের উত্তর পুরাণের। সেখানে সীতাকে রাবণ ও মন্দোদরীর কন্যা বলা হয়েছে। গুণভদ্র তাঁর পূর্ববর্তী কবি পরমেশ্বরের কথা বলেছেন তবে তিব্বতী রামায়ণে এমন কি অদ্ভুত রামায়ণেও সীতাকে মন্দোদরীর কন্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাই মনে হয় এই কাহিনীও জনসমাজে প্রচলিত ছিল এবং গুণভদ্র সম্ভবতঃ তাঁর পূর্ববর্তী কবি পরমেশ্বর (রচনা পাওয়া যায় না)-এর রচনাকে জৈনরূপ দিয়ে থাকবেন।

গুণভদ্রের অনুসরণে যে সমস্ত জৈন রামায়ণ রচিত হয়েছে তা এরূপ :

(ক) সংস্কৃত :

(১) গুণভদ্রকৃত উত্তরপুরাণ (খৃঃ ৯ম শতক)।

(২) কৃষ্ণদাস কৃত পুণ্যচন্দ্রোদয় পুরাণ (খৃঃ ১৬ শতক)।

(খ) প্রাকৃত:

(১) পুষ্পদন্তকৃত তিসট্‌ঠি মহাপুরুষ গুণালংকার (খৃঃ ১০ম শতক)।

(গ) কন্নড় :

(১) চামুণ্ডরায় কৃত ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষ পুরাণ (খৃঃ ১০ম শতক)।

(২) বন্ধুবর্মাকৃত জীবন সংবোধন (খৃঃ ১২ শ শতক)।

(৩) নাগরাজকৃত পুণ্যাস্রবকথাসার (১৩৩১ খৃঃ)।

গুণভদ্র রচিত রামায়ণ কাহিনী এরূপ :

বারাণসীর রাজা দশরথের চারপুত্র। সুবালার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে লক্ষ্মণ এবং বারাণসী হতে সাকেতে রাজধানী স্থানান্তরণের পর অন্য এক রাণীর গর্ভে ভরত ও শত্রুঘ্নের জন্ম হয়। দশানন বিনমি বংশোদ্ভূত পুলস্ত্যের পুত্র। তিনি একদিন তপস্যানিরত অমিতবেগ কন্যা মণিমতীকে দেখতে পান ও তাঁর প্রতি আসক্ত হন। রাবণ কর্তৃক তাঁর তপস্যা ভঙ্গ হওয়ায় মণিমতী সঙ্কল্প করেন যে তিনি রাবণের কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন ও তাঁর ধ্বংসের কারণ হবেন। মণিমতী মন্দোদরীর কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। দৈবজ্ঞেরা এই কন্যা তাঁর মৃত্যুর কারণ হবে বলায় রাবণ মারীচিকে সেই কন্যাকে কোথাও নিয়ে গিয়ে ফেলে আসতে বলেন। মারীচি সেই কন্যাকে মঞ্জুষায় করে মিথিলায় নিয়ে এসে মাটিতে পুঁতে দিয়ে যান। লাঙ্গল দেবার সময় সেই কন্যা ফলায় উত্থিত হলে সেই কন্যাকে জনকের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। জনক সেই কন্যাকে সীতা নাম দিয়ে নিজের মেয়ের মতো পালন করতে লাগলেন।

সীতা ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠলেন। ওদিকে জনক যজ্ঞ রক্ষার জন্য রাম ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করলেন, যজ্ঞ সমাপ্তির পর জনক রামকে সীতাসহ ৮টি কন্যা সম্প্রদান করলেন। লক্ষ্মণের সঙ্গে পৃথিবী আদি ষোলটি কন্যার বিবাহ হল। বিবাহের পর রাম ও লক্ষ্মণ পিতার আজ্ঞা নিয়ে বারাণসীতে গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

নারদের মুখে সীতার রূপলাবণ্যের কথা জানতে পেরে রাবণ সীতাকে হরণ করার সিদ্ধান্ত করলেন ও সীতার মন বোঝবার জন্য সূর্পনখাকে দূতীরূপে প্রেরণ করলেন। সূর্পনখা রাবণকে এসে বললেন যে সীতার মন পাওয়া সহজ নয়।

রামসীতা যখন বারাণসীর নিকটস্থ চিত্রকূট উদ্যানে বিহার করতে গেছেন তখন রাবণ সীতাকে হরণ করতে এলেন। মারীচি স্বর্ণ মৃগ হয়ে রামকে ভুলিয়ে নিয়ে গেলে রাবণ রামরূপ ধারণ করে এসে সীতাকে তাঁর পালকী-রূপী পুষ্পকে আরোহণ করতে বললেন। আরো বললেন, তিনি স্বর্ণমৃগকে প্রাসাদে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সীতা পালকীতে আরোহণ করলে রাবণ তাঁকে নিয়ে লঙ্কায় চলে গেলেন।

রাবণ সীতাকে অপহরণ করেছেন রাজা দশরথ স্বপ্নে তা অবগত হলেন। তিনি সেকথা রামকে বলে পাঠালেন। ইতিমধ্যে সুগ্রীব ও হনুমান বালির বিরুদ্ধে সাহায্য লাভের জন্য রামের নিকট এসেছেন। হনুমান লঙ্কায় গিয়ে সীতার সংবাদ নিয়ে এলেন। লক্ষ্মণ বালিকে বধ করে সুগ্রীবকে রাজ্য দিলেন। তারপর রাম ও বানর সৈন্য বিমানে করে লঙ্কায় গিয়ে অবতরণ করল। যুদ্ধ শেষে লক্ষ্মণ চক্র দিয়ে রাবণকে বধ করলেন। রাম কোনরূপ পরীক্ষা না করেই সীতাকে গ্রহণ করলেন। এরপর লক্ষ্মণ দিগ্বিজয় সমাপ্ত করে ভারতবর্ষের তিনটি খণ্ডের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন। সাকেতে রাম ও লক্ষ্মণের একত্রে অভিষেক হল। কিছুদিন রাজ্য করার পর ভরত ও শত্রুঘ্নকে রাজ্য দিয়ে রাম ও লক্ষ্মণ বারাণসীতে ফিরে গেলেন। সীতার আটটী পুত্র হল। লক্ষ্মণ দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। মৃত্যুর পর তিনি নরকে গেলেন। রাম তখন লক্ষ্মণের পুত্র পৃথ্বীচন্দ্রকে সিংহাসনে ও সীতার কনিষ্ঠপুত্র অজিতঞ্জয়কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে সুগ্রীব, হনুমান ও বিভীষণসহ শ্রমণ ধর্ম অঙ্গীকার করলেন। সীতাও সাধ্বী ধর্ম গ্রহণ করলেন। রাম ও হনুমান সেই জন্মেই মুক্তিপ্রাপ্ত হন। সীতা স্বর্গে গমন করেন। লক্ষ্মণ নরক যাতনা ভোগ করে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন। সেই জীবনে কর্মক্ষয় করে তিনিও মুক্তিলাভ করবেন।

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।
- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ ফাল্গুন ১৩৮১ ॥ একাদশ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :

গণেশ লালওয়ানী

যবন দ্বাররক্ষী, রাণী গুম্ফা
উদয়গিরি, উড়িষ্যা

বৰ্দ্ধমান মহাবীর

[জীবন-চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

একদিন মুনি আর্দ্রক চলেছেন গুণশীল চৈত্যে বর্দ্ধমানকে বন্দনা করবার জন্য। পথে আজীবিক সম্প্রদায়ের নেতা গোশালকের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। গোশালক তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, আর্দ্রক, তোমায় একটা কথা বলি।

আর্দ্রক বললেন, বলুন।

আর্দ্রক, তোমার ধর্মাচার্য শ্রমণ বর্দ্ধমান আগে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ঘুরে বেড়াতেন, আর এখন অনেক সাধু সাধ্বী একত্রিত করে তাদের সম্মুখে বসে অনর্গল বকে যান।

হাঁ, তা জানি। কিন্তু আপনি কি বলতে চান?

আমি বলতে চাই যে তোমার আচার্য ভারী অস্থিরচিত্ত। আগে তিনি একান্তে থাকতেন, একান্তে বিচরণ করতেন এবং সমস্ত রকম লোক সংঘট্ট হতে দূরে থাকতেন। আর এখন সাধু ও শ্রাবকের মণ্ডলীতে বসে মনোরঞ্জক কথা ও কাহিনী শোনান। আর্দ্রক, এ ভাবে কি তিনি লোকদের খুশী করে নিজের আজীবিকা নির্বাহ করছেন না? এতে যে তাঁর পূর্ব ও বর্তমান জীবনে অসামঞ্জস্য এসে পড়েছে সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি নেই। যদি একান্ত বাসই শ্রমণের ধর্ম হয়, তবে বলতে হয় তিনি শ্রমণ ধর্ম হতে বিমুখ হয়েছেন। আর এই জীবনই যদি শ্রমণ জীবনের আদর্শ হয় তবে তাঁর পূর্ব জীবন যে ব্যর্থ গেছে সেকথা স্বীকার না করে উপায় নেই। তাই ভদ্র, যতদূর আমি বুঝতে পেরেছি তাতে তোমার আচার্যের জীবনচর্যাকে কোনো রকমেই নির্দোষ বলা যায় না।

বর্দ্ধমানের জীবন তখনই যথার্থ ছিল যখন তিনি একান্তবাসী ছিলেন ও যখন আমি তাঁর সঙ্গী ছিলাম। এখন নির্জন বাস হতে বিরক্ত হয়ে তিনি

জীবিকার জন্ত সভায় বসে উপদেশ দেবার পথ খুঁজে নিয়েছেন। তাই বলছিলাম যে তোমার ধর্মাচার্য অব্যবস্থিতচিত্ত।

আর্য, আপনি যা বলছেন তা ঈর্ষ্যাজন্ত। বাস্তবে এঁর পূর্বাপর জীবনের রহস্য আপনি বুঝতেই পারেন নি। যদি পারতেন তবে একথা বলতেন না। আপনিই বলুন তাঁর এই দুই জীবনের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? যখন তিনি ছদ্মস্থ ছিলেন, সাধন নিরত, তখন একান্তবাসীই নয়, মৌনব্রতাবলম্বীও ছিলেন। তা তপস্বীর জীবনের অনুরূপই। এখন ইনি সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী হয়েছেন। এঁর রাগদ্বেষ রূপ বন্ধন সমূলে বিনষ্ট হয়েছে। এঁর জীবনে আত্ম সাধনার স্থান তাই এখন গ্রহণ করেছে জগতের কল্যাণ; প্রাণীমাত্রের হিতকামী এই মহাপুরুষ তাই এখন জনমণ্ডলীর মধ্যে বসে উপদেশ দেন। কিন্তু তবুও তিনি একান্তবাসী। যিনি বিতরাগী তাঁর পক্ষে সভা ও বন দুই-ই সমান। যিনি নির্মল আত্মা তাঁকে সভা বা সমূহ কি করে লিপ্ত করবে? তিনি জগৎ কল্যাণের জন্ত যে উপদেশ দেন তাও তাঁর বন্ধের কারণ হয় না কারণ তাঁর কোনো বিষয়ে আগ্রহ ও অনাগ্রহ নেই।

তাহলে বিষয় ভোগ ও স্ত্রীসঙ্গাদি করাতেও বা দোষ কী? তাও তাঁর বন্ধ মোক্ষের কারণ হবে না।—বলে একটু হাসলেন গোশালক। বললেন, আমাদের শাস্ত্রে ত একথাই বলে যে একান্তবাসী তপস্বীর কোনো পাপই পাপ নয়।

যারা জেনে শুনে বিষয় ভোগ ও স্ত্রীসঙ্গ করে তারা কখনো সাধু হতে পারে না। তাহলে গৃহস্থদের সঙ্গে তাদের প্রভেদ কি? তারা সাধু নয় বা ভিক্ষু। তারা কখনো মুক্ত হতে পারে না।

আর্দ্রক, তুমি অন্য তীর্থিক সাধুদের নিন্দা করছ। তাদের ভণ্ড তপস্বী ও উদরার্থী বলে অভিহিত করছ।

না। আমি কারু ব্যক্তিগত ভাবে নিন্দা করতে চাই না। যা সত্য, সেই কথাই বলছি।

আর্দ্রক, তোমার ধর্মাচার্যের ভীরুতা বিষয়ে আর একটা গল্প বলি, শোন। আগে তিনি পান্থশালায় ও উদ্যানে অবস্থান করতেন। এখন আর তা করেন না। তিনি জানেন যে সেখানে অনেক জ্ঞানী, কুশল, মেধাবী ও পণ্ডিত

ভিক্ষু এসে থাকেন। এমন না হয়ে যায় যাতে কোনো ভিক্ষু তাঁকে কোনো প্রশ্ন করে বসেন আর তিনি তার উত্তর দিতে না পারেন। তাই তিনি আর সেই সব জায়গায় যান না।

আর্য, এ হতেই বোঝা যায় আপনি আমার ধর্মাচার্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। লোকে তাঁকে মহাবীর বলে। তিনি নামেও যেমন মহাবীর, কাজেও তেমনি মহাবীর। তাঁর মধ্যে কোথাও ভয়ের লেশমাত্র নেই। তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয় ও স্বতন্ত্র। মংখলি শ্রমণ, শুনুন, যাঁর কাছে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতেরা পরাস্ত হয়েছেন, তিনি কিনা ভয় পাবেন পান্থশালার উদরার্থী ভিক্ষুদের? কখনো না। মহাবীর বর্দ্ধমান এখন সাধারণ ছদ্মস্থ ভিক্ষু নন্ তিনি এখন জগৎ উদ্ধারক তীর্থংকর। ইনি যখন ছদ্মস্থ ছিলেন তখন ইনিও একান্তবাস করেছেন কিন্তু এখন যখন কেবল-জ্ঞান লাভ করেছেন তখন সেই জ্ঞান লোক কল্যাণের ভাবনায় সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে জনে জনে বিতরণ করছেন। তাই এমন সব জায়গায় অবস্থান করেন যেখানে বহু সংখ্যক লোকের সম্পর্কে আসা সম্ভব হয়। এতে ভয়েরই বা কি আছে? আগ্রহেরই বা কি আছে? তাছাড়া কোথায় যাওয়া, কার সঙ্গে কথা বলা এ সমস্তই তাঁর ইচ্ছাধীন। তবে পান্থশালায় বা উদ্যানগৃহে যে আর যান না তারও একটা কারণ আছে। কারণ সেখানে ত সাধারণতঃ কুতর্কী ও অবিশ্বাসী ব্যক্তিরাই ঘোরা ফেরা করে।

তবেই আর্দ্রক, শ্রমণ জ্ঞাতপুত্র নিজের স্বার্থের জন্য প্রবৃত্তিমুখী লাভার্থী বণিকের মতো হলেন না কি?

না মংখলীপুত্র, লাভার্থী বণিক পরিগ্রহ করে, জীবহিংসা করে, আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ না করে নূতন নূতন কর্ম প্রবৃত্তিতে আত্ম নিয়োগ করে। এ রকম বিষয়বদ্ধ বণিকের উপমা বর্দ্ধমানের সঙ্গে কিছুতেই দেওয়া যায় না। তাছাড়া আরম্ভ ও পরিগ্রহসেবী বণিকদের প্রবৃত্তিকে যে আপনি লাভজনক বলেছেন তাও ঠিক নয়। সে প্রবৃত্তি লাভের জন্য নয়, দুঃখের জন্য। সেই প্রবৃত্তির জন্যই না মানুষ সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করে। তাই তাকে কি আর লাভ দায়ক বলা যায়?

এভাবে আর্দ্রকের কথায় গোশালক নিরুত্তর হয়ে নিজের পথ নিলেন।

তিনি চলে যেতে শাক্যপুত্রীয় ভিক্ষুরা এগিয়ে এসে বললেন, আর্দ্রক, বণিকের দৃষ্টান্ত দিয়ে বাহ্য প্রবৃত্তির খণ্ডন করে তুমি ভাল করেছ। আমাদেরও এই মত। বাহ্য প্রবৃত্তি বন্ধ মোক্ষের কারণ নয়। কারণ অন্তরঙ্গ প্রবৃত্তি। আমাদের মতে যদি কোনো লোক খড়ের মানুষকে মানুষ জ্ঞানে শূলে দেয় তবে সে জীবহত্যার দোষে দোষী হয় আর যদি মানুষকে খড়ের পুতুল জ্ঞানে শূলে দেয় তবে তার কোনো পাপই হবে না। এরকম মানুষের মাংস বুদ্ধও ভোজন করতে পারেন। আমাদের শাস্ত্রে আছে নিত্য যে দু'হাজার বোধিসত্ব ভিক্ষুকে খাওয়ায় সে মহান পুণ্য স্কন্দের অর্জন করে মহাসত্বশালী আরোগ্যদেব হয়ে জন্ম গ্রহণ করে।

আর্দ্রক বললেন, হিংসা জন্ম কার্যকে নির্দোষ বলা সংযতের পক্ষে অযোগ্য। যাঁরা এ ধরণের উপদেশ দেন বা যাঁরা এ ধরণের উপদেশ শোনেন তাঁরা অনুচিত কাজ করেন। খড়ের ও সত্যিকার মানুষের যার জ্ঞান নেই তিনি নিশ্চয়ই মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ও অনার্য তা নইলে কি করে তিনি খড়ের মানুষকে মানুষ ও মানুষকে খড়ের মানুষ বলে মনে করছেন। ভিক্ষুর ত এ ধরণের স্থূল মিথ্যা কখনো বলা উচিত নয়, যাতে কর্ম বন্ধ হয়। শুনুন, এই সিদ্ধান্তের দ্বারা কেউ কখনো তত্বজ্ঞান লাভ করতে পারেনি, না জীবের শুভাশুভ কর্ম বিপাকের জ্ঞান। তাই যারা এই সিদ্ধান্তের অনুবর্তী তারা এই লোক করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ নয়, না পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত নিজের যশঃ বিস্তারিত করতে। ভিক্ষুগণ, যে শ্রমণ জীবের কর্ম বিপাকের কথা চিন্তা করে আহার দোষ পরিহার করেন ও অকপট বাক্যের প্রয়োগ করেন তিনিই সংযত।

যাদের হাত রক্তরঞ্জিত এ ধরণের অসংযত মানুষ দু' হাজার বোধিসত্ব ভিক্ষুদের নিত্যভোজন করালেও এখানে নিন্দাপাত্রই হন ও পরলোকে দুর্গতি-গামী। যাঁরা বলেন প্রাণী হত্যা করে আমাকে যদি কেউ মাংস ভক্ষণের জন্য আমন্ত্রণ করেন তবে সে মাংস গ্রহণে পাপ নেই তাঁরা অনার্যধর্মী ও রস-লোলুপ। এরূপ মাংস যিনি গ্রহণ করেন, পাপ কি না জানলেও, পাপেরই আচরণ করেন। যিনি সত্যিকার ভিক্ষু তিনি মনেও এ ধরণের আহার ইচ্ছা করেন না, এরূপ মিথ্যা কথা বলেন না।

জ্ঞাতপুত্রীয় শ্রমণেরা একজন্য তাঁদের জন্য উদ্দীষ্ট আহার্য গ্রহণ করেন না কারণ তাঁরা সমস্ত রকম হিংসা পরিত্যাগ করেছেন। তাই যে আহারে সামান্যতম প্রাণী হিংসারও সংভাবনা থাকে তাঁরা সে আহার গ্রহণ করেন না। সংসারে সংযতদের ধর্ম এই প্রকার। এই আহারশুদ্ধিরূপ সমাধি ও শীলপ্রাপ্ত হয়ে বৈরাগ্যভাবে যিনি নিগ্রন্থ ধর্মের আচরণ করেন তিনি কীর্তি লাভ করেন।

শাক্য ভিক্ষুকের নিরুত্তর হতে দেখে স্নাতক ব্রাহ্মণেরা এগিয়ে এলেন। বললেন, আমাদের শাস্ত্রে রয়েছে যে, যে রোজ দু'হাজার স্নাতক ব্রাহ্মণ ভোজন করায় সে মহাপুণ্য অর্জন করে' দেবগতি লাভ করে।

আর্দ্রক বললেন, গৃহস্থালীতে আসক্ত দু'হাজার স্নাতক ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে সে নরক গতিই উপার্জন করে। দয়াধর্মের নিন্দাকারী ও হিংসাধর্মের প্রশংসক ও দুঃশীল মানুষকে যে ভোজন করায় সে রাজা হলেই বা কি অধোগতিই প্রাপ্ত হয়।

তাছাড়া সেতো সত্যি ব্রাহ্মণ নয়। সেই সত্যিকার ব্রাহ্মণ যার প্রাপ্তিতে আনন্দ নেই, বিয়োগে দুঃখ বা শোক।

যে দহনোত্তীর্ণ সোনার মতো নির্মল, রাগ, দ্বেষ ও ভয় রহিত, সেই ব্রাহ্মণ।

শির মুণ্ডন করালেই যেমন শ্রমণ হয় না, তেমনি 'ওম্' উচ্চারণ করলেই ব্রাহ্মণ। সমতায় শ্রমণ হয়, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ।

কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হয়।

আর্দ্রকের স্পষ্টোক্তিতে স্নাতক ব্রাহ্মণেরা উদাসীন হলে সাংখ্যমতানুযায়ী সন্ন্যাসীরা এগিয়ে এলেন। বললেন, তোমার এবং আমাদের ধর্মে পার্থক্য খুব কমই। আমাদের দুই মতই আচার, শীল ও জ্ঞানকেই মোক্ষের অঙ্গ বলে মনে করে। সংসার বিষয়েও আমাদের মতের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। সাংখ্য দর্শনের মতে পুরুষ অব্যক্ত, মহান ও সনাতন। তার হ্রাস হয় না, না ক্ষয়। তারাগণের মধ্যে যেমন চন্দ্র তেমনি সমস্ত ভূতগণের মধ্যে সেই আত্মা একই।

আর্দ্রক বললেন, আপনাদের সিদ্ধান্তানুসারে না কারু মৃত্যু হয়, না প্রধানের সংসার ভ্রমণ। একই আত্মা স্বীকার করে নিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এ

বিভেদ যেমন থাকে না তেমনি পশু পাখী কীট পতঙ্গের বিভেদও। যাঁরা লোকস্থিতি না জেনে ধর্মের উপদেশ দেন তাঁরা নিজেরাও বিনষ্ট হন ও অন্যকেও নষ্ট করেন। কেবল-জ্ঞান লাভ করে সমাধিপূর্বক যিনি ধর্ম ও সম্যকত্বের উপদেশ দেন তিনি নিজের ও অন্যের আত্মাকে সংসার সাগর হতে উত্তীর্ণ করেন।

এভাবে একদণ্ডীদের নিরুত্তর করে আর্দ্রক যেই আগে বেরিয়ে যাবেন ওমনি হস্তিতাপস ঋষিরা এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, আমরা সমস্ত বছরে একটী মাত্র হাতী হত্যা করি এবং তারি মাংসে সমস্ত বছর জীবন ধারণ করি। এতে অন্য অনেক প্রাণীর জীবন রক্ষা হয়।

আর্দ্রক বললেন, সমস্ত বছরে একটী প্রাণী হত্যা করলেও আমি তাঁদের অহিংসক বলতে পারি না। কারণ প্রাণী হত্যা হতে আপনারা সর্বদা বিরত হননি। আপনারা যদি অহিংসক হন, তবে সংসারী জীবেরাও অহিংসক নয় কেন? কারণ তাঁরাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত জীব হত্যা করেন না। যাঁরা তাপস হয়ে যদিও সমস্ত বছরে একটী মাত্র জীব হত্যা করেন তবুও তাঁরা আত্ম কল্যাণ করেন না বরং নিরয়গামী হন। যিনি ধর্ম সমাধিতে স্থির, কায়মনোবাক্যে যিনি সমস্ত প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করেন, তিনিই যেন সংসার সমুদ্র অতিক্রম করে ধর্মের উপদেশ দেন।

হস্তিতাপসদের নিরুত্তর করে আর্দ্রক যেমন অগ্রসর হয়েছেন ওমনি হস্তিতাপসদের বন হতে সদ্য ধরে আনা হাতী শেঁকল ছিঁড়ে তাঁর দিকে ছুটে এল। লোকের মধ্যে কোলাহল উঠল। আর কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর সেই বুনো হাতী আর্দ্রক মুনিকে হয় শুঁড়ে করে জড়িয়ে দূরে ফেলে দেবে, নয়ত পিঁপড়ের মতো পায়ের তলায় পিসে মারবে। কিন্তু কি আশ্চর্য! হাতী তার কিছুই করল না। আর্দ্রকের কাছে এসে বিনীত শিষ্যের মতো মাথা নীচু করে তাঁর পায়ে প্রণাম করল। তারপর অরণ্যের দিকে ছুটে গেল।

মুহূর্তে সেকথা সবখানে ছড়িয়ে পড়ল। আর্দ্রক বুনো হাতীকে বশ করেছেন। আশ্চর্য তাঁর লব্ধি! আশ্চর্য তাঁর সিদ্ধি! মহারাজ শ্রেণিকেরো সেকথা কানে উঠল। তিনি আর্দ্রককে দেখতে এলেন। কথায় কথায়

জিজ্ঞাসা করলেন হাতী কেন শেঁকল ছিড়ে তাঁকে প্রণাম করে অরণ্যের গভীরতায় চলে গেল।

শুনে আর্দ্রক বললেন মহারাজ, লোহার শেঁকল ভাঙা এমন কি আর শক্ত —যত শক্ত কাঁচা সুতোর বাঁধন ছেঁড়া। আমাকে সেই কাঁচা সুতোর বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে দেখে সে তার লোহার শেঁকল ভেঙে আমায় প্রণাম করে অরণ্যের অবাধ জীবনে ফিরে গেল।

শ্রেণিক আর্দ্রকের কথার তাৎপর্য ঠিক ধরতে পারলেন না। তাই তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

আর্দ্রক বললেন, মহারাজ, 'সে অনেক কাল আগের কথা। আমি অনার্য রাজপুত্র। আপনার পুত্র অভয়কুমার ঋষভদেবের একটী ছোট্ট সোনার প্রতিমা আমায় উপহার পাঠান। সেই প্রতিমা দেখতে দেখতে আমার পূর্ব জন্মের স্মৃতি মনে পড়ে যায় ও শ্রমণ দীক্ষা নেবার জন্য আমি ভারতবর্ষে আসি। এখানে এসে আমি শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করি ও নানা স্থান প্রব্রজন করতে থাকি। এমনি প্রব্রজন করতে করতে একবার আমি বসন্তপুরে আসি। বসন্তপুরে এসে আমি যখন নগর উদ্যানে বসে ধ্যান করছি তখন সেখানে তার সঙ্গিনীদের নিয়ে শ্রেষ্ঠীর মেয়ে খেলা করতে এল। খেলা ছলেই সে সেদিন আমায় বরণ করল। তারপর ঘরে চলে গেল।

তারপর অনেককাল পরের কথা। মেয়েটী যখন বড় হল শ্রেষ্ঠী যখন তার বিবাহের উদ্যোগ করলেন, মেয়েটী তখন তার বাবাকে গিয়ে বলল, যে তার আর বিয়ে হতে পারে না কারণ সে একজন শ্রমণকে বরণ করেছে।

শ্রেষ্ঠী সমস্ত শুনে মেয়েকে অনেক বোঝালেন। বললেন, সে ত খেলা ছলে।

কিন্তু মেয়ের সেই এক কথা, সেই শ্রমণকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করবো না।

শ্রেষ্ঠী তখন বিপদে পড়লেন। প্রথমতঃ আমাকে কেউ চেনে না, কোথায় থাকি তাও জানে না। তার ওপর তাঁর মেয়েকে যে আমি গ্রহণ করব তারি বা নিশ্চয়তা কী ?

মেয়ে বলল, বাবা, তুমি আমায় অতিথিশালা তৈরী করিয়ে দাও। অতিথি শালায় সাধু শ্রমণ আসবেন। হয়ত তিনিও কোনো দিন আসতে

পারেন। তাঁর মুখ আমি দেখিনি কিন্তু তাঁর পা আমি দেখেছি। তাঁর পায়ে পদ্ম চিহ্ন ছিল। সেই চিহ্ন দেখে আমি তাঁকে চিনতে পারব।

শ্রেষ্ঠীর অন্য উপায়ান্তর ছিল না। তাই মেয়ের কথা মতো অতিথিশালা নির্মাণ করিয়ে দিলেন। মেয়েটী সেখানে যে সাধু শ্রমণ আসে তাঁদের পা ধুইয়ে দেয়।

মহারাজ, একদিন সেই অতিথিশালায় আমিও এলাম।

মেয়েটী পা ধোয়াতে গিয়ে আমার পায়ে পদ্ম চিহ্ন দেখে আমায় চিনতে পারল। আমি ধরা পড়ে গেলাম।

এই মেয়েটীর কথা আমার মনে ছিল না কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে আমার পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে গেল। সে জন্মে সে আমার স্ত্রী ছিল। স্ত্রী কিন্তু তার সঙ্গে আমার মিলনের পথ ছিল না। আমি শ্রমণ ছিলাম। কিন্তু শ্রমণ জীবনেও তার প্রতি আসক্তি আমি পরিত্যাগ করতে পারিনি। দেখলাম তার প্রেমের চাইতেও সেই আসক্তিই আমাকে তার দিকে দুর্নিবার বেগে টানতে লাগল।

মহারাজ, তাই শ্রমণ ধর্ম এবারে পরিত্যাগ করে তাকে নিয়ে ঘর বাঁধলাম। সংসারী হলাম। দীর্ঘ বারো বছর তার সঙ্গে এক সঙ্গে বাস করলাম। তারপর যখন বাসনা উপশান্ত হল তখন আবার সংসার পরিত্যাগের কথা ভাবতে লাগলাম।

আমার স্ত্রী আমার মনের কথা জানতে পেরে আমার সামনে সুতো কাটতে বসল। তাই দেখে আমার ছেলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, মা তুমি এ কি করছ? সে প্রত্যুত্তর দিল, বাবা, তোমার বাবা সংসার পরিত্যাগ করবেন—তাই সংসার চালাবার জন্য সুতো কাটছি।

সে কথা শুনে আমার ছেলে সেই কাটা সুতো নিয়ে আমায় বারো পাকে জড়িয়ে বলল, দেখি এবার তুমি কি করে যাও?

তার দুষ্টু হাসি, তার কচি হাতের স্পর্শ আমায় আবার মোহগ্রস্ত করে দিল। আমি সংসার পরিত্যাগ করতে পারলাম না।

মহারাজ, তাই বলছিলাম লোহার শেঁকল ভাঙা এমন কি আর শক্ত, যত শক্ত কাঁচা সুতোর বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা। আমাকে সেই বাঁধন

ছিঁড়ে আসতে দেখে বুনো হাতিটি তার লোহার শেঁকল ভেঙে অরণ্যের অসীম মুক্তিতে ফিরে গেল।

সেকথা শুনে শ্রেণিক আর্দ্রককে প্রণাম করে বললেন, আপনি ধন্য, আপনি কৃতকৃত্য।

আর্দ্রক তখন গেলেন বর্দ্ধমানের কাছে।

বর্দ্ধমান সেই চাতুর্মাস্য রাজগৃহেই ব্যতীত করলেন। তারপর সেখান হতে গেলেন কৌশাম্বী।

[ক্রমশঃ

শ্রাবকাচার

শ্রীমতী রাজকুমারী বেগানী

আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি ত্যাগ প্রধান সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিতে সৎ আচরণ ও আধ্যাত্মিক বিচারের প্রমুখতা দেখা যায়। সেখানে যেমন সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তার সৌম্য ও শুচি আদর্শ রয়েছে, তেমনি রয়েছে দুরাগ্রহ ও দুষ্প্রবৃত্তি নিরাকরণের সহজ প্রেরণা। এই সংস্কৃতি কোন এক ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায়ের অবদান নয়, তা বিভিন্ন সভ্যতা ও কৃষ্টির অবদান। যদিও সেই সভ্যতা ও কৃষ্টি নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত, তবুও মূলতঃ তারা এক যার তপবীথি ত্যাগময় জীবন। ভারতবাসীরাও বাসনার বশীভূত হয়ে লক্ষীর উপাসনা করেছে তবু এই এক কারণেই তারা মাথা নত করে এসেছে চিরকাল কামিনী কাঞ্চন পরিত্যাগী ত্যাগব্রতীর পায়ে। এই ত্যাগ প্রধান ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির বিকাশে জৈন অবদানেরও এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। জৈনাচার্যেরা নিজেদের সার্বিক ত্যাগময় ও সংযম প্রধান জীবন, সিদ্ধান্ত ও বিবেকপূর্ণ উপদেশের অনুদানে তাকে প্রভূত ভাবে সুসজ্জিত করেছেন। সেই অনুদান অপূর্ব, অনন্ত ও বিশ্বকল্যাণের ভাবনায় ওতঃপ্রোত। এ অহিংসার সেই প্রোজ্জল দীপশিখা যা হিংসার প্রবল ঝঞ্ঝাবাতেও নির্বাপিত না হয়ে আজ অবধি নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রজ্জলিত রয়েছে।

জৈনধর্ম বিনয় ও সাম্যের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়; প্রায়শ্চিত্ত, বিনয় ও সেবাধর্মকে (বৈয়াবৃত্য) তপস্যার আভ্যন্তরীণ অঙ্গ বলে প্ররূপিত করে। প্রায়শ্চিত্তে অহংভাব বিনষ্ট হয়, বিনয়ে বিবেক জাগ্রত। বিনয়ী ব্যক্তিই সমস্ত গুণের পাত্র হতে পারে। সর্বোপরি অহিংসা। অহিংসা জৈন সংস্কৃতির আত্মা, দর্শনের সার ও সার্বভৌম শান্তির প্রবাহ। মানুষে ও দানবে অহিংসা ও হিংসারইত পার্থক্য! বর্তমানের অনৈতিকতার বেড়াজালে, হিংসার বিরোধী আবহাওয়ায় জৈনদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা যে কম দেখা যায় তার কারণ এই অহিংসার প্রভাব। জৈনরা হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হতে আজো স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত।

ভগবান মহাবীর যখন ধর্মতীর্থ প্রবর্তনে প্রয়াসী হন তখন তাকে চিরস্থায়ী ও ব্যাপক রূপ দেবার জন্য সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সংঘ চার ভাগে বিভক্ত। যথা: (১) সাধু, (২) সাধ্বী, (৩) শ্রাবক ও (৪) শ্রাবিকা। নিঃসন্দেহে সংঘের এই চার ভাগই মুমুক্ষু, আত্মপথের পথিক, সংযম সাধনায় নিরত তবুও তাদের পরিস্থিতিতে অনেক পার্থক্য। গৃহে বাস করে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উত্তরদায়িত্ব পালন করে মুক্তির সাধনা শ্রাবক ধর্ম এবং সমস্ত রকম লৌকিক দায়িত্ব পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র আত্ম-সাধনায় লীন হওয়াই সাধুধর্ম। অন্যভাবে অহিংসাদি ব্রত যাঁরা পূর্ণরূপে পালন করেন তাঁরা সাধু ও যাঁরা আংশিকরূপে পালন করেন তাঁরা শ্রাবক। জীবনকে সমুন্নত করবার জন্য অন্ধকার হতে প্রকাশের দিকে পরিচালিত করবার জন্য যে সমস্ত নিয়ম, মর্যাদাদির প্রণয়ন করা হয় তাদের ব্রত বলা হয়। যে ভাবে কলকলনাদিনী নদীর প্রবাহকে গতিশীল ও মর্যাদিত রাখবার জন্য দুইটী তটের বন্ধনের প্রয়োজন আছে, তেমনি বাসনার উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য, মর্যাদিত রাখবার জন্য ব্রতেরও প্রয়োজন আছে। অব্রতীজীবন বল্গাহীন অশ্বের মতো লক্ষ্যহীন ও স্ব-পরের অহিতকারক বলেই সিদ্ধ হয়। তাই তীর্থংকরেরা জীবনশক্তিকে কেন্দ্রিত করবার জন্য ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে তার নিয়োগের জন্য ব্রতের প্রবর্তন করেছেন। যে ক্রিয়া আত্ম বিকাশকে লক্ষ্য করে করা হয় তাই অধ্যাত্ম। ব্রত এবং সঙ্কল্প সেই অধ্যাত্ম বিকাশেরই অভিপ্সিত অঙ্গ। তাই গৃহীর জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী ব্রতের নিরূপণ করা হয়েছে:

১। স্থূল প্রাণাতিপাত বিরমণ।

২। স্থূল মৃষাবাদ বিরমণ।

৩। স্থূল অদত্তাদান বিরমণ।

৪। স্থূল মৈথুন বিরমণ।

৫। পরিগ্রহ পরিমাণ।

৬। দিগ্ ব্রত।

৭। ভোগোপভোগ পরিমাণ।

৮। অনর্থ দণ্ড বিরমণ।

৯। সামায়িক ব্রত।

১০। দেশাবকাশিক ব্রত।

১১। পৌষধ ব্রত;

১২। অতিথি সংবিভাগ ব্রত।

এর মধ্যে প্রথম পাঁচটী আংশিক হবার জন্য অণুব্রত। আংশিক বলেই তাদের আগে স্থূল শব্দের প্রয়োগ করা হয়।

১। প্রাণাতিপাত বিরমণ—অহিংসাণুব্রত প্রাণাতিপাত বিরমণের অর্থ হল জীবের প্রাণ সংহার করা হতে বিরত থাকা। সংসারের সমস্ত জীব ত্রস ও স্থাবর ভেদে দু'ভাগে বিভক্ত। মুনি দুই প্রকার জীবেরই হিংসা পূর্ণরূপে (সূক্ষ্মরূপে) পরিত্যাগ করেন। কিন্তু গৃহীর পক্ষে সেরকম সম্ভব নয়, তাই তাদের জন্য স্থূল হিংসা পরিত্যাগের বিধান। মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, বনস্পতি রূপ স্থাবর জীব স্বভাবতঃই ভোগোপভোগ রূপ। এদের ভোগোপভোগ সর্বদাই অপেক্ষিত। তাই গৃহীর অহিংসাব্রতে এদের হত্যা না করার সমাবেশ না করে স্থূল (অর্থাৎ দ্বিন্দ্রীয়াদি হতে) জীবের হত্যা না করার নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। সঙ্কল্প করে নিরপরাধ জীবের হত্যাই গৃহীর পরিত্যাজ্য।

জৈন শাস্ত্রে হিংসা চার প্রকার: (১) আরম্ভী, (২) উদ্যোগী, (৩) বিরোধী ও (৪) সংকল্পী।

(১) আরম্ভী হিংসা—জীবন নির্বাহের জন্য, খাদ্যাদি সংগ্রহের জন্য, পরিবার প্রতিপালনের জন্য যে হিংসা অনিবার্যরূপে হয়ে থাকে তাই আরম্ভী হিংসা।

(২) উদ্যোগী হিংসা—জীবিকার জন্য গৃহীকে কৃষি, গোপালন, বাণিজ্যাদি শিল্প কাজে প্রবৃত্ত হতে হয়। ঐ সমস্ত কাজে অহিংসার ভাবনা ও সাবধানতা সত্ত্বেও হিংসা হয়ে থাকে। সেই হিংসাকে উদ্যোগী হিংসা বলা হয়।

(৩) বিরোধী হিংসা—নিজের প্রাণ, কুটুম্ব পরিবারের প্রাণ ও দেশকে আক্রমণ কারীদের হাত হতে রক্ষার জন্য যে হিংসা করা হয় তা বিরোধী হিংসা। যদিও এতে বিরোধীর বধের সঙ্কল্প করা হয় তবু তা সকারণ ও ন্যায়োচিত হবার জন্য তাকে সংকল্পী হিংসার অন্তর্গত করা হয় না।

(৪) সঙ্কল্পী হিংসা—জ্ঞানতঃ কোনো নিরপরাধ প্রাণীর হত্যা করার যে ভাবনা তাই সঙ্কল্পী হিংসা।

গৃহী সংকল্পী হিংসা পরিত্যাগ করবে। সে নিজে হিংসা করবে না, অন্যকে দিয়ে করাবে না বা অন্যে করলে তার অনুমোদন করবে না। কারণ হিংসা কেবল ক্রিয়ার ওপরই নির্ভরশীল নয়, বিচার ও অধ্যবসায়ের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কখনো কখনো যে হিংসা করে তার চাইতে যে করায় তার অধ্যবসায় তীব্র হয় আবার কখনো কখনো যে অনুমোদন করে তার মনের অধ্যবসায় যে করায় তার চাইতে বেশী তীব্র হয়। কার অধ্যবসায় বেশী তীব্র তা অপূর্ণ মানুষ জানতে পারে না। কিন্তু কর্মের বন্ধন যেমন অধ্যবসায় সেই রূপই হয়ে থাকে। তাই করা, করান এবং অনুমোদন করা এই তিনেরই পরিত্যাগ অবশ্যক।

মন, বচন, কায়া, পাঁচ ইন্দ্রিয়, আয়ু ও শ্বাসোচ্ছাস এই দশটী প্রাণ। এদের যে কোন একটীকেই বিদ্বেষ বা দুর্বুদ্ধির বশীভূত হয়ে আঘাত করাই হিংসা।

বিশ্বে এমন কোনো স্থান নেই যেখানে জীব নেই। এজন্য প্রবৃত্তি মাত্রেই হিংসা না হয়ে যায় না। তবুও সাবধান হয়ে প্রবৃত্ত হওয়ায়, মনে হিংসা ভাবনা না রাখায়, হিংসা হওয়া সত্বেও হিংসা হতে সে মুক্ত থাকে। আবার কেবল মাত্র নিবৃত্ত হয়ে থাকলেই যে অহিংসা সিদ্ধ হয় তাও নয়। কারণ শারীরিক স্থিরতার সময় যদি মনের অধ্যবসায় হিংসাত্মক হয় তবে ভাবনাত্মক সেই হিংসার জন্য মানুষ ঘোর নরকগামীও হতে পারে।

সংক্ষেপে তাই আমরা একথা বলতে পারি যে জ্ঞানতঃ কোনো প্রাণীকে হত্যা করা হিংসা ত বটেই, কোনো প্রাণীকে বিদ্বেষবশতঃ আঘাত দেওয়াও হিংসা। শুধু তাই নয় কোনো প্রাণীর হত্যা বা আঘাত দেবার ইচ্ছাও হিংসা।

২। স্থূল মৃষাবাদ বিরমণ—সত্যাণুব্রতে স্থূল মিথ্যা বলার সর্বদা পরিত্যাগ ও সূক্ষ্ম মিথ্যা বলা বিষয়ে সাবধান থাকা অপেক্ষিত। এটি দ্বিতীয় ব্রত। যদিও স্থূল ও সূক্ষ্ম মিথ্যার নির্ণয়ের নিশ্চিত কোনো সীমারেখা নেই তবু যাকে লোকে অসত্য বলে মনে করে, যা লোক নিন্দনীয় ও রাজদ্বারে দণ্ডনীয় তা স্থূল মিথ্যা।

মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া, মিথ্যা দলীল তৈরী করা, সত্য মিথ্যা বলে কাউকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়া, আত্ম প্রশংসা, পরনিন্দা, প্রলোভন জন্য মিথ্যা প্রচার, অথবা ব্রত ও ক্রিয়াকে দূষিত করা ইত্যাদি সমস্তই স্থূল মিথ্যার অন্তর্গত। যে বস্তু ঠিক যেমন সেই রকম বলাকে সামান্যতঃ সত্য বলে বলা হয় এবং বাস্তব দৃষ্টিতে তা সত্যও কিন্তু ধার্মিক দৃষ্টিতে তা সত্য হতেও পারে নাও পারে। যদি সেই বাক্য যথার্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণকারী হয়, অন্ততঃ অকল্যাণকারী না হয় তবে তা নিঃসন্দেহে সত্য কিন্তু অকল্যাণকারী বাক্য প্রিয় ও সত্য হওয়া সত্বেও অসত্য। তাই সত্য বলার জন্য বিবেককে জাগ্রত করা একান্ত প্রয়োজন।

৩। স্থূল অদত্তাদান বিরমণ (অচৌর্য অণুব্রত)—কায়মন বাক্যে কারু সম্পত্তি আদেশ ব্যতিরেকে না নেওয়া অচৌর্য বা স্থূল অদত্তাদান বিরমণ ব্রত। যে চুরীকে লোকে চুরী বলে, যার জন্যে ন্যায়ালয়ে দণ্ডিত হতে হয় তাই স্থূল চুরী। যেমন: সিঁধকাটা, পকেটমারী, ডাকাতি, কারু ধন লুট করা, অন্যের লেখা নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া, অন্যের টাকায় ভালো কাজ করে নিজের নাম কেনা, শিশু ও স্ত্রী অপহরণ করা, ইত্যাদি। চুরীর জিনিষ নেওয়া বাস্তবে চুরীই। কাউকে চুরী করতে প্রবৃত্ত করা, চুরী হতে দেখেও গৃহ-স্বামীকে বা রাজদ্বারে খবর না দেওয়া, উচিত পরিমাণের চাইতে কম বা বেশী ওজন দেওয়া, রাষ্ট্র বিরুদ্ধ কার্য করা অর্থাৎ কর না দেওয়া ও অন্যায়ের দ্বারা নীতি বিরুদ্ধ বস্তু সংগ্রহও চুরী।

৪। স্থূল মৈথুন বিরমণ (ব্রহ্মচর্যাণুব্রত)—ভোগ এমন একটি ব্যাধি যার প্রতিকার ভোগের দ্বারা হয় না। মানুষ যত ভোগ করে ততই সে অতৃপ্ত হতে থাকে ও তার ভোগ তৃষ্ণা আরো বাড়তে থাকে। তাই মানসিক, শারীরিক ও আত্মশক্তির রক্ষার জন্য সম্ভোগ হতে সর্বথা বিরত থাকাই পূর্ণ ব্রহ্মচর্য। বিবাহ করে স্বপত্নীতে ভোগ সীমিত রাখা স্থূল ব্রহ্মচর্য। স্বপত্নীতেও অত্যধিক আসক্তি পরিত্যজ্য। অশ্লীল সাহিত্য পড়ায়, সিনেমা থিয়েটারে দত্তচিত্ত হওয়ায়, অভিনেতা অভিনেত্রীদের রূপ চর্চায় কাম বাসনাকেই উদ্দীপ্ত করা হয়। এর বিপরীত যারা সৎকাজে, সৎবিচারে এবং সৎ ভাবনায় মনকে নিযুক্ত রাখে, তাদের মন বিষয় সেবনে আসক্ত

হয় না। কোনো বস্তুকে নিরুদ্ধ করার চাইতে তাকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিয়োগ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

৫। পরিগ্রহ পরিমাণ—ইচ্ছা মানুষের অপরিমিত। তাই তাকে সীমিত করাই এই ব্রতের উদ্দেশ্য। মানুষ যেমন যেমন ধনী হতে থাকে অধিক ধন সংগ্রহের কামনাও তত সুরসার মুখের মতো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে। সোনা, রূপো, মাটি, বিষয়, ধন-ধান্য, পশু-পক্ষী আদি বাহ্য বস্তুর অধিক সংগ্রহ দ্রব্য-পরিগ্রহ ও তাতে আসক্তি ভাব-পরিগ্রহ। দ্রব্য-পরিগ্রহের চাইতে ভাব-পরিগ্রহ আরো বেশী ক্ষতিকর। এই ভাব-পরিগ্রহকে সীমিত করার জন্যই দ্রব্য পরিগ্রহকে সীমিত করা প্রয়োজন। পরিগ্রহ হতে মমত্ব বুদ্ধি সরিয়ে নিলেই মানুষের লোভও ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

আজ যে সমস্ত জটিল সমস্যা বিশ্বের সামনে উপস্থিত, সংঘর্ষের যে দাবাগ্নি চারদিকে প্রজ্বলিত, তার মূলে রয়েছে ধন সঞ্চয়ের এই লোভ প্রবৃত্তি। তাই পরিগ্রহ পরিমাণ ব্রতকে যদি সুচারু রূপে পালন করা হয় তবে পুঁজীবাদ ও সমাজবাদের বিবাদ আপনা আপনিই শান্ত হয়ে যায়। সমাজ ব্যবস্থাকে সুব্যবস্থিত করবার জন্য তাই এই ব্রতের একান্ত প্রয়োজন।

ব্রতের উপযোগিতা বুঝতে পেরে ব্রতী হয়ে মানুষ যখন স্বেচ্ছায় স্বোপার্জিত ধন সম্পত্তির পরিত্যাগ করে তাতে সে এক অলৌকিক আনন্দও অনুভব করে। সে জানে লোকহিতকর কাজে অর্থ ব্যয়ে সে যেমন ইহ জীবনে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করবে তেমনি পরলোকে অনন্ত সুখ। সে বিষয়েও সে সতর্ক থাকে যাতে তার প্রদত্ত অর্থের অসৎ ব্যবহার না হয়। কারণ সে সেই সময় যদিও সেই অর্থের মালিক থাকে না তবু তার রক্ষক (ট্রাষ্টী) অবশ্যই থাকে। তাছাড়া পরিগ্রহের ভূত মাথা হতে নামতেই মানুষ স্বতঃই সৎকার্যের জন্য উন্মুখ হয়। তাই মানুষ যদি এই ব্রতকে যথার্থতঃ জীবনে রূপায়িত করতে পারে তবে পৃথিবী, পৃথিবী আর থাকে না, স্বর্গে পরিণত হয়।

৬। দিগ্ব্রত—মানুষের আকাঙ্ক্ষা আকাশের মতোই নিঃসীম। সমস্ত বিশ্বে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সে সর্বদাই লোলুপ। অর্থগৃধ্নুতার দ্বারা প্রেরিত হয়ে সে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করে। এই বৃত্তিকে সীমিত

করবার জন্যই নানা দিকে যাতায়াতকে এই ব্রতে নির্দিষ্ট করে নিতে হয়। এতে অনেক ঝঞ্ঝাট যেমন কম হয়ে যায় তেমনি এক ধরণের মানসিক শান্তিও সে লাভ করে।

৭। ভোগোপভোগ পরিমাণ—আহারাদির মতো একবার যা ব্যবহার করা যায় তা ভোগ্য ও বস্ত্রাদির মতো যা একাধিকবার ব্যবহার করা যায় তা উপভোগ্য। বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ না করার জন্য যেমন একদিকে ঐশ্বর্যের স্তূপ জমে ওঠে তেমনি অন্যদিকে দারিদ্র্যের সাম্রাজ্য; ভোগোপভোগে সমতা ও সংযম ভাবই এই বৈষম্য দূর করতে সমর্থ। এই ব্রতের উদ্দেশ্য অধিকাধিক ভোগোপভোগ্য বিষয় হতে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা।

৮। অনর্থদণ্ড বিরমণ—অনর্থের অর্থ হল নিরর্থক ও দণ্ডের অর্থ পাপাচরণ। বিবেকহীন মনোবৃত্তির জন্য মানুষ বৃথাই পাপাচরণ করে। গৃহী জীবনে আরম্ভী, উদ্যোগী এবং বিরোধী হিংসাত ন্যূনধিক পরিমাণে রয়েছেই তার ওপর মানুষ প্রমাদ জন্য লাগানো, নিন্দা, বিকথা এবং অন্য পাপজনক কাজের উপদেশ দিয়ে অযথা অনর্থদণ্ডরূপ পাপ অর্জন করে। এই ব্রতকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) হিংসোপকরণ দেওয়া—হিংসার সাধন ছোরা, ছুরি, তলবার, বম-আদি তৈরী করে কাউকে হত্যার জন্য দেওয়া।

(খ) দুর্ধ্যান—প্রিয় বস্তুর বিয়োগে ও অপ্রিয়বস্তুর সংযোগে আর্তধ্যানে নিরত হওয়া, অন্যের মন্দ চিন্তা করা, ইত্যাদি।

(গ) প্রমাদচর্যা—প্রমাদাচরণের আসক্তি পরিত্যাগ এই ব্রতের অন্তর্গত। যেমন, অযথা মাটি খোঁড়া বা খোঁড়ান, আগুন জ্বালা, কুলের গর্ব করা, বিকথা, নিন্দা, মোহ বর্দ্ধক ক্রীড়া-কৌতুক করা ও দেখা, ইত্যাদি।

(ঘ) পাপোপদেশ—পাপজনক কাজের উপদেশ দেওয়া, নিজের কুব্যসনে অন্যকে লিপ্ত করা, পাপারম্ভের প্রবৃত্তিতে অকারণ কুশলতা দেখানো, ইত্যাদি।

৯। সামায়িক ব্রত—রাগদ্বেষ হতে বিরত হয়ে সমভাবে আসার নামই সামায়িক। এই ব্রতের আরাধনার সময় কমপক্ষে ৪৮ মিনিট। এই সময় সমস্ত রকম পাপ কার্য হতে বিরত হয়ে কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি পরিত্যাগ করে আত্মধ্যানে লীন হতে হয়।

১০। দেশাবকাশিক ব্রত—ষষ্ঠ ব্রতে গৃহীত দিগ্‌ব্রতের নিয়মকে এক-দিনের জন্য বা অধিক দিনের জন্য আরো সঙ্কুচিত করা, অন্য ব্রতের ছুটকে আরো সীমিত করা ও সমস্ত রকম পাপের পরিত্যাগ এই ব্রতের অন্তর্গত। সংক্ষেপে বিরতির অভিবৃদ্ধিই এই ব্রতের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১১। পৌষধ ব্রত—ধর্মের পোষণ করে বলে এই ব্রতকে পৌষধ ব্রত বলা হয়। উপবাস বা একাহার করে চার বা আঠ প্রহর সাধুর মতো ধ্যান, স্বধ্যায়, তত্ব চিন্তা ও আত্মস্বরূপে রমণ করাই পৌষধ ব্রত।

১২। অতিথি সংবিভাগ—যাঁর আসার সময় নির্দিষ্ট নেই তিনিই অতিথি। শ্রমণ বা সাধু সূচনা না দিয়েই এসে থাকেন। তাই তাঁদের ভিক্ষা দেওয়া অতিথি সংবিভাগব্রত। যাঁরা লোক সেবক ও সজ্জন, তাঁদের প্রয়োজন মেটানোও এই ব্রতের অন্তর্গত। সংগ্রহ প্রবৃত্তি কম করার ও ত্যাগের ভাবনা বৃদ্ধি করার জন্যই এই ব্রতের ব্যবস্থা।

এই বারো ব্রতের প্রথম পাঁচটা অণুব্রত কারণ সাধুদের জন্য নিরূপিত মহাব্রতের তুলনায় তা সহজ। তারপরের তিনটী ব্রত অণুব্রতের গুণরূপ হওয়ায় গুণব্রত। অবশিষ্ট চারটী শিক্ষাব্রত। শ্রমণের মতো জীবন যাপনে মানুষকে যা অভ্যস্ত করে তাই শিক্ষাব্রত।

উপরোক্ত এই আলোচনা হতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছই যে কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি ধার্মিক উন্নতির জন্য আমাদের এই ব্রত গ্রহণ একান্তই আবশ্যক। কাউকে দুঃখ দিও না, কাউকে হত্যা কোরো না'র যে মহতী বাণী এই ব্রতের মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে তাতে একথা সুস্পষ্ট যে যতক্ষণ না আমরা নিজের স্বার্থ পরিত্যাগ করে অন্যকে সুখী করবার চেষ্টা করি, অন্যের সুখ সুবিধার কথা চিন্তা করি ততক্ষণ আমরা নিজেরাও সত্যিকার সুখী হতে পারি না। ধন সঞ্চয় করে ধনবান হওয়া এক আর সুখ ও শান্তি পূর্ণ জীবন যাপন করে অক্ষয় আনন্দের অধিকারী হওয়া সম্পূর্ণ আর। আজকের যান্ত্রিক যুগের মানুষ বহুকর্মব্যস্ত থাকায় ধর্মাচরণের তার কাছে সময় নেই বলে ধর্মকে উপেক্ষা করছে। এবং সম্ভবতঃ জপ তপ ধ্যান ধারণার মতো সময় হয়ত তার নেইও। কিন্তু ব্রতের সম্বন্ধে বোধহয় সে কথা বলা যায় না। ব্রতের সম্বন্ধ সময়ের সঙ্গে নয়, আচরণের

সঙ্গে। এই ব্রত আমাদের প্রত্যেকটী কাজ, চিন্তা ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সম্বন্ধান্বিত। যদি আচরণই শুদ্ধ না হয় তবে জপ তপের মতো বড় বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানেরই বা কি ফল? অসুস্থ শরীরে যেমন বলবর্দ্ধক ওষুধ কাজ করে না তেমনি আচরণ বিশুদ্ধি ছাড়া জপ তপেরও ফল হয় না। তাই প্রথম প্রয়োজন আচার, বিচার ও ব্যবহারকে নির্মল করা, পবিত্র করা। একথা সত্যি যে সামায়িক; পৌষধ আদি ব্রতের জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন কিন্তু তার জন্য হতাশ হবার কারণ নেই। বারোটি ব্রত যদি কেউ পালন করতে সমর্থ না হন তবে তিনি প্রথম পাঁচটী অণুব্রত গ্রহণ করতে পারেন। এগুলি একটীর সঙ্গে অন্যটী অনন্য ভাবে সম্বন্ধান্বিত। তাই কেউ যদি একমাত্র অহিংসাব্রতেরই সমুচিত ভাবে পালন করেন তবে তিনি পরোক্ষভাবে অন্য ব্রতগুলিও পালন করছেন, এবং একথা খুবই ঠিক যে আমরা যদি এই ব্রতগুলি পালন না করি তবে জৈন কুলে জন্মেছি বলেই আমরা জৈন হয়ে যাই না। নিজেকে শ্রাবক বলবার তিনিই অধিকারী যিনি নিজের জীবন এই ব্রতের অনুরূপ নির্মাণ করবার অবিরাম প্রয়াস করছেন। জৈনধর্ম কেবল নিবৃত্তি মূলকই নয়, প্রবৃত্তি মূলকও। তাইত সাধ্বাচার হতে শ্রাবকাচারকে পৃথক করে তার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে প্রবৃত্তির আগে সৎ কথাটি অবশ্যই যোগ করতে হবে কারণ জৈনধর্ম নিছক প্রবৃত্তির সমর্থক নয়। বিবেকপূর্ণ সৎ-প্রবৃত্তির মধ্যে দিয়েই সে শুভ এবং শুভ হতে শুদ্ধতর জীবনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

সমরাদিত্য কথা

হরিভদ্র সূরী

[কথাসার]

[দ্বিতীয় বর্ষ নবম সংখ্যা হতে]

॥ ৩ ॥

আর্জব কৌণ্ডিন্যের মতো কুলপতিও তাঁর আশ্রমে অগ্নিশর্মার মতো তপস্বীকে লাভ করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতে লাগলেন। কারণ দু'চার দিনের উপবাস ত তুচ্ছ, অগ্নিশর্মা একসঙ্গে আট আট দিন এমন কী পনেরো দিন উপবাস টেনে নিয়ে যেতে পারত, একটী চাল বা যবের ওপর সমস্ত দিন কাটিয়ে দিত। শীত ও গ্রীষ্ম সমান ভাবে সহ্য করত, ছোট ও পাতলা দর্ভের শয্যায় হাতে মাথা রেখে শুয়ে থাকত। এখন তাই আশ্রম-বাসীরাও তপস্বী অগ্নিশর্মাকে আসতে দেখলে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে যান।

কিন্তু উপবাস করার সময় বা শীতোষ্ণতাকে সমান ভাবে সহ্য করার সময় কি অগ্নিশর্মার মনে কোনো প্রশ্ন উদিত হত? কোনো সাধনাই ত নিরর্থক নয়! অগ্নিশর্মার এই কঠোর সাধনার উদ্দেশ্য কী? —এই প্রশ্ন অনেকের মনকেই উত্তেজিত করেছিল।

অখণ্ড অবকাশ ও অনন্ত শান্তির মধ্যে কে জানে অগ্নিশর্মা কোনো গভীর চিন্তায় ডুবে যেত কি না? তবে তপস্যার সঙ্গে সঙ্গে যদি সম্যক দর্শন বা নির্মল দৃষ্টি না থাকে তবে সে তপস্যা আগে গিয়ে শুধু জটিলতারই সৃষ্টি করে না, তপস্বীকে আরো পথ ভ্রষ্টও করে দেয়। কিন্তু অগ্নিশর্মাকে সেই নির্মল দৃষ্টি দেবার কেউ ছিল না। যদিও আচার্য কৌণ্ডিন্য তাঁর একান্ত প্রিয় শিষ্যকে নিজের বলে যা কিছু ছিল তা সম্পূর্ণ দিতে কার্পণ্য করেন নি, কিন্তু সেই নির্মল দৃষ্টি তিনিও ত এখনো লাভ করেন নি।

অগ্নিশর্মা কী সেই নূতন পরিবেশে তার পূর্ব জীবনের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল? উদ্ধত ও অবিনয়ী মানুষের দঙ্গল কখনো যে তার পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াত, তাকে কারণে অকারণে তিক্ত বিরক্ত ও নির্যাতিত করতো সে সব কথা কী অগ্নিশর্মার আর মনে পড়ে না? যদি পড়ে তবে কি সেই সময় তার মনে নিষ্ক্রিয় ক্রোধ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয় না? আর সেই যুবরাজ গুণসেনকৃত নিষ্ঠুর কৌতুককে কি সে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে পেরেছিল? যদি বিস্মৃতও হয়ে থাকে তবে তার রেশটুকুও কি আর তার অন্তরে ছিল না? অগ্নিশর্মা যতবড় তপস্বীই হোক না কেন, ক্ষমাশীল ছিল না। বস্তুতঃ ক্ষমা ও শান্তি এ দুইই ছিল তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। সময় অনেক কথাই মানুষকে বিস্মৃত করিয়ে দেয় এবং সম্ভবতঃ গুণসেনের কথাও সে হয়ত অনেকখানি ভুলে গিয়েছিল। কারণ এখন এখানে যেসব ক্ষত্রিয় পুত্র, শ্রেষ্ঠী পুত্র ও ব্রাহ্মণপুত্র আসে তারা তপস্বীদের দর্শন লাভ করে নিজেদের কৃতকৃতার্থ মনে করে। আচার্য কৌডিন্যের এই আশ্রম বসন্তপুর নগরের এক গৌরবস্থল।

একদিন সেই তপোবনে বসন্তপুর হতে রাজকুমারের মতো এক যুবক অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হল। তাকে শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত বলে মনে হচ্ছিল। তার সঙ্গী অনুচরেরাও তার সঙ্গে ছিল না এবং সে ছিল সেই আশ্রমের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত। অশ্বকে দ্রুত বেগে ধাবিত করতে করতে ভুল ক্রমেই সে এই তপোবনে এসে উপস্থিত হয়েছিল।

তপোবনের শান্তি ও সৌন্দর্য তার মনকেও প্রভাবিত করল। বসন্তপুরে আসবার পূর্বে সে অনেক দেশ পর্যটন করে এসেছে তবু তপোবন ও আশ্রমবাসীদের সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য এই তার প্রথম।

শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল বলেই সে অশ্ব হতে অবতরণ করে এক গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে বসল। তাকে সেখানে বসতে দেখে আশ্রমবাসীদের কেউ কেউ তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এবং তার মধ্যে তার পেছিয়ে পড়া সঙ্গী অনুচরেরাও সেখানে এসে উপস্থিত হল।

যে বসন্তপুর রাজ্যের সীমায় তাঁরা আশ্রম বেঁধে শান্তি ও নিশ্চিন্ততায় অবস্থান করছেন সেই বসন্তপুর রাজ্যের রাজার নিকট কোনো আত্মীয় পথ

ভুলে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন সে খবর মুহূর্তে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমে তা কুলপতি কৌণ্ডিন্যের কানেও উঠল। তিনি সেই খবর পেয়ে সেই রাজ অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য দ্রুত সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কুমারও বিনীত ভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে প্রণাম করল।

কুলপতি কুমারকে স্বাগত জানিয়ে বলতে লাগলেন, 'সজ্জ পরিতোষ' নামক এই আশ্রমের কথা নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন। এখানে কেবল তপস্বীরাই বাস করেন। তপস্বীদের তপস্যার প্রভাবে এখানকার বন্য জন্তুরাও তাদের স্বাভাবিক বৈর ভুলে গেছে।

করুণামূর্তি কুলপতির সেই কথা শুনে কুমারের মনে হল সে যেন এক ভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন জগতে এসে উপস্থিত হয়েছে! তবু প্রত্যুত্তরে সে সেখানে নবাগতই নয়, এই আশ্রমপদের নাম পর্যন্ত শোনে নি—সেই কথাই সে কুলপতির কাছে বিনম্র ভাবে নিবেদন করল।

বসন্তপুরের রাজার কোনো পুত্র সন্তান ছিল না কুলপতি সে কথা জানতেন। তাঁর একটী কন্যা ছিল। রাজকুমারের মতো বেশ ও হাতে বাঁধা মঙ্গল সূত্র দেখে তিনি এই অনুমান করলেন রাজকুমার নিশ্চয়ই রাজ জামতা।

তাঁর অনুমান যে সত্য সে কথা একটু পরেই প্রমাণিত হয়ে গেল। কিন্তু কুমার যেই হোক ক্ষত্রিয় পুত্র ও পথভ্রষ্ট হয়ে সহসা তাঁর আশ্রমপদে এসে উপস্থিত হয়েছে কুলপতির কাছে এইটুকুই যথেষ্ট ছিল। তাকে দিয়ে কোনো স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না।

কুলপতি তখন কুমারকে নিয়ে তাঁর আশ্রম পরিদর্শন করাতে লাগলেন ও তপস্বীদের সঙ্গে পরিচয় করাতে করাতে যেখানে অগ্নিশর্মা অবস্থান করছিল সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

কুলপতি অগ্নিশর্মাকে দেখিয়ে বললেন, এর নাম অগ্নিশর্মা, এ কঠোর তপস্বী।

অগ্নিশর্মাকে দেখা মাত্র গুণসেনের মনে একটা আঘাত লাগল। এতক্ষণ সে তপস্বীদের দু'হাত জুড়ে নমস্কার করে এসেছে তাই অগ্নিশর্মাকেও সে দু'হাত জুড়ে নমস্কার করল কিন্তু মনে পূর্ব স্মৃতি উদিত হওয়ায় গ্লানির এক তীব্র বেদনা তার মুখের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল।

কুলপতি তা লক্ষ্য না করেই বললেন, যদিও ও বেশী দিন এখানে আসে নি, তবু ওর সমকক্ষ তপস্বী আজ পর্যন্ত আমি দেখি নি। ওর শান্ত ও সরল প্রকৃতি ও তার চাইতেও দেহ দমনের উগ্রতা আমাদের সকলকে মুগ্ধ করেছে।

অগ্নিশর্মা সঘন আম্র বৃক্ষের ছায়ায় ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিল। এতক্ষণ তাই সে কিছুই বুঝতে পারে নি কিন্তু এখন আচার্য কৌণ্ডিন্যের কণ্ঠস্বর তার কানে যেতে সে চোখ মেলে চাইল। তার দৃষ্টি প্রথমেই গিয়ে গুণসেনের ওপর পতিত হল। অগ্নিশর্মার করুণা ভরা চোখ হতে যে স্বর্গীয় দিব্যতা ঝরে পড়ছিল সেই দিব্যতা গুণসেন বোধ হয় জীবনে এই প্রথম দেখল।

অগ্নিশর্মাও প্রথম দৃষ্টিতেই গুণসেনকে চিনতে পেরেছিল। কারণ স্মৃতি ত তখনো তেমন পুরুণো হয়ে যায় নি। তবু নিশ্চয় করতে একটু সময় লাগল। তবে এই ক্ষত্রিয় কুমার যে তার পূর্ব পরিচিত গুণসেন তাতে তার কোনো সন্দেহই ছিল না।

হঠাৎ গুণসেনের তার ওপর কৃত অত্যাচারের কথা মনে হওয়ায় স্মৃতি বৃশ্চিক দংশনের এক জ্বালা তার সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে গেল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যই। অগ্নিশর্মা তার বিক্ষুব্ধ চিত্তবৃত্তিকে আবার অন্তর্মুখীন করে নিল। কিন্তু তবু যখন তাকে মুখ খুলে কিছু বলতে হল তখন সে বলে উঠল, মহারাজ গুণসেন, আপনি আমার কম উপকারী নন্। আপনার দয়াতেই তপশ্চর্যার এই পথ আমি খুঁজে পেয়েছি।

গুণসেনও বুঝতে পারল অগ্নিশর্মা তার কৃত অত্যাচারকে উপকার বলে এখন অভিহিত করলেও সেই অত্যাচারের ক্রুরতা তার মন হতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। বস্তুতঃ নিজের অপমান ও অবগণনা কে কবে ভুলতে পেরেছে?

গুণসেনের মনে পশ্চাত্তাপের আগুন প্রকটিত হলেও এখানো তা ভস্মাবৃতই ছিল। গুণসেনের অতিরিক্ত সেই পশ্চাত্তাপের বেদনা সেখানে উপস্থিত আর কেউ যে বুঝবে তারো সম্ভাবনা ছিল না।

একদিকে গুণসেন যেমন তার অতীতে কৃত অত্যাচারের কথা মনে করে মনে মনে জ্বলে মরছিল অন্যদিকে অগ্নিশর্মাও তেমনি তার অতীতের

অবমাননার কথা স্মরণ করে অন্তরে অন্তরে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। গুণসেনের পশ্চাত্তাপের মতো তার বিক্ষুব্ধতাও সেখানে উপস্থিত আর কেউ বুঝবে তারও সম্ভাবনা ছিল না। তাই দুই জনেই নিজের নিজের মনোভাবকে শমিত করবার যথাশক্তি প্রয়াস করছিল।

কিছুক্ষণ পরে গুণসেন কুলপতিকে সম্বোধিত করে বলল, তাপসদের পদঃরজে আমার প্রাসাদ পবিত্র হোক এই আমার ইচ্ছা। আপনি কি ভিক্ষার জন্য আমার প্রাসাদে পদার্পণ করবেন না?

আচার্য কৌণ্ডিন্য বললেন, রাজার যে আশ্রয় আমরা লাভ করি তাই কি আমাদের পর্যাপ্ত নয়? ভিক্ষার জন্য ত আমরা যেখানে খুশী যেতে পারি। রাজার প্রাসাদ বা দরিদ্রের কুটীর দুইই আমাদের পক্ষে সমান। তবে অগ্নিশর্মার বিষয়ে ত আমি কিছুই বলতে পারব না।

অগ্নিশর্মার তপস্যা অনন্য ধরণের। ওর ভিক্ষার নিয়মও আবার সেই-রকম অনন্য।

অগ্নিশর্মা তখন বিষয়টার স্পষ্টীকরণ করে বলল, আমি একটা ঘরেই কেবল ভিক্ষার জন্য যাই। যার ঘরে যাই তা প্রথমে নির্দ্ধারিতও করি না। সেখানে ভিক্ষা পেলাম ত ভালো, না পেলে দ্বিতীয় দিন হতে আর এক মাসের উপবাস। আমার মনে ধনী দরিদ্রের কোনো প্রভেদ নেই।

একমাস পূর্ণ হতে আর মাত্র পাঁচ দিন বাকী ছিল। পঁচিশ দিনের উপবাস তবু নিজের পারনের ব্যাপারে অগ্নিশর্মার কোনো আগ্রহ ছিল না, কবে উপবাস শেষ হবে, কবে সে আহার প্রাপ্ত হবে সে ধরণের কোনো দুর্বলতা তার কথায় প্রকাশিত হল না।

গুণসেন বলল, এবার ত আপনি আমার প্রাসাদেই পদার্পণ করে ভিক্ষা গ্রহণ করুন—এই আমার বিনম্র প্রার্থনা।

অগ্নিশর্মারও এতে কোনো বিরোধ ছিল না। মহারাজের পুত্র তুল্য জামাতা যখন এই প্রকার বিনম্র প্রার্থনা করছে সেখানে সে তার অনাদরই বা কি ভাবে করে। তবুও অগ্নিশর্মা এভাবে প্রত্যুত্তর দিল, দু'ঘন্টা পরে কী হবে তা কেউ জানে না। পাঁচ দিন আগে তাই কথা দেওয়া আমাদের আচারের অনুকূল নয়। তবে তোমার প্রার্থনা আমি অবশ্যই মনে রাখব।

রাজকুমারের বিনম্র প্রার্থনা ও তাপসের মর্যাদা রক্ষা করে তার স্বীকারে আচার্য কৌণ্ডিন্ত অগ্নিশর্মার মনে মনে প্রশংসা করলেন। অগ্নিশর্মা কেবলমাত্র শুক্‌নো তপস্বীই নয়, নিজের মর্যাদা সম্পর্কেও সচেতন ও সাবধান তা দেখে তিনি গভীর সন্তোষ লাভ করলেন।

গুণসেনও আশ্রম পরিদর্শন করে প্রাসাদে ফিরে গেল। সকালে যে গুণসেন ছিল বিকেলে সে গুণসেন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

॥ ৪ ॥

পঁচিশ দিন ধরে খিদের সঙ্গে যুদ্ধে নিরত অগ্নিশর্মার শেষেরও পাঁচ দিন ব্যতীত হয়ে গেল। এই পাঁচ দিনের প্রত্যেক পল কত বিষম ও কত কঠিন ছিল তা কে জানে?

যারা ঐশ্বর্য ও ভোগ সুখের মধ্যে বাস করে তারা অগ্নিশর্মার মাসোপবাসের শেষের দিনগুলোর বিষমতা ও কঠিনতা কদাচিৎই বুঝতে পারবে। দীর্ঘ উপবাসের প্রথম ও শেষের দিকের দিনগুলো তপস্বীর সংযম সাগরে উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করে। যারা এক পলও ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্য করতে পারে না, যাদের আহার ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অতিরিক্ত অন্য কোনো ধ্যেয় নেই তাদের কাছে অগ্নিশর্মার এই তপশ্চর্যা আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয় বলে মনে হবে।

সে যাই হোক, পাঁচ দিন পূর্ণ হলে তপস্বী অগ্নিশর্মা আহারের সন্ধানে বসন্তপুরের রাজমার্গে বেরিয়ে পড়ল। শরীরকে যে সাধনরূপ মনে করে, দমন রূপ আগুনে আত্মকল্যাণ রূপ সোনাকে পরিশুদ্ধ করাতেই যার দৃষ্টি সে সুস্বাদু আহারের জন্য কেন লোলুপ হবে? অগ্নিশর্মা মাত্র দেহের নির্বাহের জন্যই আহারের খোঁজে বার হয়েছিল।

উপরোপরি উপবাসে অগ্নিশর্মার দেহকে শুষ্ক ও জীর্ণ করে দিয়েছিল। সামান্য পথিকদের কাছে তাই সে মূর্তিমান ক্ষুধা বলেই প্রতিভাত হত। তবে অন্ন না পেয়ে যারা ক্ষুধায় থাকে ও যারা ক্ষুধার দুঃখের বিরুদ্ধে সিংহ বিক্রমে যুদ্ধ করে তাদের মধ্যে পার্থক্যও অনেক। এবং সে পার্থক্য যারা অগ্নিশর্মার চোখে সংযম ভরা তেজস্বীতা দেখেছে তারাই বুঝতে পারবে। অগ্নিশর্মা

ক্ষুধার দুঃখকে যে সহ্য করত শুধু তাই নয় ক্ষুধার বেদনাকেও যেন সে নিজের মধ্যে পরিপাক করে নিয়েছিল। অন্নকে প্রাণ বলা হয়। কিন্তু সেই প্রাণেরও যে পরোয়া করে না সেই অগ্নিশর্মাকে অস্থিচর্মসার মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম বিকৃতির ওপর জয়লাভকারী কোন এক বিশ্ব-বিজেতা যেন বসন্তপুরের সুরম্য অট্টালিকাগুলোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে।

যারা এই তপস্বীকে জানত বা বুঝত তারা তাই আশ্চর্য চকিত হয়ে ভাবতে লাগল যিনি অল্প সীমার মধ্য হতেই ভিক্ষা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করতেন তিনি আজ তন্ময়ের মতো পথ অতিবাহিত করে না জানি কোথায় চলেছেন!

দু'একজন ত একটু সাহস করে তাকে তাদের ঘরে ভিক্ষা নেবার জন্য অঞ্জলিবদ্ধ হাতে প্রার্থনাও করেছিল কিন্তু প্রত্যুত্তরে তারা তপস্বীর মৃদুহাস্যরূপ পুরস্কারই কেবল লাভ করল।

কিছুদুর আরো যাবার পর রাজপ্রাসাদ দেখা গেল। সেই সময় অগ্নিশর্মার মনে হল কে যেন তার কানে কানে গুপ্তমন্ত্রদানের মতো চুপে চুপে বলছে, যেন আর কেউ না শুনতে পায়: হে তাপস, তুমি এভাবে রাজৈশ্বর্যের অংশীদার হতে কোথায় চলেছ? তপস্বীর রাজপ্রাসাদের ভোগোপভোগের ভাগ নেওয়া শোভা পায় না। তুমি কি নিজের অন্তর ভালো করে যাচাই করে দেখে নিয়েছ? রাজপ্রাসাদ তো প্রলোভনের, লোভ ও লালসার মায়ামন্দির স্বরূপ। রাজসৎকার বা রাজআতিথ্য কাঁচা পারার মতো, যদি পরিপাক করতে পার ত আনন্দের সঙ্গে যাও নয়ত তরবারির ধারের ওপর চলা হতে নিবৃত্ত হও।

[ক্রমশঃ

প্রার্থনা

নির্জিত যাঁর রাগ দ্বেষ আদি,
হয়েছে যাঁর ভুবন জ্ঞান,
মোক্ষপদের উপদেশ যিনি
নিস্পৃহ হয়ে করেন দান। ১

বুদ্ধ বীর জিন হরি হর ব্রহ্মা
যে নামেই তুমি ডাকো না তাঁকে,
ভক্তিভাবে সদা চালিত হয়ে
চিত্ত যেন তাঁয় লগ্ন থাকে। ২

বিষয়ের আশ নেইক যাঁদের,
সাম্য ভাবেতে পূর্ণ মন,
আপন পরের কল্যাণে যাঁরা
দিবস রাত্রি মগ্ন র'ন। ৩

স্বার্থ ত্যাগের কঠিন চর্যা
খেদহীন আরো বহেন যাঁরা,
এমন সাধু জ্ঞানী সুজন
জীবের দুঃখ হরেন তাঁরা। ৪

সৎসঙ্গ যেন তাঁদের থাকে,
ধ্যান যেন তাঁদেরি হয়,
তাঁদের মতন চর্যায় মন
সতত আমার মগ্ন রয়। ৫

দুঃখ যেন না দেই কায়েও,
মিথ্যা না বলি জীবনে কভু,
কামিনী কাঞ্চনে লোভ না করি,
সন্তোষ রাখি হৃদয়ে প্রভু। ৬
অহঙ্কার না যেন করি,
ক্রুদ্ধ না হই কখনো আমি,
অন্যের দেখি অভ্যুদয়
ঈর্ষ্যা কাতর না হই স্বামি। ৭
এ ভাবনা যেন থাকে মোর বুকে—
সরল সত্য সুব্যবহার,
এ জীবন দিয়ে যত দূর পারি
করে যাই যেন পরোপকার। ৮
মৈত্রী আমার সকল জীবে,
সবার প্রতি নিত্য রহে,
দীন দুঃখী সবার লাগি
হৃদয়ে করুণা স্রোত বহে। ৯
দুর্জন যারা, কুমার্গগামী,
ক্রুদ্ধ না হই তাদেরো প্রতি,
সাম্য ভাবে যেন তাদেরো দেখি,
হয় যেন মোর সে পরিণতি। ১০
দেখি গুণীজনে হৃদয়ে আমায়
প্রেম ভাব যেন উদিত হয়,
এ জীবন যেন তাঁদের সেবায়
আনন্দে সদা নিরত রয়। ১১
কৃতঘ্ন যেন না হই কভু,
বিদ্বেষ যেন বুকে না রাখি,
দোষ পানে যেন দৃষ্টি না যায়,
গুণগ্রাহী যেন সতত থাকি। ১২

ভালো বা মন্দ যেমন বলুক,
লক্ষ্মী যান বা লক্ষ্মী র'ন,
লক্ষ বর্ষ হোক পরমায়ু,
অথবা মৃত্যু হয় এখন। ১৩

প্রলোভন যত আসে আসুক,
রক্ত চক্ষু দেখাক ভয়,
ন্যায় পথ হতে ভ্রষ্ট না হই—
এ জীবন যেন এমন হয়। ১৪

গর্ব না করি সুখেতে যেন,
দুঃখে না হই ধৈর্যহারা,
পর্বত নদী শ্মশান অটবী—
দমিতে না পারে আমায় তারা। ১৫

থাকে যেন মন অচল দৃঢ়,
ভয় যেন সে না করে কারো,
ইষ্ট বিয়োগে অনিষ্ট যোগে
সহনশীল যেন হয় সে আরো। ১৬

সুখী যেন হয় সংসারে সবে,
দুঃখ না থাকে কাহারো প্রাণে,
দ্বেষ অভিমান পরিহরি সবে
রত রয় যেন আনন্দ গানে। ১৭

ঘরে ঘরে যেন ধ্যান আরাধনা,
না থাকে পাপ অবনী পরে,
উন্নত করি চারিত্র জ্ঞান
মানব জন্ম সফল করে। ১৮

অভাব না যেন থাকে কোথাও,
প্রয়োজনে মেঘ বর্ষে বারি,
রাজা যেন হয় প্রজাপুঞ্জের
ন্যায়ানুযায়ী শাসনকারী। ১৯

রোগ মারী ভয় নাহি থাকে যেন,
সর্বদা সবে সুখেতে রয়,
কল্যাণকারী অহিংসা যেন
সবখানে পরিব্যাপ্ত হয়। ২০

থাকে প্রেম ভাব সকলের সাথে,
মোহ যেন থাকে অনেক দূর,
কেহ নাহি কহে কাহারেও যেন
অপ্রিয় শব্দ কঠিন ক্রূর। ২১

যুগ নেতা হয়ে সকলে আমরা
সব সঙ্কট সহজে বরি
বস্তু স্বরূপ বিচারিয়া যেন
ধর্মের অভিবৃদ্ধি করি। ২২

পণ্ডিত যুগল কিশোর মুখ্‌তার-এর 'মেরী ভাবনা'র বঙ্গানুবাদ।

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।
- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা :

  জৈন ভবন

  পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

  ফোন : ৩৩-২৬৫৫

  অথবা

  জৈন সূচনা কেন্দ্র

  ৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) বিধির (১৯৫৬) ৮নং ধারা অনুসারে প্রদত্ত বিবৃতি :

প্রকাশন স্থান : কলিকাতা

প্রকাশের কাল : মাসিক

মুদ্রকের নাম : গণেশ লালওয়ানী (ভারতীয়)

ঠিকানা : পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

প্রকাশকের নাম : গণেশ লালওয়ানী (ভারতীয়)

ঠিকানা : পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

সম্পাদকের নাম : গণেশ লালওয়ানী (ভারতীয়)

ঠিকানা : পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

স্বত্বাধিকারীর নাম : জৈন ভবন

ঠিকানা : পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

আমি, গণেশ লালওয়ানী, ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

গণেশ লালওয়ানী

১৫. ৩. ৭৫

প্রকাশকের স্বাক্ষর

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ চৈত্র ১৩৮১ ॥ দ্বাদশ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :

গণেশ লালওয়ানী

বৰ্দ্ধমান মহাবীর

[জীবন চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]
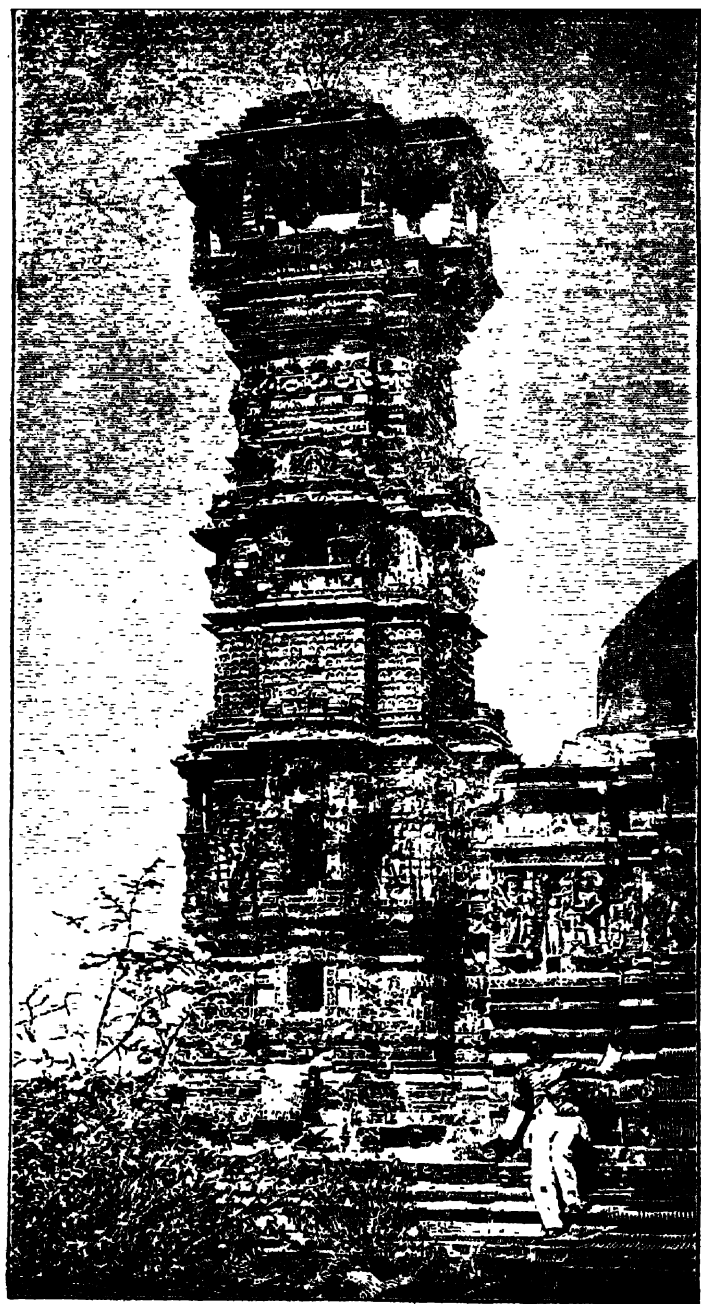
কৌশাম্বীতে সেদিন মহারাণী মৃগাবতী মহামাত্য, মহাদণ্ডনায়ক প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী ও বিশিষ্ট নাগরিকদের এক সভা আহ্বান করেছেন। সকলে উপস্থিত হলে তিনি সর্বসমক্ষে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনারা সকলে আশ্চর্য হয়ে ভাবছেন আজ কেন এই সভা ডেকেছি। আপনারা সকলে জানেন যে দীর্ঘদিন ধরে নগরীর সুরক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। প্রাকার নির্মাণ করা হয়েছে, পরিখা খনন করা হয়েছে, সৈন্যদল বৃদ্ধি করা হয়েছে, যুদ্ধ সম্ভারও সংগ্রহ করা হয়েছে। নগরী পরিবেষ্টিত হলে দু'তিন বছর অবরোধের সম্মুখীন হতেও তা সমর্থ। এবং এও আপনারা জানেন যে এই সমস্ত কাজ উজ্জয়িনীর চণ্ডপ্রদ্যোতের সাহায্যে সম্পন্ন হয়েছে। চণ্ডপ্রদ্যোত আমার স্বামীর মৃত্যুর সময় কৌশাম্বী আক্রমণ করতে এসেছিলেন। তার পরিবর্তে কৌশাম্বীকে অভেদ্য করে দিয়েছেন। এ আপনাদের কাছে রহস্য-জনক বলে মনে হতে পারে এবং সেইজন্যই আমি আজ আপনাদের এখানে আহ্বান করেছি। এবং এও হয়ত আপনাদের অবিদিত নেই যে চণ্ডপ্রদ্যোতের কৌশাম্বী আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিলাম আমি। মহারাজ তখন বিগত হয়েছেন, আর কুমার উদয়ন তখন নাবালক। সেই অবস্থায় কূটনীতির আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আমার আর উপায়ান্তর ছিল না। তাই চণ্ডপ্রদ্যোতকে আমি গোপনে বলে পাঠালাম যে আমি তাঁর সঙ্গে উজ্জয়িনী যেতে প্রস্তুত আছি কিন্তু তার আগে কৌশাম্বীকে সুরক্ষিত করে দিয়ে যেতে চাই যাতে উদয়ন কোনো বিপদের সম্মুখীন না হয়। চণ্ডপ্রদ্যোত আমার কথায় বিশ্বাস করে নগরীকে সুরক্ষিত করে দিয়েছেন। এখন তিনি অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। আগামী কালই তাঁর কাছে আমার যাবার শেষ দিন।

মৃগাবতী একটু থামতেই সভায় একটা গুঞ্জন উঠল। মৃগাবতী তখন আবার বলতে লাগলেন, আপনারা যুদ্ধের কথা ভাবছেন। চণ্ডপ্রদ্যোতের সঙ্গে যুদ্ধ করা বাতুলতা। তাতে উভয় পক্ষের লোক ক্ষয় হবে কিন্তু আপনারা আমাকে রক্ষা করতে পারবেন না। এর একমাত্র যে উপায় আছে তা আমি ভেবে রেখেছি এবং সেই কাজ করবার জন্যই আমি আপনাদের এখানে আহ্বান করেছি। আমি হৈহয় বংশীয় ক্ষত্রিয় কন্যা ও মহারাজ শতানীকের মতো ক্ষত্রিয়ের মহিষী। আমি চণ্ডপ্রদ্যোতের অঙ্কশায়িনী হব তা কখনো সম্ভব নয়। কাল আপনারা আমার মৃতদেহ চণ্ডপ্রদ্যোতের কাছে নিয়ে যাবেন আর আমার আত্মা আমার স্বর্গত স্বামীর কাছে গমন করবে।

মৃগাবতী এই বলে থামলেন। সমস্ত সভা তখন বিস্মিত ও স্তম্ভিত। সকলেই মৃগাবতীর বুদ্ধি ও চাতুর্যের, শীল ও সাহসের প্রশংসা করলেন কিন্তু সত্যিই কি মহারাণীর মৃত্যু ছাড়া এ সমস্যা সমাধানের আর কোনো উপায় নেই। মহারাণীর আত্মহত্যার কথা তাঁরা ভাবতেই পারেন না—

অনেকক্ষণ সভা নিস্তব্ধ রইল। তারপর একজন নাগরিক সহসা উঠে দাঁড়াল ও মৃগাবতীকে সম্বোধন করে বলতে লাগল, মহারাণী, আত্মহত্যা সব সময়েই পাপ। আমার তাই মনে হয় যে আপনি যদি ভগবান বর্দ্ধমানের সাধ্বী সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করেন তবে উভয় দিক রক্ষা পায়।

কথাটা সকলেরই মনঃপূত হল। মৃগাবতীরও। কিন্তু কালই তিনি কি করে বর্দ্ধমানের সাধ্বী সংঘে প্রবেশ করবেন? তিনি এখন কোথায় অবস্থান করছেন? তাঁর কাছে কীভাবে যাওয়া যায়?—ইত্যাদি বিষয় বিচার্য হয়ে উঠল। সভা পরদিনের জন্য স্থগিত রাখা হল।

কিন্তু পরদিন ভোর হতে না হতেই সংবাদ এল বর্দ্ধমান কৌশাম্বীর উপকণ্ঠস্থিত, চন্দ্রাবতরণ চৈত্যে এসে অবস্থান করছেন। তখন মৃগাবতী তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে বর্দ্ধমানের দর্শন ও বন্দনা করবার জন্য চন্দ্রাবতরণ চৈত্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ওদিকে চণ্ডপ্রদ্যোৎও বর্দ্ধমানের আসার খবর পেয়ে চন্দ্রাবতরণ চৈত্যে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

বর্দ্ধমান সেই সভায় আত্মার অমরত্ব, কর্মের বন্ধন, সংসারের অসারতা, জন্ম

মৃত্যুর দুঃখ, অহিংসা, সংযম ও তপস্যায় সেই দুঃখ হতে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় তা ওজঃস্বিনী ও মর্মস্পর্শী ভাষায় বিবৃত করলেন। জনতা তা মন্ত্র-মুগ্ধের মতো শ্রবণ করল। সেই সময়ের জন্য জনতার মন হতে যেন রাগদ্বেষাদি ভাব একেবারে দূর হয়ে গিয়েছিল।

বর্দ্ধমান যখন তাঁর উপদেশ শেষ করলেন তখন মৃগাবতী উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বর্দ্ধমানকে তিনবার প্রদক্ষিণা ও প্রণাম করে বললেন, ভগবন্, আমি সংসারের অসারতা উপলব্ধি করেছি। এর প্রতি আমার আর কোনো মোহ নেই। জন্ম, জরা ও মৃত্যুর দুঃখ হতে মুক্তি পাবার জন্য আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সাধ্বী সংঘে প্রবেশ করতে চাই। ভগবন্, আপনি আমায় গ্রহণ করুন।

বর্দ্ধমান বললেন, দেবানুপ্রিয়ে, তোমার যেমন অভিরুচি।

প্রদ্যোত অপলক দৃষ্টিতে মৃগাবতীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন আর ভাবছিলেন: এই নারী কি সেই মৃগাবতী যার ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি উজ্জয়িনী হতে কৌশাম্বী ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু এ রূপত মোহ উৎপন্ন করে না। বরং ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাবের জন্য শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমেরই উদ্ভব করে।

বস্তুতঃ বর্দ্ধমানের সান্নিধ্যে তাঁর অন্তরেও এক বিরাট পরিবর্তন সংসাধিত হয়েছিল। তাই এতদিনের উৎকট কামনা তাঁর কাছে ভ্রম ও অন্যায় বলেই মনে হতে লাগল। চণ্ডপ্রদ্যোত তাই মৃগাবতীর সাধ্বী ধর্ম গ্রহণে কোনো বাধাই দিলেন না। বরং পরদিন সকালে কৌশাম্বীতে প্রবেশ করে উদয়নকে সিংহাসনে বসিয়ে উজ্জয়িনীতে ফিরে গেলেন ও বলে গেলেন কেউ যদি কৌশাম্বী আক্রমণ করে তবে যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয়। তাহলে তিনি সসৈন্যে তখনি এসে কৌশাম্বী রক্ষা করবেন।

এভাবে মৃগাবতীর জীবনই রক্ষা পেল না, আর্যা চন্দনার সান্নিধ্যে তিনি কঠোর সংযম ও তপস্যাচরণ করে অচিরেই মুক্তি লাভ করলেন।

বর্দ্ধমান মৃগাবতীকে দীক্ষিত করবার পর কিছুকাল কৌশাম্বীতে অবস্থান করলেন তারপর বিদেহ ভূমির দিকে গমন করলেন। সেই বর্ষাবাস তিনি বৈশালীতেই ব্যতীত করবেন।

বর্দ্ধমান বর্ষাবাস শেষ হলে মিথিলার দিকে গমন করলেন। সেখান হতে আবার কাকন্দীতে ফিরে এলেন।

কাকন্দী হতে বর্দ্ধমান শ্রাবস্তী হয়ে কাম্পিল্য নগরে এলেন। কাম্পিল্য নগরে গৃহপতি কুণ্ডকোলিককে শ্রাবক ধর্মে দীক্ষিত করলেন। তারপর অহিচ্ছত্রা, গজপুর হয়ে পোলাসপুর এলেন।

পোলাসপুরে তখন সদ্দালপুত্র নামে এক ধনী কুমোর বাস করত। তার তিন কোটি টাকার সম্পত্তি ছিল ও ৫০০ গরুর গোত্রজ। পাঁচশ তার মাটির বাসনের দোকান ছিল যেখানে এক হাজার লোক কাজ করত। সদ্দালপুত্র ধর্মারাধনাও করত। তবে সে আজীবিক ধর্মাবলম্বী ছিল।

সেদিন রাত্রে সে যখন শুয়ে ছিল তখন সে একটা স্বপ্ন দেখল। দেখল কে যেন তাকে ডাক দিয়ে বলছে, সদ্দালপুত্র, কাল সকালে এদিক দিয়ে সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী মহাব্রাহ্মণ যাবেন। তাঁর কাছে গিয়ে তোমার ঘরে থাকবার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ কোরো ও তাঁর অবস্থানের জন্য কাষ্ঠ ফলকাদির ব্যবস্থা করে দিও।

সদ্দালপুত্রের সেই স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। সে ভাবল তাহলে সকালবেলায় তার ধর্মাচার্য মংখলীপুত্র গোশালক পোলাসপুরে আসবেন। কারণ তিনি ছাড়া এ যুগে আর কে সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও মহাব্রাহ্মণ আছে?

সদ্দালপুত্র তাই সেদিন তাড়াতাড়ি উঠে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে মংখলীপুত্রের কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল। তারপর যখন সে ঘরের বাইরে এল তখন সে শুনল পোলাসপুরের বাইরে জ্ঞাতপুত্র শ্রমণ ভগবান বর্দ্ধমান এসেছেন।

সদ্দালপুত্র সেকথা শুনে হতোৎসাহ হল। মহাব্রাহ্মণকে ঘরে অবস্থানের জন্য আহ্বান ত দূরের তাঁর দর্শন করবার ইচ্ছাও তার শান্ত হয়ে গেল। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তখন তার স্বপ্নের কথা আবার মনে হল। ভাবল তবে বর্দ্ধমানের কাছে তার যাওয়াই উচিত। তখন সে বর্দ্ধমানের কাছে গেল ও তাঁকে বন্দনা করে তার ঘরে থাকবার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। বর্দ্ধমান তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তার ভাণ্ডশালায় এসে উপস্থিত হলেন।

সদ্দালপুত্র বর্দ্ধমানের থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েই নিজের কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়ল। বর্দ্ধমানের সৎসঙ্গ সে করল না বা তা করবার তার ইচ্ছাও ছিল না।

কিন্তু বর্দ্ধমান এসেছেন তাকে ভ্রান্তপথ হতে সত্যপথে তুলে নিতে। তাই তার উপেক্ষা তিনি গায়ে নিলেন না বরং একদিন তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন সদ্দালপুত্র এই সব মাটির বাসন কি করে তৈরী হল ?

সদ্দালপুত্র বলল, ভগবন্, মাটি হতে। প্রথমে মাটিকে জল দিয়ে কাদাকাদা করে নিতে হয় তারপর নাদ, তুষি, আদি মিলিয়ে দলা পাকাতে হয়। সেই দলাকে চাকে তুলে চাক ঘুরাতে হয়। ঘোরানোতে হাঁড়ি, কলসী, বাসনপত্র তৈরী হয়।

বর্দ্ধমান বললেন, সদ্দালপুত্র, আমি সেকথা জিজ্ঞাসা করিনি। আমার প্রশ্নের তাৎপর্য, এগুলো কি পুরুষাকারে হয়েছে না নিয়তি বশে ?

ভগবন্, নিয়তি বশে। তাছাড়া জগতের সমস্ত কিছু নিয়তিরই অধীন। যার যা নিয়তি তা না হয়ে যায় না। পুরুষ প্রযত্ন সেখানে ব্যর্থ।

সদ্দালপুত্র, তোমার ওই বাসন কেউ যদি ভেঙে দেয়, ফেলে দেয়, ছড়িয়ে দেয় তবে তুমি কি কর ?

ভগবন্, যদি তাকে ধরতে পারি ত খুব মারি। এমন মারি যাতে সে জীবনেও না ভোলে।

সদ্দালপুত্র, তুমি তাকে কেন মারবে ? সে যদি তোমার বাসন ভেঙে দিয়ে থাকে, ফেলে দিয়ে থাকে, ছড়িয়ে দিয়ে থাকে তবে তা নিয়তি বশেই ভেঙে দিয়েছে, ফেলে দিয়েছে, ছড়িয়ে দিয়েছে। তুমি ত নিজেই বললে পুরুষ পরাক্রম বলে কিছু নেই।

সদ্দালপুত্র নিরুত্তর।

সদ্দালপুত্র যখন বুঝতে পারল, নিয়তিবাদের সিদ্ধান্ত অব্যবহারিক তখন সে বর্দ্ধমানের পায়ে নত মস্তক হয়ে বলল, ভগবন্, আমি নির্গ্রন্থ প্রবচন শুনবার অভিলাষী।

বর্দ্ধমান তাকে নির্গ্রন্থ প্রবচন শোনালেন। বললেন, সবই যদি নিয়তি জন্য তবে মোক্ষও নিয়তিবশে অনায়াসলভ্য। তবে এত জপ তপ ধ্যান ধারণার প্রয়োজন কি ? সুপ্ত সিংহের মুখে এসে কি হরিণ শিশু প্রবেশ করে ? তাই চাই পুরুষাকার, আত্মার নির্মাণের জন্য সতত প্রচেষ্টা।

সদ্দালপুত্র বর্দ্ধমানের প্রবচনে প্রভাবান্বিত হয়ে সস্ত্রীক তাঁর কাছে শ্রাবক ধর্ম গ্রহণ করল।

সদ্দালপুত্রের ধর্মপরিবর্তনের কথা যখন আজীবিক নেতা মংখলীপুত্রের কানে গেল তখন তাঁর মনে হল যেন বজ্রপাত হয়ে গেছে। কারণ সদ্দালপুত্র একজন সাধারণ গৃহস্থ ছিল না। আজীবিক মতাবলম্বীদের মধ্যে তার বিশিষ্ট স্থান ছিল। তাই রাগে দুঃখে গোশালক তাঁর নিকটস্থ আজীবিক সাধুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ, শুনেছ, পোলাসপুরের ধর্মস্তম্ভের পতন হয়েছে। শ্রমণ মহাবীরের উপদেশে সদ্দালপুত্র আজীবিক সম্প্রদায় পরিত্যাগ করে নির্গ্রন্থ প্রবচন গ্রহণ করেছে। কত দুঃখের কথা। কত পরিতাপের কথা। চল পোলাসপুরে চল। তাকে আবার আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনাই এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য।

গোশালক তাই আজীবিক শ্রমণ সংঘ নিয়ে পোলাসপুরে এসে সভা ভবনে অবস্থান করলেন ও তারপর কয়েকজন বাছাবাছা শ্রমণ নিয়ে সদ্দালপুত্রের আবাসস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

বর্দ্ধমান তার পূর্বেই পোলাসপুর পরিত্যাগ করে বাণিজ্যগ্রামের দিকে চলে গেছেন।

যে সদ্দালপুত্র মংখলিপুত্র গোশালকের নাম শুনলে পুলকিত হয়ে উঠত সেই সদ্দালপুত্র তাঁকে আজ সাধারণ অভ্যর্থনা জানাল, ধর্মাচার্যের সম্মান জানাল না। গোশালক এতে আরো ক্রুদ্ধ হলেও মনে মনে বুঝতে পারলেন যে বর্দ্ধমানের নিন্দা করে বা স্বমতের প্রশংসা করে সদ্দালপুত্রকে আজীবিক সম্প্রদায়ে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। তাই কণ্ঠস্বরকে যতদূর সম্ভব কোমল করে বললেন, দেবানুপ্রিয়, মহাব্রাহ্মণ কি এখানে এসেছেন?

সদ্দালপুত্র বলল, কে মহাব্রাহ্মণ?

শ্রমণ ভগবান বর্দ্ধমান।

আর্য, তিনি মহাব্রাহ্মণ কি করে?

তিনি জ্ঞান ও দর্শনের ধারক, জগৎ পূজিত ও সত্যিকার কর্মযোগী। তাই মহাব্রাহ্মণ। দেবানুপ্রিয়, মহাগোপ কি এখানে এসেছেন?

কে মহাগোপ?

শ্রমণ ভগবান বর্দ্ধমান।

তিনি মহাগোপ কি করে?

এই সংসাররূপী মহারণ্যে ভ্রান্ত পথশ্রান্ত সংসারী জীবকে তিনি ধর্মদণ্ডে গোপন করে মোক্ষরূপ নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। তাই তিনি মহাগোপ। দেবানুপ্রিয়, মহাধর্মকথী কি এখানে এসেছেন?

কে মহাধর্মকথী?

শ্রমণ ভগবান বর্দ্ধমান।

তিনি মহাধর্মকথী কি করে?

অসীম সংসারে যারা ধর্ম পথ ভুলে গিয়ে ভ্রান্ত পথে গমন করছে তাদের ধর্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়ে ধর্ম পথে আবার ফিরিয়ে আনছেন। তাই তিনি মহাধর্মকথী। দেবানুপ্রিয়, মহানির্যামক কি এখানে এসেছেন?

কে মহা নির্যামক?

শ্রমণ ভগবান বর্দ্ধমান।

তিনি মহানির্যামক কি করে?

সংসার রূপ অগাধ সমুদ্রে নিমজ্জমান প্রাণীদের তিনি ধর্মরূপ নৌকায় বসিয়ে নিজে পারে উপস্থিত করছেন তাই তিনি মহানির্যামক।

দেবানুপ্রিয়, আপনি যদি এমন চতুর, এমন নৈয়ায়িক, এমন উপদেশক ও বিজ্ঞানী তবে কি আপনি আমার ধর্মাচার্য ধর্মোপদেশক শ্রমণ ভগবান বর্দ্ধমানের সঙ্গে বাদ বিবাদ করতে সমর্থ?

না সদ্দালপুত্র, তাঁর সঙ্গে বাদ বিবাদ করতে আমি সমর্থ নই।

কেন? আমার ধর্মাচার্যের সঙ্গে আপনি বাদ বিবাদ করতে কেন সমর্থ নন?

এই জন্যই সমর্থ নই যে যখন কোনো যুবক মল্ল অপর মল্লকে ধরে তখন তাকে যেমন শক্ত করে ধরে তেমনি তিনি যখন হেতু, যুক্তি, প্রশ্ন ও উত্তরে যেখানেই আমাকে ধরেন সেখানেই আমাকে নিরুত্তর করে দেন। এই জন্য আমি তোমার ধর্মাচার্যের সঙ্গে বিবাদ করতে সমর্থ নই।

দেবানুপ্রিয়, আপনি যখন আমার ধর্মাচার্য ধর্মোপদেশকের বাস্তবিক প্রশংসা করছেন তখন আপনাকে আমি আমার ভাণ্ডশালায় অবস্থানের

জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনি যথাসুখ আমার ভাণ্ডশালায় অবস্থান করুন।

গোশালক তখন ভাণ্ডশালায় এসে অবস্থান করলেন ও নানা সময়ে নানা ভাবে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাতে সফল হলেন না। তখন তিনি হতাশ হয়ে পোলাসপুর পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। এই ঘটনায় বর্দ্ধমানের ওপর তিনি মনে মনে আরো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

বর্দ্ধমান পোলাসপুর পরিত্যাগ করে বাণিজ্য গ্রামে গেলেন। সেখানে তিনি সেই বর্ষাবাস ব্যতীত করবেন।

পোলাসপুর হতে নানা স্থানে পরিব্রজন করতে করতে বর্দ্ধমান এলেন রাজগৃহে। সেখানে তাঁর উপদেশে আকৃষ্ট হয়ে এবারে শ্রাবক ধর্ম গ্রহণ করলেন গাথাপতি মহাশতক।

বর্দ্ধমানের ধর্মসভায় একদিন পার্শ্বাপত্য স্থবিরেরা এলেন। তাঁরা বর্দ্ধমান হতে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ভগবন এই লোক অসংখ্য প্রদেশ বিশিষ্ট হলেও পরিমিত সেই পরিমিত লোকে অনন্ত রাত্রিদিন উৎসন্ন হয়েছে, হচ্ছে, হবে, না পরিমিত রাত্রিদিন উৎপন্ন হয়েছে, হচ্ছে, হবে?

বর্দ্ধমান বললেন, শ্রমণগণ, পরিমিত লোকে অনন্ত রাত্রিদিন উৎপন্ন হয়েছে, হচ্ছে, হবে।

ভগবন্, সে কিরূপ?

আর্যগণ, লোককে পুরুষাদানীয় পার্শ্ব নিত্য বলে শাশ্বত, অনাদি ও অনন্ত বলেছেন, সেইজন্য।

ভগবন্, এই লোককে লোক কেন বলা হয়? সেকি 'যো লোক্যতে স লোকঃ' সেই জন্য?

আপনারা ঠিকই বলেছেন, ভাগবতগণ। অজীব দ্রব্যের দ্বারা এই লোক দৃষ্টি গোচর হয়, নিশ্চিত হয়, নিরূপিত হয়। তাই একে লোক বলা হয়। এই লোক অনাদি, অনন্ত পরিমিত অলোকাকাশের দ্বারা পরিবৃত। নীচে বিস্তীর্ণ, মধ্যে কটিবৎ, ওপরে বিশাল।

[ক্রমশঃ

প্রণাম

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

সেই সংবিৎ সিদ্ধাবস্থা লাভের জন্য
আমার চিত্ত তোমার দুয়ারে থাক নিষণ্ণ।
সত্য শ্রদ্ধা বিবেকদৃষ্টি পরম মোক্ষ
সংজ্ঞা শৌর্য চারিত্র্যাচার হোক সুদক্ষ !

পদার্থ প্রাণ-স্বরূপ জানার চেতনাদর্শ—
প্রেরণা সহিত সংযত চিত্তে আসুক হর্ষ।
ইন্দ্রিয় ভোগী পশুর জীবনে নয় তো দীক্ষা,
অহিংস্র প্রাণ ব্রতের আলোকে হবেই শিক্ষা !

দর্শন জ্ঞান স্বভাবে দিব্য ভাবের যত্ন
সাধক চিত্তে ফোটাক মন্ত্র তত্ত ত্রিরত্ন।

প্রণাম জানাই তাইতো তোমায় সিদ্ধ,
অর্হৎ যিনি শুচি ও অপাপবিদ্ধ।
আচার্য ও উপাধ্যায়ে প্রণাম জানাই ভক্তে,
প্রণাম জানাই বিশ্বের সকল সাধু সঙ্ঘে।

মধুবনের জৈন মন্দিরে

শ্রীবিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

সকাল যেই দেখালো মুখ, দুপুর আয়োজন
করলো যদি বিকেল এসে জানালো আবেদন
দিলাম বলে সবাইকেই
কাজও নেই, সময়ও নেই,
ছুটীও নয়, ছুটীরও চেয়ে আলাদা আলোড়ন
আজকে মন করেছে অধিকার ;
মাথার কাজ মাথায় চেয়ে করুক ধ্যানী মন
ডাইনে বাঁয়ে নেইকো কেউ, নেই কো প্রয়োজন
দস্যু কাজের ভিড়ে ভাবনা থামাবার।

ছোটো এ-ঘর এখানে শুধু জানলা দিয়ে দেখা
কিনার ছুঁয়ে যেখানে পথ চলেছে একা একা
দুপুর রোদে শালের বন ছায়ায় ঘেরে ঢাকা
ছড়িয়ে রেখে পাথুরে পথ ঘুমায় মধুবন।
আগল-ভাঙা এখানে খোলা মনের বাতায়ন।

আকাশ ছোট ; প্রসার তার পাহাড় দিয়ে ঘেরা—
এ নয় পথ, এ নয় নীড় ;
শালের বন, পাইন, চীড়—
জমায় নাকো কাজের ভিড় অজানা অচিনেরা,
পাহাড় কাঁদে, পাথর-ফাটা অশ্রু তার গড়াক না
যেমন দেখি তেমনি যেন ভুলি—
কুয়াশা আড়ে সূর্য যদি লুকোয় মুখ লুকোক না
পাথরে গাছে বুলোক না সে ইন্দ্রধনু-তুলি।

উঁচিয়ে-থাকা তর্জনীর শাসন মেনে জানি
আমার আছে নিয়তি সেই কলকাতার গলি—
এ সব কিছু এড়িয়ে তাই সেখানে ফের চলি।

মনের দোরে তবু যে ঘোরে সীতানালার সাঁকো
সে স্মৃতি বন-সন্নিধির ভুলতে পারি নাকো—
সিক্ত ভোরে ছোট্টো স্রোত, তারই সে-কলতান
স্মরণে এনে ধেয়ায় আজো কান—
তৃষিত চোখ, সে-স্মৃতি তুমি একটু করে চাখো।
অজানা পাখি পতঙ্গের আসঙ্গের দান—
সে-দানে অনুভবের ঝুলি ভর্তি করে রাখো।

নিকটকে যা দূরের করে—পন্থা-সংশয়;
খবর নাও কুয়াশা-ঢাকা সে পাকদণ্ডীর।
খবর নাও, খবর যত কীটের আর তৃণের
পাহাড় আর উপত্যকা, গিরির গ্রন্থির।
যাত্রী আসে, যাত্রী যায়;
কী তারা খোঁজে, কী তারা পায়?
ত্যাখে কি তারা একটুখানি বুঝে?
পাতায় ঘাসে আভাস যার পায় না কেন খুঁজে
অনির্মিত সংখ্যাতীত চরণ-মন্দির।

শ্রমণ উদায়ী

[একাঙ্কিকা]

প্রথম দৃশ্য

[বীতভয় নগরের রাজপথ। সময় প্রভাত। দু'জন নাগরিক গৃহের সম্মুখভাগ মালা পতাকাদি দিয়ে সজ্জিত করছে]

[একজন নাগরিকের প্রবেশ]

আগন্তুক : আজ কী উৎসব ভাই যে ঘরদোর সাজাচ্ছ ?

২য় নাগরিক : কেন জানো না উদায়ী আসছেন।

১ম নাগরিক : রাজা উদায়ী।

২য় নাগরিক : রাজর্ষি উদায়ী যিনি রাজ্য ধন সম্পদ পরিবার পরিজন সব কিছু পরিত্যাগ করে ভগবান মহাবীরের শরণ নিয়েছেন। তিনিই আজ আবার এই নগরে ফিরে আসছেন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে তিনি যে অমৃত পেয়েছেন সেই অমৃত জনে জনে দেবেন বলে। শুনে বর্তমান রাজা সবাইকে আদেশ দিয়েছেন ঘরদোর সাজাতে, তাঁকে স্বাগত করতে। তাঁর থাকবার বা ভিক্ষা পাবার যাতে এতটুকু অসুবিধা না হয়।

১ম নাগরিক : আর দেবেনই বা না কেন ? উদায়ীর দয়াতেই ত তিনি আজ এখানকার রাজা। এই রাজ্যত একদিন উদায়ীরই ছিল।

২য় নাগরিক : ঠিক। ইচ্ছা করলে এ রাজ্যত তিনি আর কাউকে দিতে পারতেন। তাঁকে দিয়েছেন সে তাঁর অনুগ্রহ। তাই তাঁর আসার খবর পেয়ে তিনি খুব মেতে উঠেছেন।

আগন্তুক : তা মাতবারই কথা। শুনে আমারো খুব আনন্দ হচ্ছে। সাধুসন্তের নগরে আগমন সেত মহৎ ভাগ্যের ফল। যাই আমিও আমার ঘরদোর সাজাই। দরজায় পাঁচ রঙা ফুলের মালা টাঙাবো। প্রবেশ পথের কাছে রাখব মঙ্গল কলস। মাটিতে আঁকব আলপনা।

২য় নাগরিক : তোমারও খুব কল্পনার দৌড় আছে ভাই। আলপনার কথাও আমার মনেই হয়নি।

[দূরে ঢোলের শব্দ]

১ম নাগরিক : ও কিসের শব্দ ভাই ?

২য় নাগরিক : ঢোলের। এদিকেই আসছে বলে মনে হচ্ছে।

[ঢোলবাদকের প্রবেশ। ঢোলবাদক কাঠি দিয়ে জোরে জোরে ঢোলে ঘা দিচ্ছে এবং একে একে নাগরিকেরা সেখানে এসে একত্রিত হচ্ছে]

২য় নাগরিক : ওহে ঢোলওয়ালা, আবার কী আদেশ নিয়ে এলে ভাই ?

ঢোল বাদক : [ঢোলে জোরে জোরে ঘা দিতে দিতে] ওত ব্যস্ত হলে হবে কেন ? দাঁড়াও বলি। আগে লোক জুটুক।

২য় নাগরিক : এইত অনেক লোক জুটেছে। আর কত লোক জুটবে।

ঢোলবাদক : (চারদিকে দেখে) হুঁ, আচ্ছা তবে শোন। সিন্ধু সৌবীরাধিপতি শ্রীমন্ মহারাজ…

[জনতার মধ্যে ঠেলাঠেলি]

ঢোলবাদক : ওত উতলা হয়ো না। মন দিয়ে শোন। শ্রীমন্ মহারাজ সোমদেব শর্মণঃ এই আদেশ প্রচারিত করছেন যে শ্রমণ উদায়ী বীতভয় নগরীতে…

২য় নাগরিক : ও আদেশ ত আমাদের জানা। সেই জন্যই ত ঘরদোর সাজাচ্ছি।

১ম নাগরিক : তোমার ওই এক দোষ। মাঝখানে কথা বলা। আগে শুনতে দাও ও কি বলছে।

২য় নাগরিক : কী আর বলবে ! বীতভয় নগরীতে এখন ঐ এক কথা।

ঢোলবাদক : না। তা নয়, তা নয়। সে খবর এখন পুরনো হয়ে গেছে।

২য় নাগরিক : তবে কি তিনি আসছেন না। অসুখ বিসুখ করেছে, না…

[জনতা হতে : ওকে চুপ করতে বলো, ওকে চুপ করতে বলো]

ঢোলবাদক : তোমরা সকলে চুপ কর। এ রাজার নূতন আদেশ। মন দিয়ে শোন। শ্রমণ উদয়ী বীতভয় নগরীতে আসছেন সেকথা পূর্বেই জানানো হয়েছে। তাঁর শুভাগমনের জন্য নগর সজ্জিত করবার আদেশ

বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল। কিন্তু এখন এমন সংবাদ পাওয়া গেছে যাতে মহারাজ সে আদেশ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। আরো বলেছেন বীতভয় নগরীর কোনো নাগরিক যেন তাঁকে স্বাগত না করে, থাকবার স্থান না দেয়, ক্ষুধার অন্ন এমন কী তৃষ্ণার জল পর্যন্ত না। কেউ তাঁর সঙ্গ করবে না বা কেউ তাঁর সঙ্গে বার্তালাপ করবে না। যে বা যারা রাজার এই আদেশ অমান্য করবে তাদের কঠোর সাজা দেওয়া হবে। তাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

[আবার ঢোলে ঘা দেয়]

১ম নাগরিক : আশ্চর্য ! অবিশ্বাস্য ! ওহে ঢোলওয়ালা, তুমি কি আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছ ?

ঢোলবাদক : রসিকতা ! রাজাদেশ নিয়ে রসিকতা চলে না। এই দেখ রাজার মুদ্রা।

১ম নাগরিক : তাইত ! তাইত ! কিন্তু এর কারণ ?

ঢোলবাদক : কারণের কথা আমি কী জানি। যদি সাহস হয় রাজাকে গিয়ে জিগ্যেস করো। তবে এই রাজাদেশ। যে অন্যথা করবে তাকে শূলে দেওয়া হবে।

[ঢোলবাদক ঢোলে ঘা দিতে দিতে দূরে চলে যায়।
জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে]

১ম নাগরিক : এখন কী করবে ভাই ?

২য় নাগরিক : কী আর করব, সব খুলে ফেলব। যাঁর রাজ্যে বাস করি তাঁর আদেশ অমান্য করে ত আর সে রাজ্যে বাস করা যাবে না। উদায়ী আজ আসবেন, কাল চলে যাবেন কিন্তু আমাদের ত এখানে চিরকাল বাস করতে হবে।

আগন্তুক : তা যা বললে। তবে রাজা রাজড়াদের মন বোঝা ভার আর আমাদের শুধু হয়রানি। আচ্ছা, তবে চলি।

[আগন্তুক চলে যায়। নাগরিক দু'জন মালা পতাকাদি খুলতে থাকে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বীতভয় নগরীর রাজপথ। সময় মধ্যাহ্ন। কয়েকজন নাগরিক পথ চলতে দেখা যাবে। এমন সময় শোনা যাবে—পালা, পালা। রাজা উদায়ী এদিকেই আসছেন। আর ওমনি দেখতে দেখতে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ হয়ে যাবে ও পথ জনশূন্য। খানিকবাদে রাজা উদায়ী প্রবেশ করবেন]

উদায়ী: আশ্চর্য! আমি যেদিকে যাই সেদিকের পথ দেখতে দেখতে জনহীন হয়ে যায়। ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। বীতভয়ে আসতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছি কিন্তু কোথাও এমন দেখিনি। কাশী, কোশল, পাঞ্চাল সবখানে পুণ্য লোভাতুর মানুষ আমার কাছে এসেছে। আমি তাদের সদ্‌ধর্মের কথা বলেছি। তারা শান্ত হয়ে সেই সদ্‌ধর্মের কথা শুনেছে, গ্রহণ করেছে। কিন্তু যাদের জন্য এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসা, তারা, সিন্ধু সৌবীরের অধিবাসীরা, আমার থেকে দূরে সরে রইল। জানিনা এর কী কারণ? আমিত তাদের অনিষ্ট করতে আসিনি। আমারত তাদের প্রতি সেই এক কল্যাণ ভাবনা। তবে কেন? তবে কেন? শ্রমণ ভগবান মহাবীর ঠিকই বলেছিলেন, 'তুমি বীতভয় নগরীতে যেতে চাচ্ছ—আচ্ছা, যাও'। তখন আমি তাঁর কথার তাৎপর্য বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, যারা একদিন আমার সন্তানস্থানীয় ছিল তারা আমার কাছ হতে সাগ্রহে সদ্‌ধর্ম গ্রহণ করবে। কিন্তু—কে ও…

[সুপ্রিয়ের প্রবেশ। উদায়ীকে দেখে ভূত দেখার মতো ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করবে কিন্তু না পেরে]

সুপ্রিয়: ও: আপনি!

উদায়ী: হ্যাঁ সুপ্রিয়, কিন্তু তুমি কী—আমায় এ ক'দিনের মধ্যেই ভুলে গেলে?

সুপ্রিয়: না না না, তা নয়। কিন্তু আমার ঘরে ত এতটুকু জায়গা নেই, না শয্যাফলক। তাছাড়া ভিক্ষা…

উদায়ী: সুপ্রিয়, আমি শয্যাফলক বা ভিক্ষার জন্ত উদ্বিগ্ন হইনি। কিন্তু তোমার ঘরে এত স্থানের অকুলান হল কিসে?

সুপ্রিয় : সে আপনি বুঝবেন না। [নেপথ্যের দিকে চেয়ে] কি বলছ ? তাড়াতাড়ি যেতে ? এই এলাম। [উদায়ীর প্রতি] কিছু মনে করবেন না। [দ্রুত প্রস্থান]

উদায়ী : আশ্চর্য ! কিন্তু এর পেছনে কোনো কারণ রয়েছে যা আমি ধরতে পারছি না। মনে হচ্ছে কোথাও যেন একটা গ্রন্থি পড়েছে। কিন্তু সে গ্রন্থির কে উন্মোচন করবে ?

তৃতীয় দৃশ্য

[নগরপ্রান্ত। সময় অপরাহ্ন]

উদায়ী : সমস্ত দিন অনাহারে গেছে। তৃষ্ণার জল পর্যন্ত পাইনি। আজ কিছু পাব বলে মনে হয় না। কিন্তু তার জন্য দুঃখ নেই। দুঃখ যে সদ্ধর্মের কথা এখানে প্রচার করতে এসেছিলাম তা প্রচার না করেই আমায় ফিরে যেতে হবে। দুঃখ ? শ্রমণের আবার দুঃখ ? দুঃখ ত আকাঙ্ক্ষার পরিণাম। শ্রমণকেত সমস্ত আকাঙ্ক্ষাই পরিত্যাগ করে আসতে হয়। তবে কি আমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হয় নি ? আমি সদ্ধর্ম প্রচার করব এই আমার আকাঙ্ক্ষা ! বুঝতে পেরেছি ভগবন্, বুঝতে পেরেছি কী আমার আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ। তুমি আমায় নিবারণ করলে আমার আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ এমনভাবে কোনো দিন ধরা পড়ত না। তাইত তুমি নিবারণ করোনি, নিষেধ করোনি। তোমার শিক্ষার পদ্ধতিই আলাদা। আমার কাছে সব কিছু স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে, সহজ হয়ে যাচ্ছে। শ্রমণের কোনো বিষয়েই আগ্রহ থাকা উচিত নয়। না, আমার মনে আর কোনো দুঃখ নেই, বেদনা নেই। আমার দেহে মনে একি এক অদ্ভুত নির্লিপ্ততা। কিন্তু এ আমি কোথায় এলাম ! নগরপ্রান্ত বলে মনে হচ্ছে। কে যেন ওই ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখি ওর কাছে যাই।

[কাঠ খড়ের যে ঘরের দরজায় কুমোর পত্নী দাঁড়িয়ে থাকে উদায়ী সেখানে এসে উপস্থিত হন]

কুমোরপত্নী : কোথা থেকে আসছ ?

উদায়ী : সহর থেকে।

কুমোর পত্নী : সহর থেকে। সেখানে থাকনি কেন ?

উদায়ী : থাকবার জায়গা পাইনি, খাবার অন্ন, পিপাসার জল। তাই।

কুমোর পত্নী : বলো কী ? তারা কী মানুষ ! আচ্ছা দাঁড়াও। আগে আমি ঘরে জিজ্ঞেস করি। ততক্ষণ তুমি ওই গাছের তলায় অপেক্ষা কর। [উদয়ীর তথাকরণ। কুমোর পত্নী ভেতরের দিকে লক্ষ্য করে] ওগো শুনছ ?

কুমোর : [ভেতর হতে] শুনছি। কি বল ?

কুমোর পত্নী : বলি একজন সাধু এসেছে। তাকে একটু থাকবার জায়গা দিতে হবে।

কুমোর : না না না। আমার ঘরে ওত জায়গা নেই। তাছাড়া খেতে না পেয়ে ওমন অনেক সাধু হয়ে যাচ্ছে।

কুমোর পত্নী : এ তেমন সাধু নয়।

কুমোর : [সামনে এসে] তুই থামত। ও সব আমার জানা আছে।

কুমোর পত্নী : কী জানা আছে ? কেবল গিলতে। তবে আমিও স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। ওকে যদি থাকবার জায়গা না দেবে তবে সারাদিনে কিছু গিলবার পিত্যেশ করো না। রান্নাঘরের সব খাবার উঠোনে ছড়িয়ে দেব। এই আমি যাচ্ছি।

কুমোর : হাঁ-হাঁ-হাঁ। তোর বড় রাগ। ওর নাম কী ?

কুমোর পত্নী : তার আমি কী জানি ? ওকেই না হয় জিজ্ঞেস করো।

কুমোর : [উদায়ীর কাছে গিয়ে] প্রণাম। আপনার নাম ?

উদায়ী : আমার নাম উদায়ী।

কুমোর : উদায়ী ! [স্ত্রীর কাছে গিয়ে] এ রাজা উদায়ী। এঁকে থাকতে দিলে আমাদের ঘরদোর সব বরবাদ হয়ে যাবে। রাজার লোক আমাদের ধরে নিয়ে যাবে।

কুমোর পত্নী : সে কি ? এ কেমন রাজা গো ? সাধু শ্রমণদের ঠাঁই দেয়া যাবে না। দেখ, এ ঘর যেমন তোমার এ ঘর তেমনি আমার। তুমি যদি ওকে থাকবার জায়গা না দেবে ত আমি দেব।

কুমোর : কিন্তু আমাদের ঘর ? ঘর যে বরবাদ হয়ে যাবে।

কুমোর পত্নী : তা যাক্। কাঠ খড়ের ঘর, না হয় একগাদা ছাই হবে। রাজা না হয় তাই নেবে গো তাই নেবে। গায়ে মাখবে। আর কী নেবে ? ওই গাধা। গাধাতে চড়ে রাজা ঘুরে বেড়াবে। এমন রাজা গাধাতেই চড়বে। আর আমাকে ধরে নিয়ে যাবে ? শূলে দেবে ? তা দিক্। একবারের বেশী ত মারতে পারবে না। না হয় একটু আগে মরলাম। তাই আমার ভয় নেই।

কুমোর : ঠিক !

কুমোর পত্নী : ঠিক।

কুমোর : তবে চল রাজাকে ঘরে নিয়ে আসি।

[উভয়ে উদায়ীর দিকে এগিয়ে যাবে]

কুমোর : আসুন সাধুজী আসুন। ছোট আমাদের ঘর, শুকনো আমাদের রুটি। এ ছাড়া আর কিছু নেই, তাতে আপনার কষ্ট হবে না তো।

উদায়ী : কষ্ট ! শ্রমণের আবার কষ্ট কী। কিন্তু তার আগে তুমি কী আমায় একটা কথা বুঝিয়ে বলবে আমি কেন নগরে থাকবার জায়গা পেলাম না।

কুমোর : ও: সেকথা আপনি জানেন না বুঝি। নূতন রাজা আদেশ জারী করেছেন আপনাকে যে আশ্রয় দেবে, খাবার অন্ন, তৃষ্ণার জল, তাকে শূলে দেওয়া হবে।

উদায়ী : বলো কী ? রাজা কেন এমন আদেশ করলেন জানো ?

কুমোর : ঠিক জানি না। তবে মন্দ লোক কিছু হয়ত বলে থাকবে—

উদায়ী : বুঝেছি। বলেছে উদায়ী রাজ্য আবার ফিরে নিতে আসছেন। সত্তার লোভ তাঁকে নির্মম করেছে। কিন্তু তুমি বলো, তুমি আমায় কী সাহসে স্থান দিচ্ছ ?

কুমোর : [স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে] ওর সাহসে।

কুমোর পত্নী : প্রভু, যারা নিঃসম্ব যাদের কিছু হারাবার নেই তাদের আবার ভয় কী ?

উদায়ী : ঠিক বলেছ। যারা নিঃসত্ব তাদের কিছু হারাবার ভয় নেই। আমি তোমাদের আতিথ্য গ্রহণ করলাম। কিন্তু এখানে আমি থাকব না। আমি আবার ফিরে যাচ্ছি ভগবান মহাবীরের কাছে আকাঙ্ক্ষাহীন ও নিঃসত্ব হয়ে। তোমাদের কল্যাণ হোক।

[উদায়ী ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাবেন]

[পটক্ষেপ]

সমরাদিত্য কথা

[কথাসার]

হরিভদ্র সূরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

কে তাকে একথা বলছে দেখবার জন্য অগ্নিশর্মা চারদিকে চেয়ে দেখল। কিন্তু সেই নির্জন রাজপথে কেউ যে তার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে তা তার মনে হল না।

মনের ভ্রম মনে করে অগ্নিশর্মা আরো আগে এগিয়ে গেল। মনে মনে ভাবল গুণসেন এখুনি দৌড়ে আসবে। যে গুণসেন একদিন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তাকে নির্যাতন করেছে, সেই গুণসেন পশ্চাত্তাপের আগুনে তার পাপ দগ্ধ করতে করতে দৌড়তে দৌড়তে এসে অঞ্জলিবদ্ধ হাতে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। সে যাই হোক, গুণসেনকে ভদ্রই বলতে হয়। সে নিজের দোষ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। সেই জন্যইত সে তাকে এত আগ্রহ করে আমন্ত্রণ করে এসেছে। তা ছাড়া এই রাজ প্রাসাদের সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কী?

ওদিকে রাজ প্রাসাদে সেই সময় লোকজন ছুটোছুটি করছে। বৈদ্য ও মন্ত্রবিদেরা একের পর এক আসছে ও চলে যাচ্ছে।

অগ্নিশর্মা তত্ক্ষণে দ্বারপালের কাছে গিয়ে গুণসেনকে তার আসার খবর দিতে বলল। অগ্নিশর্মা দ্বারপালের পরিচিত ছিল না। তাই সে তাকে আর দশজন প্রার্থীর মতোই এক প্রার্থী বলে মনে করে নিল। তবুও সে তাকে বিনীত ভাবেই বলল, মহারাজ, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। কুমার ভেতরে রয়েছেন। কোন দাসী যদি এসে যায় তবে তার সঙ্গে আপনার আসবার সংবাদ তাঁকে পৌঁছে দেব।

অগ্নিশর্মা তখন মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পথের ধারে পাষাণ প্রতিমার মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ ত কেউই তার দিকে দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করল না। এক মাসের উপবাসের পরই যে তপস্বী ভিক্ষা নিতে এসেছেন

এ রকমও কারু মনে হয়েছে তাও মনে হল না। যদি হয়েও থাকে তবে উপবাস করাই এদের ব্যবসা তাই তাতে মাথা গলানো বা তার এই প্রবৃত্তিকে প্রোৎসাহিত করার কোনো প্রয়োজন আছে সে কোন রাজকর্মচারীই মানতে রাজী নয়।

ইতিমধ্যে তার ভাগ্যগুণেই এক দাসীকে ভেতরে যেতে দেখা গেল। দ্বারপাল তাকে ডেকে বলল: কুমার বাহাদুরকে তুমি এই খবর দেবে যে এক তপস্বী দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি তাঁর দর্শনপ্রার্থী।

দাসী কিছু শুনল কিছু শুনল না এভাবে ভিতরে দৌড়ে গেল। তপস্বীর জন্ম তার কোনো চিন্তাই ছিল না। এতো রাজপ্রাসাদ। এখানেত হাজার হাজার কাঙাল প্রার্থী হয়ে আসে। যদি প্রত্যেক কাঙালীর খবর নিতে হয় তবে ত দাসদাসীদের নিজের কাজ করার অবসরই আর থাকে না।

এদিকে অগ্নিশর্মারও দেরী হয়ে যাবার এমন কোনো তাড়া ছিল না। এখনই হোক বা একটু দেরীতে গুণসেন তার আসার সংবাদ পাক এইটুকুই সে চাইছিল। খবর পাওয়া মাত্র যে সে নিজেই ছুটে আসবে ও তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবে সে বিষয়ে তার একটুও আশঙ্কা ছিল না।

অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গুণসেন যে তার আসার খবর পেয়েছে তার কোনো লক্ষণই সে দেখতে পেল না। গুণসেনের আতিথ্য সে স্বীকার করবার দুঃসাহস করেছিল—সে তাতে আশার ভ্রমে নিরাশাকেই আমন্ত্রণ করেছিল।—এই ধরণের খিন্নতা সহসা তার অন্তরকে দগ্ধ করে দিয়ে গেল।

তার আগের গুণসেনের কথা মনে পড়ল। পরিপূর্ণ সভায় সে তাকে জ্বালাত, নাচাত ও নানাভাবে বিড়ম্বিত করত। সেই গুণসেনইত এই গুণসেন। খয়ের জল জল হয়ে যায় কিন্তু তাতে তার শক্তি নষ্ট হয় না। তেমনি গুণসেন রাজ কাজে হয়ত কুশল হয়েছে, অন্যের সঙ্গে ব্যবহারে দক্ষ, কিন্তু তার কৌতূহল প্রবৃত্তি চলে গেছে তা অসম্ভব।

এ ভাবে একঘণ্টা তাকে দাঁড়িয়ে রেখে বা অপেক্ষা করিয়ে, নিজেই এসে আমন্ত্রিত করে নিয়ে যাবে এরকম সঙ্কল্প করাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। খাদ্য খাবার ত রাজপ্রাসাদে কোনো সময়ই অভাব হয় না। কিন্তু আশ্রমে গিয়ে যখন সে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তখন তার মনে যে এ ধরণের

কৌতুক করবার প্রবৃত্তি আছে তা তার মনেই হয় নি। অগ্নিশর্মার মনে তখন আবার আশার সঞ্চার হল। তার মনে হল গুণসেন এই এলো বলে। তার মনে বসে কে যেন বলতে লাগল সমস্ত কাজ ফেলে তার পুরুনো সঙ্গী তার সঙ্গে দেখা করতে নিশ্চয়ই আসবে।

কিন্তু সে কথার সত্যতা কে নির্ণয় করবে? সে চলে যাবে না থাকবে অগ্নিশর্মা যখন এ ধরণের চিন্তা করছিল তখন তাকে চেনে এমন এক পরিচারিকা সেখানে এসে উপস্থিত হল। সে দু'হাত জুড়ে তাকে নমস্কার করল। তপস্বী আহার করতে এসেছেন জেনে সে তাড়াতাড়ি দৌড়ে গুণসেনের প্রাসাদের দিকে চলে গেল। কিন্তু যখন সে সেখানে গিয়ে পৌছল তখন রাজবৈদ্যের কথা তার কানে এল: কুমারকে এখন কেউ যেন না জাগায়। রাত্রে ওঁর ঘুম হয় নি, তাই মাথায় যন্ত্রণা হয়েছে। খানিক বিশ্রাম নিলেই উনি আবার সুস্থ হয়ে যাবেন। চিন্তার কোনো কারণ নেই।

পরিচারিকাও যেই একথা শুনল, গুণসেনও অমনি পাশ ফিরে শুল। আজ সকাল হতেই মাথার যন্ত্রণায় সে কাতর ছিল তাই ভালো করে কারু সঙ্গে কথা পর্যন্ত সে বলে নি। কত বৈদ্য এল, কত মন্ত্রবিদ, কত রকম ওষুধ দেওয়া হল, কত রকম উপচার কিন্তু যন্ত্রণার প্রবদ্ধমান বেগ কেউই রোধ করতে পারল না। শেষে রাজবৈদ্য এলেন ও তার বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। পরিচারিকা তপস্বীর কথা বলতেই যাচ্ছিল কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। তার এমনো মনে হল যে সে যদি একটু সাহস করে তপস্বীর আসার খবর দিয়ে দেয় তবে হয়ত তাকে সকলের অপ্রসন্নতাভাজন হতে হবে কিন্তু তাতে মাসাবধিকাল উপবাসকারী তপস্বীর জীবন হয়ত রক্ষা হতে পারে। কিন্তু তবুও সে সাহস করে কিছু বলতে পারল না।

সেই পরিচারিকা তখন ধীরে ধীরে বাইরে এসে অগ্নিশর্মাকে খিন্ন স্বরে বলল: 'মহারাজ, গুণসেনের সঙ্গে এখন কারু দেখা হওয়া সম্ভব নয়। তিনি এখন মাথায় যন্ত্রণায় পীড়িত।

এর বেশী শোনার বা বলার অগ্নিশর্মারও কিছু ছিল না। যে উৎসাহ নিয়ে সে নগরে এসেছিল, সেই পরিমাণ নৈরাশ্য নিয়ে সে নিজের আশ্রমে ফিরে গেল।

॥ ৫ ॥

আশ্রমে যদি ভূমিকম্প হয়ে যেত, হাজার হাজার আম গাছ সমূলে উৎপাটিত হয়ে পড়ে থাকত বা লতা-পাতার কুটীরগুলো মাটির সঙ্গে ধূলিস্যাৎ হয়ে যেত তাহলেও আশ্রমবাসীদের এত বড় আঘাত লাগত না বা তাদের এতো আশ্চর্য হতে হত না যতটা তাদের আঘাত লাগল বা আশ্চর্য হতে হল একথা শুনে যে অগ্নিশর্মার মতো তপস্বী রাজ প্রাসাদ হতে ভিক্ষা না পেয়েই ফিরে এসেছেন ও তাঁর ভাগ্যে আর এক মাসের লম্বা উপবাস বিধাতাপুরুষ আবার লিখে দিয়ে গেছেন। সকলের মুখেই এক কালিমা পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। যে অগ্নিশর্মার পায়ের ধূলো ঘরের আঙিনায় পড়লে দরিদ্র গৃহস্থের মনেও তাকে সমস্ত কিছু অর্পণ করার অভিলাষ জাগ্রত হয়, নিজে অভুক্ত থেকেও তার ভিক্ষার ঝুলিতে নিজের আহার ঢেলে দিতে সমুৎসুক হয়, সেই অগ্নিশর্মা আমন্ত্রিত অতিথি হয়েও রাজপ্রাসাদ হতে অভুক্ত অবস্থায় ফিরে এল। এ দুষ্টগ্রহ বা নক্ষত্রের উদয়ের পরিণাম বলেই তাদের মনে হল। রাজ্যের খাদ্য ভাণ্ডারে খাদ্যের অভাব না হয়ে থাকতে পারে, তবুও যে রাজ্যে মহাতপস্বীর পেট ভরবার মতো আহার জোটে না, সে কেবল তপস্বীরই দুর্ভাগ্য নয়, রাজা বা রাজ্যাধিপতিরও নয়, সে দুর্ভাগ্য সমগ্র রাজ্যের জনসাধারণের। কোনো তপস্বীর আকস্মিক দেহাবসানে আশ্রমবাসীরা এতটা বিচলিত হতেন না যতটা কি বিচলিত হলেন এক একমাস উপবাসকারী অগ্নিশর্মাকে পারণ করবার মতো ভিক্ষা প্রাপ্ত হতে না দেখে ও সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় মাসের উপবাসের আরম্ভ করতে বাধ্য হওয়ায়।

অগ্নিশর্মা যখন আশ্রমে এসে পৌঁছল তখন তার তপ্ত তাম্র রূপ দেখে এমনো মনে হচ্ছিল যে সে বোধ হয় শান্তি ও ধৈর্যের মর্যাদাকে ভেঙে চুরে ফেলে দেবে। এমন কি শাপ পর্যন্ত সে দিয়ে বসতে পারে এমনো ভয় হয়েছিল। তপস্বীর ক্রোধের ভয়ঙ্করতা কি তারা জানত। তাতে অগ্নিশর্মাত ছিল আবার ঘোর তপস্বী। সে যদি ক্রুদ্ধ হয় তবে সাত সমুদ্রের জলও সেই দাবানলকে নেভাতে সমর্থ হবে না।

আমন্ত্রণ দিয়ে ঘরে নিয়ে এসে ও উপবাসীকে অভুক্ত রেখে ফিরিয়ে দেওয়ায় গুণসেনের প্রতি অন্যের মনোভাব যাই হোক, অগ্নিশর্মার নিজের

মনেও কি কোনো জ্বালার সৃষ্টি করে নি! এই গুণসেনই ত তাকে একদিন জ্বালিয়ে আনন্দ পেত আর আজ যখন অগ্নিশর্মা তপস্বীর খ্যাতি লাভ করেছে তখন কি এইভাবে তাকে জ্বালাবার পথ সে খুঁজে নেয় নি?

গুণসেনের প্রতি ক্রোধ ও আক্রোশের প্রবাহকে নিরোধ করবার, তিক্ত অপমানকে পান করবার অগ্নিশর্মা অনেক প্রয়াস করল কিন্তু ক্ষুধার কঠোর বেদনা যার একটুও অনুভব করা আছে সেই বুঝতে পারবে এতে যদি অগ্নিশর্মা সফল না হয়ে থাকে তবে তাকে সর্বথা দোষী করা চলে না।

বস্তুতঃ গুণসেন এখনো তার কৌতুক প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে নি, এই ধরণের বিচারে যখন সে মগ্ন ছিল, যখন তার চারিদিকে গ্লানি আর গ্লানি তখন দূরে সানুচর গুণসেনকে আসতে দেখা গেল।

গুণসেন আসা মাত্রই তপস্বীর পায়ে মাথা রাখল। মাথার যন্ত্রণার জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ায় তপস্বীর সে যথোচিত সৎকার করতে পারে নি সেজন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করল। গুণসেনের খেদ বা পশ্চাত্তাপে অগ্নিশর্মার এক মাসের ক্ষুধা শান্ত হয়ে যাবে এমন নয় বা দ্বিতীয় মাসের উপবাসও যে সে ভঙ্গ করবে তাও নয়। তবু এই খেদ ও পশ্চাত্তাপ অগ্নিশর্মাকে অন্নাহারের তৃপ্তির চাইতেও আর এক ধরণের বিশেষ তৃপ্তি দান করল। অগ্নিশর্মার এখন দৃঢ় বিশ্বাস হল যে গুণসেন জেনে শুনে নিজের কৌতুকপ্রিয়তা চরিতার্থ করবার জন্য তাকে ফিরিয়ে দেয় নি। ভবিতব্যই এর জন্য উত্তরদায়ী, এবং তপস্বীর যদি এই ধরণের উৎপাত সহ্য করবার সামর্থ্য না থাকে তবে দেহ দমনেরই বা কী প্রয়োজন?

একেলা অগ্নিশর্মারই নয়, সমস্ত আশ্রমবাসীদের এখন বিশ্বাস হল যে অগ্নিশর্মাকে যে উপরোপরি দ্বিতীয় মাসের উপবাস করতে হচ্ছে গুণসেন তার নিমিত্ত কারণ হলেও বস্তুতঃ এর মধ্যে ভবিতব্যই বলবান। এর জন্য গুণসেনকে যথার্থ দোষী করা যায় না।

গুণসেন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আত্ম-নিবেদনের ভংগীতে বলতে লাগল: আমি অসুস্থ ছিলাম। মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছিল। বৈদ্যেরা আমাকে বিশ্রাম নিতে বলল কিন্তু চোখ বুজবার সঙ্গে সঙ্গে আজ আপনার পারণের দিন সেকথা আমার মনে হল।

আমি তখুনি দ্বার রক্ষীকে বলে পাঠালাম যদি কোনো মহাতপস্বীর মতো ব্যক্তি আসেন তবে তাঁকে সসম্মানে আমার অন্তঃপুরে নিয়ে এসো। তখনি আমি জানতে পারলাম যে মহাতপস্বী একটু আগেই সেখান এসেছিলেন ও ফিরে গেছেন।

সেকথা শোনামাত্র আমি আমার মাথার যন্ত্রণার কথা ভুলে গেলাম। আমার মনে এক গভীর বেদনার আঘাত লাগল এবং পথের মধ্য হতেই আপনাকে ফিরিয়ে নেব বলে আপনার পেছনে ছুটলাম। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে তাতে অনেক বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। আগেও আমি আপনাকে উত্যক্ত করেছি এবং এখনো…

গুণসেন কি বলতে চায় অগ্নিশর্মা তা সহজেই বুঝতে পারল। তার আবেগ চাঞ্চল্য এখন শান্ত হয়ে এসেছিল। এ আমার পরীক্ষা সেকথা সে তখন বুঝতে পারছিল।

না, মহারাজ, এতে আপনার কোনো দোষ নেই। তপস্বীত কারু অপরাধ নেন না। সত্য কথাত এই যে আপনি আমার পরমোপকারী। আপনিই আমায় সংসার কারাগার হতে বিমুক্ত করেছেন, আমার তপস্যার অভিবৃদ্ধিতে আপনি আমার পূর্ণ সহায়ক।

অনিষ্ট ও অপকারকেও এই তপস্বীরা তপস্যার অভিবৃদ্ধিতে সহায়ক রূপ মনে করেন এবং হৃদয়ের আবেগকে এই ধরণের বিচার রূপ অঙ্কুশ দ্বারা দমিত করেন। এই অঙ্কুশের আঘাতে হস্তীরূপ প্রমত্ত আবেগ নিরীহ গাভীতে কেন না রূপান্তরিত হবে? কিন্তু অধিকাংশতঃ তপস্বী সুলভ এই ধরণের বাক্য তপস্বীরা কেবল মাত্র মুখেই বলে যান। কিন্তু তবুও যে অপরাধী, তার মনে তা সুস্পষ্ট ও গভীর প্রভাব রেখে যায়। বৈর ও বিদ্বেষরূপী সাপ মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়।

গুণসেন নিজের অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে না পেরেছিল তা নয়। তপস্বীর ক্রোধের ভয়ঙ্করতাও তার অনুভবের বাইরে ছিল না। কিন্তু যখন অগ্নিশর্মা ও তার গুরু আচার্য কৌণ্ডিন্য তার অক্ষম্য অপরাধকেও তপোবৃদ্ধির নিমিত্ত কারণ বলে অভিহিত করলেন তখন তার হৃদয়ের গুরুভার অনেকটা যেন লাঘব হয়ে গেল।

ফুলের মতো হালকা হওয়া তার হৃদয়ে তখন আনন্দেরও সঞ্চার করল যাতে সে বলে উঠল, মহারাজ, এইবার ত আমি সাবধান থাকতে পারি নি, কিন্তু এই মাসের উপবাসের পর আপনি যদি আমার এখানে ভিক্ষা গ্রহণ করতে আসেন তবে আমি নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করব।

আহার বা উপবাস সম্পর্কে আশ্রমবাসীরা সকলেই প্রায় স্বতন্ত্র ছিলেন। কে কবে কার কাছ হতে ভিক্ষা আনবেন সে সম্বন্ধে কোন বিধি নিষেধ ছিল না। দেহ রক্ষার জন্য ভিক্ষা তা নয়, পরন্তু সংযম রক্ষার জন্য আহার আবশ্যক, তার সঙ্গে জিহ্বার লোলুপতার যেন মিশ্রণ না হয় এই সূত্র আচার্য সকলকে শিখিয়ে রেখে ছিলেন। এর যাতে অতিচার না হয় তাঁদের সেই সম্পর্কেই শুধু জাগরূক থাকতে হত।

তবুও এ ক্ষেত্রে গুণসেনের গ্লানি ও ব্যাকুলতা দেখে আচার্য অগ্নিশর্মাকে দ্বিতীয় মাসের উপবাস অন্তে গুণসেনের ওখান হতে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন।

শুধু তাই নয়, গুণসেনের চলে যাবার সময়ও আচার্য তার মাথায় হাত রেখে এই আশ্বাস দিলেন:

আপনি তপস্বীদের অপ্রসন্ন করেছেন সে কথা যেন মনে না করেন। আমাদের ভাগ্যে যদি এই অন্তরায় লেখা থাকে তবে কে কি করতে পারে? আমরা কাউকেই নিজের শত্রু বা মিত্র মনে করি না। সর্বত্র এক মঙ্গলই আমরা দেখতে পাই। আর তপস্বীত জগতের মাতাপিতা স্বরূপ। তবে নিজের সন্তানের প্রতি তাঁরা কেন বিরূপ হবেন?

গুণসেন গভীর কৃতজ্ঞতায় আচার্যকে নমস্কার করল ও তারপর নিজের প্রাসাদে ফিরে এল।

[ক্রমশঃ

শ্রমণ

সূচী পত্র

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড

বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৮১

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি ২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।